ইতিহাস গ্রন্থমালা

ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি
১৮৫০—১৯৪৭

ইতিহাস গ্রন্থমালা

প্রধান সম্পাদক অশীন দাশগুপ্ত
সহযোগী সম্পাদক রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়

ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি ১৮৫০-১৯৪৭

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯

সম্পাদকের ভূমিকা

বিগত কয়েক দশকে ভারত ইতিহাস নিয়ে গবেষণা অনেক অগ্রসর হয়ে গেছে। রাজকাহিনী ছেড়ে এখন অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতির সমস্যাগুলি, এমনকি মানুষের চৈতন্য ও বিশ্বাসের নানা জটিলতা, ক্রমশই ঐতিহাসিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। নতুন তথ্যে, নতুন তত্ত্বে, বিশ্লেষণের উৎকর্ষতায় ও নানা বিতর্কে ভারত ইতিহাস চর্চা আজ সমৃদ্ধ। কিন্তু নতুন গবেষণার ফলাফল প্রায় সব সময়ই প্রকাশ হয় ইংরেজিতে। ফলে সেগুলি অনেক সময়ই সাধারণ পাঠক ও ছাত্র-ছাত্রীদের আওতার বাইরে থাকে। ভারত ইতিহাস চর্চাকে এই গণ্ডীর বাইরে এনে বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে আধুনিক গবেষণালব্ধ ইতিহাস উপস্থিত করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থমালার পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনা দুটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে কয়েকটি খণ্ডে পুরা-ইতিহাস, প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক ভারত ইতিহাসের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ থাকবে। এর পাশাপাশি থাকবে অন্য স্তরে, বিশেষ কিছু বিষয়ের ওপর সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল। এই বিশেষ গ্রন্থের একটি দিয়ে এই গ্রন্থমালার সূচনা হল। যে সব বিশিষ্ট ঐতিহাসিকরা এই গ্রন্থমালায় লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী, শ্রী ব্রতীন মুখোপাধ্যায়, শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, শ্রী কুণাল চক্রবর্তী, শ্রী ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী তপন রায়চৌধুরী, শ্রী রজত রায়, শ্রী সৌমেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী তনিকা সরকার, শ্রী দীপেশ চক্রবর্তী ও শ্রী পার্থসারথি গুপ্ত।

বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা এবং সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা যাঁরা ইতিহাস সম্বন্ধে উৎসাহী তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় বই এই গ্রন্থমালায় খুঁজে পাবেন। এই গ্রন্থমালার সাহায্যে বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চার একটি নতুন মান সৃষ্টি হবে।

সূচীপত্র

ভূমিকা

এই বইটিকে আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ভূমিকা বলা চলতে পারে। বাংলা ভাষায় দেশের কথা, ভাত-কাপড়ের কথা, চাষী-মজুরের কথা লেখা নতুন কিছু নয়। খবরের কাগজে সাংবাদিকেরা নিয়তই লিখছেন, অবশ্য বর্তমানকাল নিয়ে। ঐতিহাসিক কাল নিয়ে যে ধরনের লেখা অপেক্ষাকৃত বিরল। এমন আগে ছিল না। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা এক সময়ে বাংলা ভাষায় এক ধাঁচের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিষয়ক রচনা দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল। ঐ ধাঁচের লেখার মধ্যে স্মরণীয় একটি অবাঙালীর বাংলায় রচনা, সখারাম গণেশ দেউস্কর-এর 'দেশের কথা'। কিন্তু হালের কয়েক দশকে ঐ ভাবধারার দম ফুরোল। আর ইতিহাস লেখা যাদের পেশা তারা বিশেষজ্ঞতার খাতিরে ইংরেজি ভাষার ওপর এমন জোর দিলেন যে বাংলায় রচনা, কোনমতে কাজ-চালানো গোছের অনুবাদ ছাড়া, পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

আটপৌরে বাংলা ভাষায় অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছি এই বইটিতে। নানান সমস্যা। দু-এক জায়গায় তেমন চলতি নয় এমন শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। যেমন ধরা যাক অনেক ফারসি শব্দ এককালে বাংলায় চালু ছিল যেগুলি প্রশাসনিক কাজকর্ম কি জমিদারি ও বাজারের লেনদেন সম্পর্কিত। যদিও এর বদলে ইংরেজি শব্দ চলেছে, আমি একটু পুরাতনপন্থী হয়ে অনেক সময় ব্যবহার করেছি ফারসি শব্দগুলি, যেগুলি হিন্দিতেও প্রচলিত। কেবল 'আদালত, উমেদার, আবাদ' নয়, 'পিটিশনের' জায়গায় 'আরজি', 'সাবমিটের' পরিবর্তে 'দাখিল', 'কমিশনের' সমার্থক 'দস্তুরি' ইত্যাদি চললে ক্ষতি কি?

অপর দিকে শব্দভাণ্ডারে যা ছিল না এবং নেই সে সব শব্দ তৈরী করে থাকি আমরা। এরকম কিছু পরিভাষা, নিজের অথবা অন্যের, ব্যবহার করেছি, যদিও পারলে নয়। তাছাড়াও অনেক সময়ে হয়ত আমার শব্দচয়নে আলস্যের ফলে সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দ এসে গেছে। 'পারম্পর্য' বা 'অবশিল্পায়ন' বা 'স্বার্থগোষ্ঠী' জাতীয় শব্দগুলি আটপৌরে বাংলা নয় ঠিকই, কিন্তু না হলে চলে না। এগুলি অপরিহার্য কেননা পদে পদে এদের পরিবর্তে দীর্ঘতর সমার্থক শব্দ সমষ্টি প্রয়োগের মাসুল বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি।

সকলেই জানে যে ইতিহাস লেখার একটা পেশাদারী ঢং আছে। যেটা পেশার গণ্ডীর মধ্যে গ্রহণযোগ্য হলেও বাইরের মানুষের সঙ্গে সওয়াল জবাব করার জন্য বোধহয় অনুপযুক্ত। অন্তত এই বইটির পক্ষে যে অনুপযুক্ত তাতে আমার সন্দেহ নেই। গৃহিণীরা যেমন অন্দর মহলের খুন্তি-হাঁড়ি-সাঁড়াশি বাহির মহলে নিমন্ত্রিতের পাতের কাছে উপস্থিত করেন না, সেরকম গবেষকদের যন্ত্রপাতিগুলোকে চাক্ষুষ করার দরকার নেই এই বইতে। কোন কোন ক্ষেত্রে আমি অবশ্য সেটা করেছি গবেষকদের মধ্যে কেমন খেলা চলে তার আমেজ আনতে। অথবা করেছি যখন যুক্তি-পরম্পরা সেটা দাবী করে। সারণিতে কিছু হিসেব দেওয়া হয়েছে, যেগুলি না দিলে নয়। অনেক লেখকের নাম উল্লেখ করে

লেখার ভার বাড়ানো ভয়াবহ রকমের সহজ, কিন্তু এখানে অনাবশ্যক। পাদটীকা বাদ দিয়ে স্মরণযোগ্য অথবা বিস্মরণযোগ্য গ্রন্থের তালিকা বইটির শেষে দেওয়া গেল। প্রসঙ্গত এই বইতে ১৮৫০-এর পূর্বইতিহাস কেন নেই তার সহজ উত্তর : এই গ্রন্থমালাতেই এই বইটির পূর্ববর্তীটির বিষয় ১৭৫০-১৮৫০ পর্যায়ের অর্থনৈতিক ইতিহাস।

সবশেষে যেটা বলা দরকার : ১৯৭২ সাল থেকে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে 'উপনিবেশিত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস' নামে একটি বিষয় পড়িয়ে এসেছি। এই বইটির মূল উপাদান সেই তাগিদে। বাংলা ভাষায় এই বই লেখা অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত আর রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের তাগিদে। আরও পেছনে নিশ্চয় আছে ছেলেবেলার কলকাতা, মা ও বাবার বাংলায় লেখা-লিখির দিকে ঝোঁক।

এই বই মালা আর অলিকে দিলাম কয়েক মাস ব্যস্ত সেজে থাকার কারণ দেখাতে।

দিল্লী

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

অধ্যায় ১

গোড়ার কথা : ঔপনিবেশিক ইতিহাসের নানা ঘরানা

আমরা সকলেই ইতিহাসের বাধ্য, কিন্তু ইতিহাস পড়তে বাধ্য নই। তবু যারা বাধ্য হয়ে অথবা না হয়ে ইতিহাস পড়ে তাদের সামনে প্রশ্ন, ইতিহাস পড়া কেন, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস পড়া কেন ? এই পরিচ্ছেদে আমরা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

কোনও কোনও লোক 'ঐতিহাসিক' নাম নিয়ে ইতিহাস চর্চা করে। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঐতিহাসিক। অর্থাৎ এমন মানুষ নেই যার নেই সময় সম্বন্ধে বোধ, নেই ঐতিহাসিক কার্যকারণ ধারার একটা ধারণা। তবে এই প্রথম বোধটা—কিসের পর কি ঘটল আমাদের জ্ঞাতসারে—প্রায় জৈবিক, বিশেষ চিন্তার অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়টা, ঐতিহাসিক কার্যকারণের ধারণা, চিন্তার ফল,.যার মূলে অভিজ্ঞতা, শোনা কথা, পড়াশুনা। আধুনিক ইতিহাসে এই দ্বিতীয় জায়গাটাতেই বিশেষজ্ঞদের সমন করা হয় সাক্ষ্য দিতে ; আমাদের হালের অভিজ্ঞতার বাইরে ঘটনাপরম্পরা জানতেও এই সাক্ষ্য দরকার হতে পারে অবশ্য। এদিকে আমাদের নিজস্ব ধারণাগুলি আঁকড়ে থাকার প্রবণতা আমাদের প্রবল, যেন বেদবাক্য। রবীন্দ্রনাথের একটা মন্তব্য মনে পড়ে। 'বিশেষজ্ঞরা যা বলেন তাই যে বেদবাক্য আমি তা বলি নে। কিন্তু সুবিধা এই যে বেদবাক্যের ছন্দে তাঁরা কথা বলেন না। প্রকাশ্য সভায় তাঁরা আমাদের বুদ্ধিকে আহ্বান করেন।' আমাদের ধারণার সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মত কি মেলে না মেলে না ? বিশেষজ্ঞরাই কি এক মত ? যদি নয়, তবে কেন ? এই সব জিজ্ঞাসার উত্তর আমাদের সকলের চাই, যেহেতু অজান্তে আমরা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক।

ইতিহাসের স্পৃহার আর একটা কারণ ছিল আমাদের দেশে ইংরেজ আমলে। 'যে জাতির পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষায় চেষ্টা পায়', কিন্তু এই দেশে 'ঐতিহাসিক স্মৃতি কই ?' বঙ্কিমচন্দ্রের এই খেদ, 'সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়' কিন্তু এদেশের ইতিহাস নেই, এই ক্ষোভ উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদের মূলে। পরে রবীন্দ্রনাথ আরও গভীর বিশ্লেষণের দিকে : বক্তব্য, সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতা এদেশের

ইতিহাস লোপ করে দিতে সচেষ্ট এক বিশেষ ধরণের ইতিহাস দ্বারা :

> আমরা পেটের অন্নের বিনিময়ে সুশাসন সুবিচার সুশিক্ষার সমস্তই একটি বৃহৎ...দোকান হইতে কিনিয়া লইতেছি—আর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। ......যে সকল দেশ ভাগ্যবান, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়...আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

আগেই উল্লেখ করেছি অধুনা বিস্মৃত গণেশ দেউস্কর-এর অর্থনৈতিক ইতিহাস ; এই বইয়ের সমালোচনায় দীনেশচন্দ্র সেন লেখেন, বৃটিশ সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত অর্থনৈতিক দুর্গতির দিকে। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য :

> আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই ইতিহাস হইতে লাভ করিবার বিষয় কী দেখিলে ? আমরা বলিব, লাভের বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা দরখাস্ত পত্রিকা নহে। আমাদের লাভ এই যে : ইংরেজের আদর্শ আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল—স্বদেশের সকল দিক হইতে আমাদের হৃদয় বিমুখ হইতেছিল। মুখে আস্ফালন করিয়া যাহাই বলি, আমাদের অন্তঃকরণ বলিতেছিল, বিলাতি সভ্যতার মত সভ্যতা আর নাই।

লাভ এই যে ইতিহাস সেই সভ্যতার শোষণের শাসনটা দেখিয়ে স্বদেশকে জনমানসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়কদের এই ছিল আশা। ফলত যে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ এবং ইতিহাস চর্চার সৃষ্টি হয় সেই প্রসঙ্গে পরে আসবো।

এই বইটিতে আমরা ১৮৫০ সাল থেকে অর্থনৈতিক ইতিহাসের গতি প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করব। ধরা যাক্ একটি লোক আমাদের দেশে জন্মাল ১৮৫০ সালে। তার বয়স যখন তিন তখন বোম্বাই থেকে থানা আর কয়েক মাস পরে কলকাতা থেকে হুগলি প্রথম রেলপথ তৈরী হ'ল, আর সেই বৎসরই টেলিগ্রাফের প্রথম পত্তন, কলকাতা থেকে আগ্রা। তার বয়স যখন চার প্রথম সুতি কল বসল বোম্বাইতে এক পার্সির উদ্যোগে। এর দু বৎসর পরে সাহেবদের নতুন পাটকল খুলল রিষড়াতে। আমাদের প্রতিনিধি স্থানীয় ভারতীয়টির বয়স যখন সাত, সিপাহী বিদ্রোহের ডামাডোল আর তারপর মহারাণীর রাজত্ব শুরু।

> ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুরোন বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন খাস প্রক্লেম কল্লেন ; বাজী, তোপ, ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা "কুইনের খাসে প্রজার দুঃখ রবে না" বাড়ী বাড়ী গেয়ে বেড়াতে লাগলেন ; গর্ভবতীর যতদিন একটা না হয়ে যায়, ততদিন যেমন 'ছেলে কি মেয়ে' লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসারে কুইনের প্রক্লমেশন সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

এই হল কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার জবানি। আমাদের কাল্পনিক ভারতীয়টির বয়স যখন দশ তখন ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী (তখন তার নাম দেওয়া হয়েছিল ভাইসরয়ের কাউনসিলের অর্থ সদস্য) ভারতের প্রথম বাজেট তৈরী করলেন। আমাদের লোকটির বাবা যদি পয়সাওয়ালা হয় তবে হয়ত শুনতে পাবে যে দেশে সেই প্রথম আয়কর চালু হল। এবং বার বৎসর বয়সে সে হয়ত মহারাণীর সরকারের প্রথম কাগজের টাকা দেখতে পাবে। লোকটি যদি ব্যবসায়ী পরিবারের হয় তবে এই রকম সময়ে বিদেশী বাণিজ্য, বিশেষ করে তুলোর রপ্তানি, হৈ-হৈ করে বাড়ছে দেখতে পাবে। এর কারণ সে নাও জানতে পারে : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কালো-চামড়ার ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া নিয়ে গৃহযুদ্ধ, ফলত আমেরিকা থেকে তুলো রপ্তানি বন্ধ, ফলত ইংলন্ডে তুলোর মূল্যবৃদ্ধি এবং ভারত থেকে রপ্তানি বৃদ্ধি। এর একটা ফল বোম্বাইয়ের বন্দর ও ব্যবসায়ীদের বিরাট উন্নতি। আমাদের লোকটির বয়স যখন উনিশ তখন বহির্বাণিজ্য নতুন মোড় নিল সুয়েজ খাল খোলার ফলে : ভাস্কো ডা'গামা'র আমল থেকে চালু দূর আফ্রিকার শিং পেরিয়ে ইউরোপ যাতায়াত প্রায় বন্ধ হল। এদিকে এই সময়ে এ দেশে রেলপথের দৈর্ঘ্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৩২ মাইল। এই সব কি দেশের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা ? 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্রোক্তি :

> আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্নে যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরেজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে। কি মঙ্গল দেখিতে পাইতেছ না ? ঐ দেখ লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ অগ্নিময়ী তরণি ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায়...বাণিজ্য দ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে।...গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জ্বলিতেছে...কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, ক্যান্ডেলাব্রা, মারবেল, আলাবাস্টার—কত বলিব ? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর !

এই জয়ধ্বনি যথেষ্ট শোনা গেল দিল্লীর দরবারে ১৮৭৭ সালে, সেই সময় ভিক্টোরিয়া নিজেকে ভারত সাম্রাজ্ঞী উপাধি দিলেন। আমাদের কাল্পনিক ভারতীয়টির বয়স তখন সাতাশ।

কিন্তু লোকটিকে এতদিন বাঁচতে দেওয়া চলে না, যদি সে গড়পড়তা ভারতীয় হয়। কেননা শিশু মৃত্যু, অন্নাভাব ও মহামারীর দৌলতে ভারতে জন্মে গড় আয়ু ২৫ বৎসর, ১৮৮১ সালের জনগণনা অনুসারে। বলে রাখা ভাল যে এই হিসেবটা অস্বাভাবিক নয় বৃটিশ ভারতের পক্ষে : ১৯৩১ সালেও গড় আয়ু ছিল মাত্র ২৬ বৎসর এবং ১৯৪১ সালে ৩১ বৎসর। (পরিচ্ছেদ ২)। "মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি।" আমাদের গড়পড়তা কাল্পনিক ভারতীয়টির

বয়স যখন তিন থেকে পাঁচ : বর্তমান রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুতে দুর্ভিক্ষ। বয়স দশ : উত্তর প্রদেশ থেকে কচ্ছ অবধি উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ। বয়স বারো : মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে কঠিন খাদ্যাভাব। বয়স ষোল-সতের : উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-ভারতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। বয়স আঠারো থেকে কুড়ি : উত্তরপ্রদেশে, রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ। বয়স বাইশ-চব্বিশ : বিহার ও মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ : প্রথমে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, ও তারপর উত্তর প্রদেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। সরকারি হিসেব অনুসারে ১৮৫০ সাল থেকে এই পর্যন্ত (১৮৭৭) দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ৪২ লক্ষ, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষের সংখ্যা ৯ কোটি ৩২ লক্ষ। (পরিচ্ছেদ ৫)। এই পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় সেই বিখ্যাত বঙ্কিম উক্তি : "আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।......এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল?"

এই একই সময়ে ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় ইংরেজদের শ্রীবৃদ্ধি। ঐ সময়ে আমাদের জাতীয় আয়ের সঠিক হিসেব নেই, ইংলণ্ডের সংখ্যাতত্ত্বের ছড়াছড়ি। ইংলণ্ডে মাথাপ্রতি গড় জাতীয় আয় ১৮৫৫ সালে ছিল ১৮·৩ পাউণ্ড স্টরলিং, ১৮৭০ সালে ২৮·৪। অধ্যাপক মিচেল ও ডিনের হিসেব অনুসারে এই জনপ্রতি গড় আয় বেড়েই চলে—১৮৯০ সালে ৩৭·৮ এবং ১৯১০ সালে ৪১·৯ পাউন্ড। ঐ উনিশ শতকে শিল্পবিপ্লবের ফল বোঝা যায় আর একটা হিসেবে : ১৭৫০ সালে জাতীয় আয়ের ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ কৃষি উৎপাদন থেকে হ'ত, এই অনুপাত দাঁড়াল মাত্র ২০ শতাংশ ১৮৫১ সালে, এবং আরও কমে ১০ শতাংশ ১৮৮১ সালে, শিল্পজ আয় বৃদ্ধির ফলে। উনিশ শতকের গোড়ায় ৪০ শতাংশ মানুষ নিয়োজিত ছিল ইংলণ্ডে কৃষি উৎপাদনে, শিল্পবিপ্লবের পরিণতির ফলে ১৯০১ সালে মাত্র ৮·৫ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত রইল। একই সময়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ল, মূলতঃ শিল্পজ দ্রব্য রপ্তানির ফলে : জাতীয় আয়ের মাত্র ১৪ শতাংশ আসত এই খাত থেকে ১৭৯০ সালে, ১৮৮০ সালে ৩৬ শতাংশ। মোদ্দা কথা, এ সব হিসেব থেকে বোঝা যায় যে ইংরেজদের শিল্পবিপ্লব তাদের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজিয়ে দিল, চাষ-আবাদ নিতান্ত গৌণ হয়ে দাঁড়াল শিল্প উৎপাদনের তুলনায়, শিল্পদ্রব্যের রপ্তানির ফলে আয় বাড়ল, আর সব চেয়ে বড় কথা তাদের গড়পড়তা জাতীয় আয় অভূতপূর্ব হারে বাড়ল।

ইংরেজদের বড়মানুষি আর আমাদের দারিদ্র্য টের পেতে অবশ্য সংখ্যাতাত্ত্বিকের জন্য অপেক্ষা না করলেও চলে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই তফাৎ? ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে এর উত্তর নানা দিক থেকে বুঝতে চেষ্টা করব।

তার আগে পৃথিবীব্যাপী যে যন্ত্রের অংশ এই উপমহাদেশে বৃটিশ ভারত, সেটাকে মনে রাখা দরকার।

> সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া

> গেছে।...ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব...এতবড় প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না। য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

রবীন্দ্রনাথ যে 'গান্ধর্ব বিবাহ' সংবাদ দিয়েছেন সেটা সাধারণতঃ অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদ নামে পরিচিত।

ইদানিং উপনিবেশবাদ শব্দটা খুব শোনা যায়। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে শুরু করে পাড়ার নির্বাচনী সভায় বহুল ব্যবহৃত এই শব্দটার মানে হয়ত সব সময় স্পষ্ট থাকে না। এর একটা কারণ এই যে উপনিবেশ আর সাম্রাজ্য মানুষের সারা ইতিহাস জুড়ে আছে আর মানেটা বদলেছে। গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল ভূমধ্যসাগরে, অথবা ভারতীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, সেগুলি ছিল আদি অর্থে উপনিবেশ অর্থাৎ স্বদেশ থেকে বিদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন। বঙ্কিমচন্দ্র এই অর্থে 'ঔপনিবেশিকতা' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ('বাঙালীর ইতিহাস', বঙ্গদর্শন, ১২৮১ বঙ্গাব্দ)। এই ঔপনিবেশিকতা শব্দটাই চলে এসেছে কিন্তু মানে বদলেছে। আধুনিক যুগে আদি অর্থে উপনিবেশ ইউরোপ গড়ে তুলেছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে আমেরিকা থেকে শুরু করে উনিশ শতকে অস্ট্রেলিয়া অবধি নানা জায়গায়। আর সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঔপনিবেশিকতা দেখা গেল এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে, যেটা পৃথিবীতে ইউরোপের বাণিজ্যের প্রসার ও পরে পশ্চিম ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পরিণতি, বিদেশে ইউরোপীয় জনসমাগমের ফল নয়। 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলি বেশীর ভাগই প্রাক্তন উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ ছিল বিংশ শতকের প্রথম ভাগ অবধি অথবা এখনও আছে, রাজনৈতিক অর্থে না হলেও অর্থনৈতিক ভাবে। কিন্তু এদের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা নানা ধরনের, তাই এদের সম্বন্ধে 'ঔপনিবেশিকতা' শব্দটা একই অর্থ ঠিক বহন করে না। আর একটা ব্যাপার এই যে উপনিবেশিত ভারতে সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়কেরা, দাদাভাই নওরোজি থেকে শুরু করে শতাধিক বৎসর, যে ভাবধারায় লিখেছেন তাতে রাজনৈতিক পরাধীনতা, দিশি বণিক শ্রেণীর সুযোগ সুবিধার অভাব, এদেশের অর্থনৈতিক বিকাশে বৃটিশ সরকারের বিরোধিতা, ইত্যাকার জিনিসগুলি প্রাধান্য পায়। আর অপর পক্ষে মানবেন্দ্রনাথ রায় কি রজনী পাম দত্তের কাল থেকে মার্কসীয় বিশ্লেষণে ঔপনিবেশিকতা আরও এক ধরনের ব্যঞ্জনা পায়, যেখানে সেটাকে পৃথিবী-ব্যাপী ধনতান্ত্রিক বিকাশের অঙ্গাঙ্গি হিসেবে দেখে সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে পুঁজির প্রকৃতি, উপনিবেশিত সমাজের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য ও শোষণ, সাম্রাজ্যবিরোধী যুদ্ধের সমান্তরাল শ্রেণীযুদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই দুই ভাবধারা ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস চর্চায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানা সৃষ্টি করেছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে 'ঔপনিবেশিকতা' শব্দের নানা মানে। ভারতীয়

উপমহাদেশে ১৯৪৭-এর আগে ঔপনিবেশিকতা কি অর্থে ছিল সেটা বুঝতে ঐতিহাসিকেরা কি উত্তর দেয় জানাটা জরুরী। এই বইটিতে কয়েক পাতায় তাদের উত্তরের মোদ্দা কথাটা ধরবার চেষ্টা করেছি।

২

ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের নানা ঘরানা। এদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে পুরোন সেটা ইংরেজ প্রশাসকদের এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সাম্রাজ্যের সমর্থকদের হাতে তৈরী। এই ঐতিহ্য এখনও বহমান হালের কিছু গবেষণায়, তবে এই ছোট তরফের সেই সাবেকি প্রতিষ্ঠা নেই যা ছিল এককালে স্যার রিচর্ড স্ট্রেচি, স্যার থিওডর মরিসন, জর্জ চেস্‌নি, ভেরা এন্‌স্টি ইত্যাদির আমলে। অন্য একটা ঘরানা গড়ে ওঠে ইউরোপে যেটা সেখানে পুঁজিবাদের মাটিতে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছে। জন হব্‌সন, রুডলফ্‌ হিল্‌ফরডিং, রোজা লুক্‌সেমবুর্গ, লেনিন এই ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তৃতীয় ধরনের চিন্তাধারার জনক উনিশ শতকের শেষ থেকে এদেশে বেড়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিকদের লেখায়। যথা দাদাভাই নওরোজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রমুখ। ভারতে কনিষ্ঠতর ও ভিন্নতর চিন্তার ধাঁচ মার্কস্‌ প্রভাবিত অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চায় দেখা যায় : মানবেন্দ্রনাথ রায়, রজনী পাম দত্ত, দামোদর দত্তাত্রেয় কৌশাম্বী ইত্যাদি। ইতিহাস এষণার এই চারটি ঐতিহ্যের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-এক কথা বলা দরকার। পরে অনেক জায়গায় দেখব যে হালের ঐতিহাসিকেরা এই বিভিন্ন ঘরানার যুক্তি তর্ক গল্পে বার বার ফিরে যান।

যেহেতু হালের গবেষণার ধারা সম্বন্ধে একটা ধারণা রাখা আমাদের উদ্দেশ্য, তত্ত্বের পুরুষানুক্রমিক কুলপঞ্জিকা তৈরী নয়, আমরা মূলতঃ এই শতকের সীমার মধ্যে এই বিভিন্ন ঘরানার বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যগুলি আঁচ করতে চেষ্টা করব কেবল। এই শতকের গোড়ায় জন্‌ হব্‌সন-এর 'সাম্রাজ্যবাদ' *(Imperialism)* (১৯০২) নামে বইটা একটা আলোড়ন আনে। হব্‌সন মোটেও মার্কস্‌ ভক্ত ছিলেন না, তিনি ইংলণ্ডের লেবর পার্টির বুদ্ধিজীবী। সাম্রাজ্য কেন ? তার প্রতিপাদ্য ছিল যে ভারত, মিশর, চীন ইত্যাদি দেশে যে সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিয়েছিল সেটার সঙ্গে পশ্চিমের পুঁজিবাদী বা ধনিকতন্ত্রী দেশগুলির অর্থনৈতিক কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় আয়ের অসাম্যের দরুণ মজুর শ্রেণীর বেতন ও ক্রয়ক্ষমতা কম, যদিও তারা সংখ্যায় অনেক। এর মানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা মৌল লক্ষণ জাতীয় আয়ের অসম বণ্টনের দরুণ জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ প্রয়োজনানুরূপ উপভোক্তা (Consumer) নয়। একে হব্‌সন বলেছেন অল্প-উপভোগ (under-consumption) সমস্যা। ওই যদি হয় তবে শিল্পপতিদের সমস্ত উৎপন্ন দেশে বিক্রী হয় না, বিদেশে বিক্রীর চেষ্টা দরকার। সুতরাং ইউরোপের শিল্পায়িত দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও

আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের পথে এবং/অথবা অনগ্রসর দেশগুলিকে বাজার হিসেবে দখল করার জন্য তাদের উপনিবেশিত করার পথে যেতে বাধ্য। আর একটা ব্যাপার এই যে অল্প-উপভোগ সমস্যা দেশের বাজারকে যদি এই ভাবে সীমিত রাখে, তবে শিল্প পুঁজির বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত হতে বাধ্য। এদিকে পুঁজিবাদী অসাম্যের জন্য পুঁজিপতিদের লাভ জমছে (অতিসঞ্চয় বা over saving) -আর বিনিয়োগের রাস্তা খুঁজছে, অপরদিকে বিনিয়োগের সুযোগ কমছে। অতএব পুঁজি বিদেশে বিনিয়োগ করা দরকার : ফল একই, মানে প্রাগ্রসর দেশগুলির দ্বারা অনগ্রসর দেশ উপনিবেশিত করে বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরীর চেষ্টা।

এভাবে হব্‌সন অল্প-উপভোগ এবং অতি-সঞ্চয় তত্ত্বের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর অবধারিত পরিণাম হিসেবে দেখান। পরের দশকে এই ধারায় তিনটি প্রভাবশালী বই প্রকাশ পায় ১৯১০, ১৯১৩ এবং ১৯১৬ সালে, লেখক হিল্‌ফরডিং, লুক্‌সেমবুর্গ এবং লেনিন। রুডল্‌ফ হিল্‌ফরডিং ছিলেন ভিয়েনাতে সুপরিচিত অর্থনীতিক হিসেবে, জর্মনির সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতাদের একজন এবং তিনি দুই বার অর্থমন্ত্রীও হয়েছিলেন। নাৎসিবাদ ও হিটলারের বিরুদ্ধতা করে পরাজিত হয়ে যারা জর্মনি ছেড়েছিলেন তাদের মধ্যে ইনি একজন; প্যারিস শহর হিটলারের কবলে পড়ার পর ধরা পড়ে নির্যাতনে মারা যান অথবা আত্মহত্যা করেন। 'বিত্ত সাম্রাজ্যবাদ' ***(Finance Imperialism)*** গ্রন্থে তিনি ইউরোপীয় পুঁজির কাঠামো আর বিদেশী বিনিয়োগের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের যোগাযোগ দেখিয়ে দেন। এর সঙ্গে নাম করা যায় আর একজনের, রোজা লুক্‌সেমবুর্গ : এই মহিলার পোলাণ্ডে জন্ম, কর্মক্ষেত্র জর্মনির সাম্যবাদী আন্দোলন, মৃত্যু নাৎসিদের হাতে। এর 'পুঁজির বৃদ্ধি' ***(Accumulation of Capital)*** নামক গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের প্রাক্‌-শিল্পবিপ্লব দিকটার ওপর' অভিনিবেশ দেখা যায়, যেটা হিল্‌ফরডিং ও লেনিনের নেই। লেনিনের পুস্তিকাটি সবচেয়ে বিখ্যাত, 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের শেষ পর্যায়' ***(Imperialism the Highest Stage of Capitalism)***; তার অন্য কিছু লেখা (যথা, সাইবেরিয়াতে নির্বাসনকালীন গবেষণা, রুশদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ সম্বন্ধে) তুলনায় এই পুস্তিকাটি ততটা গবেষণা-সমৃদ্ধ নয়। ১৯১৬ সালের সাময়িক পরিস্থিতিতে এটা দেখতে হবে : লেনিনের উদ্দেশ্য ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রকৃত চেহারা, পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেখানো যে জনগণের সংগ্রাম আর পুঁজির স্বার্থের সংগ্রাম ভিন্ন। যাই হোক, এই ধারার আলোচনায় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে উনিশ শতকের শেষভাগে ও মহাযুদ্ধের আগে আফ্রিকা এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের পেছনে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির দিকে, বিশেষভাবে ইউরোপে শিল্পের ওপর ব্যাংক ও অন্যান্য বিনিয়োগ সংস্থার পুঁজির প্রভাব, কারটেল জাতীয় একচেটিয়া ব্যবসার পত্তন ও ক্রমবর্ধমান প্রভুত্ব, ইউরোপের অতিরিক্ত পুঁজি উপনিবেশে বিনিয়োগ করার প্রবণতা, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে পুঁজির স্বার্থের সংঘাত জনিত যুদ্ধপ্রস্তুতি,

প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকা।

বলা বাহুল্য এই আলোচনার ধারায় ইউরোপটাই রঙ্গমঞ্চ, 'নেপথ্যে আর্তনাদ' উপনিবেশিত এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীর। স্বভাবতঃ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিকদের দৃষ্টিকোণ আলাদা, সেখানে উপনিবেশিতদের সমস্যাটাই সামনে। নওরোজি, রানাডে, রমেশচন্দ্র দত্ত ইত্যাদি যে পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দিকটা দেখেছিলেন তা বহুল পরিচিত। মূল কতকগুলি উপাদান দু-এক কথায় বলা যায়। এক, অবশিল্পায়নের তত্ত্ব, অর্থাৎ দিশি শিল্পের বিনষ্টি, ইংলণ্ডের কারখানার সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা ও সরকারি সমর্থনের অভাবের দরুণ। দুই, অবাধ বাণিজ্য নীতি (Free Trade) প্রভাবিত বৃটিশ ভারতের শুল্কনীতির কুফল, বিদেশী শিল্পদ্রব্যের প্লাবন, সস্তায় কাঁচামাল—এমন কি নিরন্ন দেশের খাদ্যশস্য—বিদেশে পাচার। তিন, অতিরিক্ত উঁচু হারে ভূমিরাজস্ব নিষ্কাশন করে কৃষিব্যবস্থার সর্বনাশ, ফলত উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব। চার, রাজস্ব দেশের উন্নতিকল্পে (যথা সেচ ব্যবস্থা) বিনিয়োজিত না হয়ে ইংরেজ স্বার্থে (যথা রেল কোম্পানি) খরচ করার সরকারি নীতি। পাঁচ, ধন নির্গমন (drain of wealth) তত্ত্ব : অর্থাৎ দেশ থেকে টাকা বা পণ্যের আকারে ধন বিদেশে পাচার, অংশত বেসরকারি ব্যবসার নির্গম পথে, অংশত ভারত সরকারের ইংলণ্ডে দরাজ খরচের খাতায়। ইত্যাকার তত্ত্বের সঙ্গে যথেষ্ট তথ্যের সমাহারে জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিকেরা উপনিবেশিত ভারতের শোষিত অবস্থাটিকে অনাবৃত করে জনমানসে যে প্রভাব বিস্তার করেন তার রাজনৈতিক ফল সুবিদিত। তাছাড়া আমরা পরে নানা পরিচ্ছেদে দেখতে পাব যে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সমর্থনে বা সমালোচনায় গবেষণা আধুনিক ইতিহাস চর্চাকে এগিয়েছে।

এই সমালোচনার মূল ধারাটি প্রণিধানযোগ্য। উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যারা এখনও ইতিহাস চর্চা করেন তাদের প্রবণতা হল বিদেশী শাসকের স্বার্থের সঙ্গে দেশের স্বার্থের সংঘাত ছাড়াও যে দেশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বর্গের অসাম্য ও সংঘাত ছিল সে ব্যাপারটার দিকে দৃষ্টি না দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর বিকাশ সমার্থক ধরে নেওয়ার দিকে ঝোঁক। তৃতীয়তঃ, রাজনীতির ইতিহাস আর অর্থনীতির ইতিহাস পৃথককরণ দ্বারা স্বার্থগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া অগ্রাহ্য করার প্রবণতা। চতুর্থতঃ, সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সামিল, অথবা ভিন্নতর, সাধারণ মানুষের আন্দোলন, প্রতিবাদ, দৈনন্দিন বিগ্রহ, চেতনা, ইত্যাদি অবহেলিত রেখে একপেশে ধরনের ইতিহাস চর্চা।

এই প্রবণতা উনিশ শতকীয় (যদিও এখনও কিছু ঐতিহাসিকের লেখায় টিঁকে আছে হয়ত), এটা ঐ সময়কার মধ্যবিত্ত শহুরে বিদ্যাজীবী শ্রেণীর রাজনৈতিক কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় এবং হয়ত তৎকালীন অবস্থায় সমর্থনযোগ্য। জাতীয়তাবাদী রণকৌশলে একটা বড় জিনিস হল দেশের মধ্যে

শ্রেণীবৈষম্য নয়, রাজা ও প্রজার মধ্যে জাতিবৈষম্যকে প্রাধান্য দেওয়া, সমগ্র দেশ বনাম বিদেশী শাসকদের মধ্যে বিভেদটাকে তুলে ধরে শ্রেণীনির্বিশেষে পদানত জাতিটিকে একত্র করা, জাতীয় চেতনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে জনমানসে সঞ্চারিত করা। এই কৌশলের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে এবং হয়েছে। তবে তৎকালীন পরিবেশে এর যাথার্থ্য এক জিনিস, আর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এই দৃষ্টিভঙ্গী এখনও বজায় রাখা আর এক জিনিস। সব শেষে এটা মনে রাখা দরকার যে জাতীয়তাবাদ যে সব কারণে এই ধরনের প্রবণতা পেয়েছিল তার একটা হল জাতীয়তাবাদী নেতাদের ধ্যানধারণার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দেশপ্রেমের দূরত্ব। এখানে জাতীয়তাবাদ ও দেশেপ্রেমের মধ্যে পার্থক্যটা ধরা দরকার। দেশপ্রেম ইংরিজিতে শিক্ষিত শহুরে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৃষ্ট নয়। তা আগেও ছিল, যদিও 'দেশ'-এর ধারণা বিভিন্ন মাতৃভাষার গর্ভে নানারূপ ধারণ করেছিল, আর্যাবর্ত, পিতৃভূমি, হিন্দুস্তান, ওয়তন, কওম ইত্যাদি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ সেন, তারাচাঁদ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, শশীভূষণ চৌধুরী, প্রমোদ সেন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের বিতর্ক থেকে অনেক বিসংবাদের মধ্যে এইটা বোধহয় শেখা যায় যে 'দেশপ্রেমী' ও 'জাতীয়তাবাদী' এক নয়। যাই হোক, সাবেকি দেশপ্রেম, যেটা জনমানসে নানা সংকেতে ও ভাষায় লিপিবদ্ধ, যেটা হাটের মাঠের মানুষের দেশপ্রেম, আর বুদ্ধিজীবী নেতাদের সভাসমিতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে দূরত্ব আছে, আবার সহযোগও আছে। দেশপ্রেম মাঝে মাঝে টুপি এঁটে জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাজে লেগে পড়ে। কিন্তু এদের একাত্ম ভাবা ভুল হবে বোধহয়। জাতীয়তাবাদী নেতাদের রাজনীতি থেকে সাধারণ লোকদের দূরত্ব রবীন্দ্রনাথ দু-এক কথায় বলেছিলেন 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে (১৩১৪):

> আজ আমাদের ইংরেজি জানা শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে আমরা উভয়ে ভাই—তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে আমরা 'চাষা ব্যাটা' বলিয়া জানি, যাহাদের সুখদুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গবর্নমেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়...আজ হঠাৎ ভাই সম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস [অর্থাৎ স্বদেশী শিল্পদ্রব্য] কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা।

এই দূরত্ব, উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদের এই সীমাবদ্ধতা এখানে খুব সহজ করে বলা হয়েছে। আমরা পরে দেখব যে ইতিহাসে এই সমস্যার আলোচনা এখনকার দিনের গবেষণায়, আধুনিক ইতিহাস চর্চায়, অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

৩

ইউরোপীয় সাম্যবাদী ধারায় সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণ ও ভারতে জাতীয়তাবাদী সমালোচনার বিরুদ্ধ মত জাহির করে বেশ প্রভাবশালী একটা মতগোষ্ঠী তৈরী হয়। ১৯০০ সালে লর্ড কার্জন (রমেশ দত্তের সঙ্গে বিতর্ক) থেকে শুরু করে থিওডর মরিসন, ভেরা এন্‌স্টি, পর্সিভল গ্রিফিথ্‌স এবং তারও পূর্বে জর্জ চেস্‌নি, রিচর্ড স্ট্রেচি ইত্যাদি এই ঐতিহ্যের ধারক এবং এর প্রভাব এখনও চলছে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায়। যদিও আমরা এদের একত্র করে একটা মতগোষ্ঠী বলছি,প্রকৃতপক্ষে ঠিক একাগ্র যুক্তিধারা নেই, যেহেতু এর উৎপত্তি নানা মতের বিরোধে, বৃটিশ রাজের সমালোচনা খণ্ডনের চেষ্টায়। সুতরাং চট্ করে 'সাম্রাজ্যপন্থী' লেবেলটা যার-তার গায়ে এঁটে দেওয়া অনুচিত হবে। তবে সকলের পক্ষে না হলেও যাদের নাম ওপরে করা হল তাদের পক্ষে লেবেলটা বেশ জুৎসই। হালের গবেষণায় এদের মতের আংশিক সমর্থন দেখা যায় যাদের লেখায় তাদের বক্তব্য মোটামুটি এই ধরনের : এক, সাম্রাজ্যের মালিক দেশগুলি উপনিবেশগুলিতে বেশী পুঁজির বিনিয়োগ মোটেও করেনি, বরঞ্চ সমকক্ষ স্বাধীন ইউরোপীয় বংশোদ্ভবদের দেশেই ইউরোপের পুঁজি বেশী পরিমাণে গেছে ; অর্থাৎ হিল্‌ফরডিং ইত্যাদির তত্ত্ব ভুল। দুই, উপনিবেশিত দেশগুলির আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্যের নেতৃত্বের দরুণ : রেলপথ, রাস্তা, বন্দর, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ইত্যাদিতে অর্থনীতির নীচের কাঠামো (infrastructure) তৈরী করার পুঁজি ও কারিগরি কুশলতা একমাত্র পাশ্চাত্য থেকেই আসতে পারত, নচেৎ উপনিবেশিত এশিয়া ও আফ্রিকা যথাপূর্ব অনগ্রসর থেকে যেত। তিন, উপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়ায় ইউরোপের দেশগুলির পুঁজিপতি শ্রেণীর হাত ছিল না, সুতরাং সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে ইউরোপের পুঁজির স্বার্থের কোনও সম্পর্ক ঐতিহাসিক দলিলে প্রমাণ হয় না।

গত তিন দশকে অনেক প্রভাবশালী গবেষক এই ধাঁচের যুক্তি দ্বারা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তাই এই তিনটি প্রতিপাদ্য পরীক্ষা করা দরকার।

(১) প্রথম যুক্তিটির পক্ষে আলবর্ট ইমলাহ্, কেয়ার্নক্রস, ম্যাথু সাইমন ইত্যাদির গবেষণা রয়েছে। আধুনিকতম সাইমনের হিসেব : ১৮৬৫-১৯১৪ সালে ইংলণ্ডের শেয়ার বাজারে বহির্বিশ্বে বিনিয়োগের জন্য সংগৃহীত পুঁজির হাজার হাজার তথ্য তিনি কম্পিউটরে বিশ্লেষণ করেন। তার মতে ঐ পুঁজির মাত্র ৪০ শতাংশ ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের ভেতরে বিনিয়োগ হয়, ৫৯ শতাংশ অন্য স্বাধীন দেশে, ১ শতাংশ অপর দেশের উপনিবেশে। তাছাড়া, এই পুঁজির মাত্র ১৪ শতাংশ এশিয়াতে এবং ১১ শতাংশ আফ্রিকাতে যায় ; তুলনায় অনেক বেশী উত্তর আমেরিকায় (৩৪ শতাংশ), ও দক্ষিণ আমেরিকায় (১৭ শতাংশ)। মোট বৃটিশ পুঁজির ৬৮ শতাংশ বিনিয়োগ হয় ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত বাসিন্দাদের দেশে, যথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদি। মোট কথা,

ইউরোপের পদানত কালা আদমিদের দেশ উপনিবেশিত হলেও, ইংলণ্ডের পুঁজির বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এখন এই যুক্তির দুর্বলতাগুলি দেখান দরকার। এক, শেয়ার বাজারের তথ্য এর ভিত্তি, কিন্তু তা ছাড়াও প্রচুর ইংরেজ পুঁজি উপনিবেশে ছিল যেটা এই হিসেবের মধ্যে নেই। যেমন ভারতে অনেকটা ইংরেজপুঁজি উনিশ শতক থেকে পুরোন ম্যানেজিং এজেন্সিদের হাতে, এই টাকা ইংলণ্ড থেকে আসেনি, ভারতেই ইংরেজদের লুঠ বা লাভ বা বেতন জনিত সঞ্চয় পুনর্বিনিয়োগের ফলে গড়ে উঠেছিল। এরকম সরাসরি বিনিয়োগ ছাড়াও যেসব ইংরেজ পুঁজি ব্যাংকের মারফৎ উপনিবেশে গেছে, অথবা বিদেশী শেয়ার বাজারে বিনিয়োজিত হয়েছে, সেসবও সাইমনের হিসেবে ধরা হয়নি। অতএব এই হিসেবে তথ্যের অসম্পূর্ণতার জন্য উপনিবেশে ইংরেজ পুঁজির পরিমাণ লঘু করে দেখা হয়েছে। দুই, কেবল মাত্র ১৮৬৫ সালের পর থেকে হিসেব করা হয়েছে, কিন্তু মোটা পরিমাণ পুঁজি তার আগেই ইংলণ্ড থেকে উপনিবেশে চলে গিয়েছিল। যথা লেলণ্ড জেংক্‌স্‌-এর হিসেব অনুসারে ১৮৫৭-১৮৬৫ সালে কয়েক বৎসরে অন্তত ১৫ কোটি পাউণ্ড ইংরেজ পুঁজি ভারতে আমদানি হয়েছিল, রেল কোম্পানি, সরকারি ঋণ, চা বাগান, জাহাজ কোম্পানি ইত্যাদিতে। সুতরাং এখানেও তথ্য অসম্পূর্ণ।

যাই হোক্ এই জাতীয় হিসেবগুলি নস্যাৎ করা বোকামি হবে। এখন আর এতে সন্দেহ নেই যে (তথ্যের দুর্বলতা থাকলেও) সাইমন ইত্যাদির হিসেব দেখিয়েছে যে পূর্বের বিত্ত সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বে উপনিবেশে ইউরোপীয় পুঁজির রপ্তানি ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল সেটা বাড়াবাড়ি রকমের। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, খুব বড় অংশ কালা আদমিদের দেশে আসেনি। কেন ? বিদেশী পুঁজি অনেক পরিমাণে উপনিবেশেই সঞ্চিত হয়েছিল, বিদেশ থেকে আমদানি হয়নি ; তাছাড়া গরীব দেশে ক্রয়ক্ষমতা কম বলে বিনিয়োগের সুযোগ কম ; তৃতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্যনীতি ভারতের মত উপনিবেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেনি, অপর পক্ষে স্বাধীন দেশগুলিতে আমদানি শুল্ক দ্বারা শিল্প সংরক্ষণ (protective tariff) নীতি বিনিয়োগের পক্ষপাতী, সুতরাং সেদিকেই বেশী পুঁজি গিয়েছিল।

(২) সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর আর একটা প্রতিপাদ্য এই যে সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে আধুনিকীকরণ ঘটেছিল। আধুনিক রাস্তা, বন্দর, রেলপথ, যন্ত্রপাতি, জাহাজ ইত্যাদি বৃটিশ অবদান, এ জন্য কৃতজ্ঞতার অভাব সাহেবদের পক্ষে পীড়াদায়ক। এসব ভাল জিনিস, তবে প্রথম কথা হ'ল যে এগুলো বিনে পয়সায় আসেনি, করদাতা কিংবা উপভোক্তা ভারতীয় টাকার বিনিময়ে পেয়েছে, ব্যবস্থাপক হিসেবে ইংরেজ প্রশাসকের মোটা মাইনে এবং ব্যবসায়ীর লাভ। দ্বিতীয়তঃ, এসব যে উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল তা হ'ল দেশটার অর্থনৈতিক কাঠামো (infrastructure) এমন ভাবে তৈীর করা যাতে কাঁচা মাল রপ্তানি, শিল্পদ্রব্য আমদানি, অন্তর্দেশীয় বাজারে অনুপ্রবেশ, বহির্বাণিজ্যের

জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংক বীমা জাহাজ কোম্পানি ইত্যাদি সুবিধাজনক হয়। দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ বিনা আধুনিকীকরণ একটা বাহ্যিক আড়াল, যার পেছনে 'অনগ্রসরতার অগ্রসরণ' (development of underdevelopment) চলতে পারে। আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাঙ্ক-এর এই মতের সমর্থনে অনেক ঐতিহাসিক এটাও দেখিয়েছেন যে আধুনিকীকরণ একটা বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, যেন দেশের মধ্যে দ্বীপের মতন 'বৈদেশিক তালুক' (foreign enclave)—যথা বহির্বাণিজ্যের ব্যবস্থা, বিদেশী পুঁজির অধীন কিছু শিল্প, কয়েকটি ঔপনিবেশিক শহর, ইত্যাদি। এই 'আধুনিক' ক্ষেত্রের বাইরে যথাপূর্ব কারিগরি, ব্যবসা ব্যবস্থা, পরিবহণ।

এই প্রসঙ্গে একটা শক্তিশালী বিশ্লেষণধারা এসেছে ব্যেকে প্রমুখ ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে। ব্যেকের মতে উপনিবেশে একটা দু'তলা অর্থনীতি সৃষ্টি হয়। ওপরের তলায় 'ব্যবস্থিত ক্ষেত্র' (organised sector) যেখানে আধুনিক কারিগরি কৌশল, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, ব্যাংক, আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থা ইত্যাদি। আর নীচের তলায় প্রাক্-শিল্পবিপ্লব কুটির শিল্পের কারিগরি, কোম্পানির জায়গায় অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ব্যবসা, ব্যাংকের বদলে সনাতন মহাজন, অন্তর্দেশীয় সওদাগরিতে পাইকার-ফড়ে-শেঠ-সরফদের সাবেকি চালচলন। এই দু'তলা অর্থনীতিতে (dual economy) ওপর তলাটাকে আধুনিক যদিও বলা যায়, নীচের তলা কখনই নয়।

অনেকে বলেন যে আধুনিক যন্ত্র, পরিবহণ, কারিগরি কৌশল সাবেকি অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে বাধ্য, যেহেতু উৎপাদনের প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক দীর্ঘ সময়ের দিগন্তে এমন সম্ভাবনা হয়ত দেখা যায়। (কার্ল মার্কস্-এর আশা ছিল যে রেলপথ ভারতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করবে; কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে সেটা কি ঘটেছিল ?) সমস্যা এই যে বিদেশাগত যন্ত্রের আবির্ভাব অর্থনৈতিক বিকাশের রাস্তায় উপনিবেশকে বেশীদূর ঠেলতে পারে না। উনিশ শতকে ইংলণ্ডে রেলপথ একটা বিপ্লব কেননা তার পেছনে এঞ্জিনিয়রিং শিল্প, তার পেছনে ইস্পাত কারখানা, তার পেছনে খনিজ নিষ্কাশন, এসব বেড়ে ওঠে। এই ব্যাপারটাকে অর্থনীতিবিদেরা পেছনের পারম্পর্য শৃঙ্খল (backward linkage) বলেন; অনুরূপ বৃদ্ধি সামনের দিকেও হয়। কিন্তু ভারতে রেলপথ যেন আকাশ থেকে পড়ল, গজিয়ে উঠল না অনুকূল পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এখানে কেবল মাত্র রেল এঞ্জিন, যন্ত্র এসব আমদানি হ'ল, কিন্তু এদেশে তৈরী নয় বলে তার সঙ্গে ইস্পাত শিল্প, ভারী এঞ্জিনিয়রিং শিল্প ইত্যাদি তৈরী হল না। তাই আধুনিক যন্ত্র ও কারিগরির ধাক্কা কমজোর।

আপাততঃ অর্থনীতির সীমিত অর্থে 'আধুনিকীকরণ' আমাদের আলোচ্য ছিল; আরও ব্যাপক অর্থে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, ঔপনিবেশিক আমলে তথাকথিত আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াটাও যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন

সেটা বোধহয় সন্দেহাতীত।

(৩) এখন দেখা যাক্ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিপক্ষের তিন নম্বর যুক্তি ধোপে টেঁকে কি না। যুক্তিটা এই যে সাম্রাজ্যের মালিক দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থ যে সাম্রাজ্যবিস্তার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে এমন প্রমাণ নেই। অধ্যাপক জন গ্যালাহর ও রবিনসন, ফিল্ডহাউস এবং কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু গবেষকদের লেখা এই ধারা। উদাহরণতঃ গ্যালাহর অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণায় প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে ভিক্টোরিয়ার আমলে আফ্রিকায় ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে ব্যবসায়ী শ্রেণীর কোন হাত ছিল না। তাদের স্বার্থের কথা ইংলণ্ডের মন্ত্রীমণ্ডলী, বিদেশ দপ্তর, বহু মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে প্রায় অনুল্লেখিত। বিদেশ ও ঔপনিবেশিক নীতির নির্ধারকেরা প্রায় সবাই অভিজাত জমিদার শ্রেণীর, ব্যবসার সম্বন্ধে তাদের তেমন মাথাব্যথা ছিল না। সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে অন্য কারণে, বিশুদ্ধ রাজনৈতিক কারণে। ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির দ্বন্দ্বের ফলে প্রত্যেকে অপরকে কিস্তি মাত করার জন্য জমি দখল করতে থাকে। এই প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকের চেষ্টা অপরকে বঞ্চিত করে অগ্রাধিকার স্থাপন করা। তাছাড়া সাম্রাজ্য রক্ষণের জন্যই বিস্তার : সুয়েজ খাল হাতে রাখতে মিশর হাত করা দরকার, মিশর বাঁচাতে কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা, ইত্যাদি। গ্যালাহর প্রমুখের মতে এসব রাজনৈতিক ব্যাপারই সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রকৃত কারণ। তার মানে কি তাহলে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা চলে না?

এটা সত্য যে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই, বিংশ শতকের প্রথম অবধি অন্ততঃ, ইংলণ্ডের দৃশ্যমান নীতিনির্ধারক—মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ আমলা হিসেবে। গ্যালাহর-এর অনেক আগেই অর্থবিজ্ঞানের এক দিক্‌পাল, শুম্‌পেটর, সামাজিক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে গ্রন্থে বলেছিলেন যে শিল্পবিপ্লবের পরেও রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরা প্রাক্-আধুনিক যুগের শ্রেণী উদ্ভূত, তাদের পেছনে আছে বংশানুক্রমে জমিদারি ও সামরিক ঐতিহ্য ; এই শ্রেণীর লোকদের রাজ্য বিস্তারের মধ্যযুগীয় মানসিকতা পুঁজিবাদী বিচারে যুক্তিহীন ; সুতরাং আধুনিক ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে পশ্চাৎ-মুখী (atavistic) মনোবৃত্তির পরিণাম। কিন্তু শুম্‌পেটরের মতটা তার দেশ জর্মনি, বিশেষ প্রুশিয়া সম্বন্ধে যতটা সত্য, ইংলণ্ডে ততটা নয়। এবং এই সব দেশেই অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উচ্চবর্গের বিবাহসূত্রে মিশ্রণ ও স্বার্থের একাত্মতা উনিশ শতকে ক্রমবর্ধমান। দ্বিতীয়তঃ কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে কে কোন বংশজ বা শ্রেণীজ সেটা অবধারিতভাবে প্রত্যেকের ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারে না, সামগ্রিক ভাবে সমাজের কাঠামো ও প্রবণতা দেখা দরকার। যথা ইংলণ্ডে মন্ত্রী যতই অভিজাত বা অনভিজাত হোন না কেন, গণতান্ত্রিক কাঠামোর দরুণ, প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীসমূহের স্বার্থ অগ্রাহ্য করতে অপারগ। এর একটা উদাহরণ, রমেশচন্দ্র দত্ত বার বার প্রমাণ করেছেন ম্যান্‌চেষ্টর শিল্পপতি ও পার্লামেণ্ট সদস্যদের প্রভাব ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা ও তার সদস্য ভারত সচিব (Secretary of State for

India) ইত্যাদির ওপরে। সুতরাং, রাজনৈতিক যন্ত্রের ওপরতলার দিকে তাকালে সুতি কলের মালিক কি চা-বাগান-ওয়ালাদের দেখা যায় না, পরোক্ষে ব্যবসায়ী স্বার্থগোষ্ঠী (interest group) প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ইংরেজ বৈদেশিক নীতিতে অধ্যাপক প্ল্যাট-এর গবেষণা, অথবা পশ্চিম ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে পামেলা নাইটিংগেল-এর গবেষণা, অথবা ইংরেজদের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে প্রচুর ঐতিহাসিকের কাজ, এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

ইদানিং দেখা যায় যে সাম্রাজ্যবাদের যে ব্যাখ্যা চালু তাতে পুরোন অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে নতুন বিত্তশালী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে যোগসাজস হল তার ওপর জোর দেওয়া হয়। অধ্যাপক হপকিন্‌স্ ও কেইন প্রকাশিত (১৯৮৭) হালের অনেকগুলি গবেষণার জরীপ থেকে সিদ্ধান্ত: ১৮৫০-১৯৪৫ ইংলণ্ডে 'ভদ্রলোকের পুঁজিবাদ' (gentlemanly capitalism) তৈরী হচ্ছিল যার অর্থ ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন অথচ অভিজাত শ্রেণী, অধুনা প্রতিপত্তিশালী ব্যাংক সংশ্লিষ্ট পুঁজির মালিক, এবং বিশেষ প্রশিক্ষিত কিছু পেশার উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান আধিপত্য। এই গোষ্ঠীর লোকগুলি পাবলিক স্কুলে শিক্ষা, উচ্চকোটীর ক্লাব, বৈবাহিক সম্বন্ধ, ইত্যাদির মাধ্যমে একীভূত হচ্ছিল ; কারখানা মালিকেরা এই গোষ্ঠীর সঙ্গে ঠিক মিশ খায়নি। ১৮৫০ সাল থেকে আবার শিল্পের বৃদ্ধির হার পড়ে যায়, তৃতীয় প্রাকরণিক ক্ষেত্রে (tertiary sector) বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে বেশী। মোদ্দা কথা, অধ্যাপকদ্বয়ের মতে যে স্বার্থসমাবেশ ইংলণ্ডে আধিপত্য করে তাদের মধ্যে শিল্পের জায়গা নীচে, অন্য ধরনের বিত্ত—বিশেষ ব্যাংক ও তৃতীয় প্রাকরণিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিত্ত—ওপরের তলায়। আর এই সমাবেশে উচ্চমধ্যবিত্তরাও সামিল আছে। এই স্বার্থসমাবেশ সাম্রাজ্যনীতির নিয়ামক। এখন এই ছবিটা নজর করলেই বোঝা যায় যে একটা ভুল সম্ভবতঃ এতে আছে : বৃদ্ধির হার শিল্পে ইতিপূর্বেই বেশী ছিল এবং তৃতীয় প্রাকরণিক ক্ষেত্রে সবে শুরু হল বলে আপাতদৃষ্টিতে নতুন বৃদ্ধিটা বড় হয়ে চোখে পড়ে। এর মানে এই নয় যে শিল্প তার গুরুত্ব হারালো। এই ভুল বাদে বাকী ছবিটা পূর্বপরিচিত। এখানে পুঁজির আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে তার সমর্থক মিত্রগোষ্ঠীর সামাজিক কাঠামোটার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে মার্কস্ প্রভাবিত আলোচনায় হয়ত কিছুটা যান্ত্রিকভাবে পুঁজির আধিপত্য ও নিয়ামক ভূমিকাটাকে দেখা হয়েছিল, স্বার্থসমাবেশের সামাজিক কাঠামো আরও জটিল (এটা মার্কস্-এর ঐতিহাসিক লেখাগুলোতে স্পষ্ট, যথা লুই নেপোলিয়নের সময়ে ফ্রান্সের সম্বন্ধে আলোচনায়)।

ইতিহাস চর্চার নানা ঘরানার পর্যালোচনায় যে সব মূল প্রশ্ন তোলা হ'ল পরের পরিচ্ছেদগুলোতে সে সব প্রশ্নে ফিরে আসতে হবে আমাদের। সব শেষে, মনে রাখা দরকার যে উপনিবেশতন্ত্রের সওদাগরি ও সরকারি দপ্তরে, বাজারে, কারখানায়, বিধানসভায়, যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছিল (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে হয়নি) সেটা (অথবা সেটার অভাব) নিয়ত আমাদের প্রভাবিত করে। ১৯৪৭ সাল থেকে এই দেশে, এবং এই উপমহাদেশস্থ দেশগুলিতে, অর্থনৈতিক

বিকাশ—অথবা কোনো ক্ষেত্রে পূর্বানুবৃত্তি—প্রভাবিত হয়েছিল প্রাক্-স্বাধীনতা অর্থনীতির গড়ন ও চলন দ্বারা। গত চার দশকে যে সমাজ ও অর্থনীতি গড়ে উঠেছে সেটা যেন মনে হয় একটা পাণ্ডুলিপি যাতে বারবার লেখা হয়েছে (palimpsest), নতুন লেখার পেছন থেকে ঔপনিবেশিক আমলের লেখন এখানে সেখানে ফুটে উঠছে পুরোন বার্তা নিয়ে। তাই বোধহয় বলা চলে—ইতিহাস পড়ি কিংবা না পড়ি—আমরা ইতিহাসের বাধ্য।

অধ্যায় ২

জনসংখ্যা ও জাতীয় আয়ের সরল গণিত

জনগণনা অর্থনৈতিক ইতিহাসের যন্ত্রপাতির মধ্যে একটা। জন্ম মৃত্যু, জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, গড় আয়ু, জীবিকা, গ্রাম ও নগরবাসীর আনুপাতিক হিসেব ইত্যাদি সর্বত্রই ঐতিহাসিকদের কাজে লাগে, কিন্তু আমাদের দেশে আরও বেশী কেন না অন্য অর্থনৈতিক সূচীর বা পরিমাপকের অনুপস্থিতিতে এদের প্রক্সিটাই মেনে নেওয়া হয়। আর আমাদের দেশে ১৮৭২ সাল থেকে (সুষ্ঠু ভাবে ১৮৮১ সাল থেকে) ধারাবাহিক জনগণনা যেমন পাওয়া যায়, খুব কম অনগ্রসর দেশে তেমন মেলে। জনগণনার হিসেব এত প্রভূত পরিমাণে আছে যে পাতার পর পাতা ভরানো ভয়ঙ্কর রকমের সহজ। আমরা মোটামুটি হিসেবগুলো দেশের অর্থনীতিটাকে বুঝতে কি সাহায্য করে এইটাই কেবল দেখব।

রাজার সাফল্য বোঝাতে প্রজাপতির আশীর্বাদে প্রজাবৃদ্ধির উল্লেখ এক কালে রাজপ্রশস্তির বাঁধা বুলি ছিল। গরীব দেশে যেখানে না খেয়ে আর অসুখে মরার গড়পড়তা হারটা একটু বেশী সেখানে এটা স্বাভাবিক। এই মাপকাঠিতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া'র অনুরূপ প্রশস্তি লেখা শক্ত কাজ। মহারাণীর শাসন শুরু হবার পনের বৎসর পরে প্রথম জনগণনা (census) থেকে ১৯০১ সালে তার মৃত্যু অবধি যদি হিসেব দেখা যায়, প্রজাপতির আশীর্বাদ বিশেষ চোখে পড়ে না। ঐ সময়ে তার ভারতীয় প্রজার সংখ্যা বাড়ে মাত্র তিন কোটি মতন ; দুর্ভিক্ষে মৃত মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ২২ লক্ষ (সরকারি হিসেব) ; দুর্ভিক্ষ ও নানা মহামারী ও উঁচু শিশুমৃত্যুর হার ইত্যাদি কারণে ১৮৭১-৮১ পর্যায়ে ভারতীয় প্রজার জন্মক্ষণে প্রত্যাশিত আয়ু (life expectancy at birth) ২৪.৬ বৎসর, এবং ১৮৯১-১৯০১ সালে ২৩.৮ বৎসর। এই গড় আয়ু সরকারি হিসেবে, যদিও অনেক বিশেষজ্ঞের মতে গড় আয়ু আরও কম ছিল (যথা, অধ্যাপক বিসারিয়া'র হিসেবে ১৮৯১-১৯০১ সালের গড় আয়ু ২০.২ বৎসর)।

এর পরের বিশ বৎসর, ১৯০১-২১, জনসংখ্যা বিশেষ বাড়েনি, দুই দশকে দুই কোটি মতন। এই সময়ে প্লেগ মহামারীতে (১৯০৪-০৭) মারা যায় ৩১ লক্ষ, দুর্ভিক্ষে (১৯০৫-০৮) আড়াই লক্ষের বেশী, এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে (১৯১৮-২০) কোন কোন হিসেবে এক কোটির বেশী মানুষ। মোটমাট ১৯২১

অবধি কোন দশকেই বার্ষিক জনবৃদ্ধির হার ১ শতাংশ অবধিও পৌঁছয়নি দু-এক দশকে ১ শতাংশের এক-দশমাংশ মতন ছিল। (সারণি ২.১ দ্রষ্টব্য)

সারণি ২.১

ভারতের জনসংখ্যা (বর্তমান ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ)

	সরকারি জনগণনার হিসেব		ডেভিস-কৃত সংশোধিত হিসেব	
	সংখ্যা (কোটি)	গড় বৃদ্ধিহার (বার্ষিক)	সংখ্যা (কোটি)	গড় বৃদ্ধিহার (বার্ষিক)
১৮৬৭-৭২	২০.৩৪	—	২৫.৫২	—
১৮৮১	২৫.০২	২.০৭	২৫.৭৪	০.০৯
১৮৯১	২৭.৯৬	১.১১	২৮.২১	০.৯২
১৯০১	২৮.৩৯	০.১৫	২৮.৫৩	০.১১
১৯১১	৩০.০৩	০.৬৫	৩০.৩০	০.৬০
১৯২১	৩০.৫৭	০.০৯	৩০.৫৭	০.০৯
১৯৩১	৩৩.৮২	১.০১	৩৩.৮২	১.০১
১৯৪১	৩৮.৯০	১.৪০	৩৮.৯০	১.৪০

আকর : কিংস্‌লি ডেভিস 'পপুলেশন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান' (১৯৫১)

১৯২১ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুরু হয় সেই উঁচু হারে যা আমাদের কাছে এখন পরিচিত ; ১৯২১-৩১ পর্যায়ে দশকে সাড়ে-দশ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ১৯৩১-৪১ পর্যায়ে দশকে পনের শতাংশ বৃদ্ধি। যেখানে দেশের জনবৃদ্ধির হার ১৮৭১-১৯২১ পর্যায়ে ছিল গড়ে বার্ষিক ০.৩৭ শতাংশ সেটা বেড়ে ১৯২১-৪১ সালে দাঁড়াল ১.২২ শতাংশ। এর মধ্যে আঞ্চলিক প্রভেদ লীলা বিসারিয়া সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন।

সারণি ২.২

আঞ্চলিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার, শতাংশের হিসেবে

	পূর্ব	পশ্চিম	মধ্য	উত্তর	দক্ষিণ	সর্বভারতীয়
১৮৬৭/৭২-১৯২১	০.৫২	০.১৪	০.৪৭	০.১৯	০.৪৭	০.৩৭
১৯২১-১৯৪১	১.৩৭	১.৩০	১.২৯	১.২৫	০.৯২	১.২২

(আকর : লীলা ও প্রবীণ বিসারিয়া, 'কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়া' ১৯৮৩)

দেখা যায় যে আগাগোড়া সত্তর বৎসর পূর্ব অঞ্চলে (অর্থাৎ তখনকার বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে) সারা দেশের গড়ের তুলনায় বেশী হারে জনবৃদ্ধি ঘটেছিল ; এ জায়গায় ১৮৭১ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বড় কোন দুর্ভিক্ষ দেখা যায়নি। অপর পক্ষে পশ্চিম অঞ্চলে (বম্বে প্রদেশ, বরোদা ইত্যাদি প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্য) খুব কম জনবৃদ্ধি দেখা যায় ১৯২১ অবধি ; এর কারণ

১৮৭০ এবং ১৮৯০-এর দশকে দুর্ভিক্ষ। একই প্রবণতা উত্তর অঞ্চলে (বর্তমান উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব, দিল্লী ও জম্মু কাশ্মীর)। দক্ষিণ অঞ্চলে (বর্তমান তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলবর্তী জেলাগুলি, কর্নাটক, কেরলা) এবং মধ্য অঞ্চলে (মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ) জনবৃদ্ধির হার ১৯২১ সাল পর্যন্ত, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সত্ত্বেও, সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় বেশী। তার পর সর্বভারতীয় গড়-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই দুই অঞ্চলেও জনবৃদ্ধি চলতে থাকে ১৯২১ সাল থেকে।

মোট কথা, ১৯২১ থেকে জনবৃদ্ধির হার বাড়ল। ১৮৭১-১৯২১ পর্যায়ে মৃত্যুর হার ৪০ থেকে ৫০-এর মধ্যে ওঠে নামে প্রতি এক হাজারে ; শিশুমৃত্যুর হার আরও বেশী, হাজারে ২৭৮ থেকে ২৯৫-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। 'মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি' কথাটা নেহাৎ কাব্যি নয়। ১৯২১-৩১ পর্যায়ে ঐ সংখ্যাগুলি নেমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭·৩ এবং ২৪৭ ; ১৯৩১-১৯৪১ আরও কম ৩১·৫ এবং ২২৭। এর কারণ আগেই বলেছি, ১৯০৮ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে বড় গোছের দুর্ভিক্ষ হয়নি এবং আরও বড় কারণ হ'ল যে মহামারী, দুর্ভিক্ষের সহচর, অনেক কম মানুষ শিকার করতে পারে টীকা ব্যবস্থার ফলে। রোগে মৃত্যুর হার আরও আগে এবং অনেক ব্যাপক ভাবে কমানো সম্ভব ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যয় করতে সরকারি কার্পণ্য বাধা দেয়। ১৮৬৯ সালে কয়েকটি প্রদেশের স্যানিটরি কমিশন নিয়োজিত হন যাদের কাজ ছিল মূলতঃ সৈন্যবাহিনীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা ; এর ফলে ১৮৮২ সালের মধ্যে সৈন্যবাহিনীতে মৃত্যুর হার নেমে দাঁড়ায় হাজার প্রতি ১৫ (১৮৮১-৯১ সালে জনসাধারণের মধ্যে গড় মৃত্যু হার ছিল হাজার প্রতি ৪০)। এতেই বোঝা যায় যে রোগে মৃত্যুর হার কমানো সরকারি আয়োজন দ্বারা সম্ভব ছিল। বিরল কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে যেখানে সাধারণ লোকদের জন্য আয়োজন হয়েছে—যথা, ১৮৬৯ সালে কলকাতা ও পরে অন্যান্য মহানগরে পরিশ্রুত জলের বন্দোবস্ত। কিন্তু সাধারণভাবে তেমন প্রয়াস হয়নি, বৃটিশ শাসনের শেষ দু-তিন দশকের আগে, ব্যয়বাহুল্যের ভয়ে এবং হয়ত অবহেলার দরুণ।

উঁচু মৃত্যুর হার এবং বিশেষ শিশু মৃত্যুর হার দেখেই বোঝা যায় যে গড় আয়ু নীচু হবে। সেটা যে বৃটিশ ভারতে কতটা নীচু ছিল বোঝা যায় নীচের সারণি ২·৩ থেকে।

এই তথ্যগুলির অনেক গুরুত্ব। জাতীয়তাবাদী নেতারা এই ধরনের গড় আয়ুর হিসেব ব্যবহার করেছিলেন ইংরেজ শাসনের ফলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি যে ঘটেনি এটা প্রমাণ করতে। যেখানে জাতীয় আয়ের হিসেব নেই, মজুরের বেতন কি চাষীর আয়ের হিসেব নেই, খাওয়া পরার খরচের হিসেব নেই, সেখানে অর্থনৈতিক অবস্থার সূচক রূপে প্রক্সি বা প্রতিনিধি ধরা হয়, অন্য সব হিসেব, যথা জনগণনা, রেজিস্ট্রেশন, জেলখানার দপ্তরে নথিবদ্ধ জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান, মানুষের গড় ওজন ও উচ্চতা, গড় আয়ুর হিসেব ইত্যাদি। মহারাণীর শাসন শুরু

সারণি ২·৩

গড় আয়ুর হিসেব

(Life expectancy at birth)

বৎসর	জনগণনার সরকারি হিসেব	সংশোধিত হিসেব
১৮৭১-৮১	২৪·৬	—
১৮৮১-৯১	২৫·১	২৫·৫
১৮৯১-১৯০১	২৩·৮	২৪·৩
১৯০১-১১	২৩·০	২৩·৫
১৯১১-২১	২০·২	২৩·১
১৯২১-৩১	২৬·৭	২৪·৮
১৯৩১-৪১	৩১·৭	২৯·৩
১৯৪১-৫১	৩২·১	৩২·৬

(আকর : কিংস্‌লি ডেভিস্‌, পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত : গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য)

বৎসর (মতান্তরে ২৪·৮ বৎসর), এটা চমৎকার একটা খবর।

শিশু অবস্থায় বা কম বয়সে মৃত্যুর সংখ্যা বেশী হলে এবং গড় আয়ু কম হলে একটা ফল অবধারিত। 'সমর্থ বয়সের' মানুষের তুলনায় শিশু ও কিশোর বয়স্কদের সংখ্যা বেশী হবে, অর্থাৎ স্বাবলম্বী উৎপাদনে কর্মক্ষম লোকদের সংখ্যার তুলনায় কম বয়সের পরনির্ভরদের সংখ্যা বেশী হবে। বিপরীত পক্ষে গড় আয়ু যত বাড়বে, বেশী লোক কর্মক্ষম বয়সী বর্গে থাকবে। অর্থাৎ কম গড় আয়ু মানে একটা বিশেষ ধরনের বয়স-বর্গের বিন্যাস (age structure)—অনেকটা চ্যাপ্টা পিরামিড গোছের : নীচু তলায় (১৪ বৎসর অবধি বয়স) অনেক জন, যাদের অনেকেই মাঝের তলায় (১৫ থেকে ৫৯ বৎসর বয়স) পৌঁছনোর আগেই মারা যায়, আর সবচেয়ে ওপরের তলায় (৬০ বৎসরের বেশী বয়স) স্বভাবতই সবচেয়ে কম মানুষ। এই ছবিটা ১৮৮১ থেকে প্রায় বদলায়নি, তাই তিনটি মাত্র বৎসরের হিসেব দেওয়া গেল (সারণি ২·৪)।

সারণি ২·৪

বিভিন্ন বয়সের লোকসংখ্যার অনুপাত

(মোট জনংখ্যার শতাংশ)

বয়স	১৮৮১	১৯০১	১৯২১	১৯৪১
০-১৪ বৎসর	৩৮·৯	৩৮·৬	৩৯·২	৩৮·৫
১৫-৫৯ বৎসর	৫৫·৮	৫৬·৩	৫৫·৫	৫৭·১
৬০ ও অধিক বৎসর	৫·৩	৫·১	৫·৩	৪·৪
পরনির্ভরতার সূচক	৭৯·১	৭৭·৬	৮০·১	৭৫·১

(আকর : প্রবীণ বিসারিয়া, উল্লিখিত)

এই সারণিতে পরনির্ভরতার সূচক (dependency ratio) মানে ১৫-৫৯ বয়সের ১০০ জনের তুলনায় ০-১৪ বৎসর ও ৬০ এবং অধিক বয়সের মানুষের সংখ্যা। এই পরনির্ভরতা সূচক সমস্ত অনগ্রসর দেশেই খুব উঁচু এবং ভারতের ন্যায় এই সব দেশে উৎপাদনক্ষম বয়সের মানুষের সংখ্যা উৎপাদনে অক্ষম অ-সমর্থ বয়সীদের তুলনায় কম। বিপরীতপক্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর দেশগুলির মানুষদের গড় আয়ু দীর্ঘতর, উৎপাদনশীল মানুষের অনুপাত জনসংখ্যায় বৃহত্তর। উঁচু পরনির্ভরতা সূচক ঔপনিবেশিক অনগ্রসর অর্থনীতির একটা জাতিলক্ষণ বলা চলে : এই ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ে বা উৎপাদনে যারা ভাগ বসাচ্ছে তাদের বড় অংশ উৎপাদন করছে না, সুতরাং এই ভার জাতীয় আয়ের বাড় বন্ধ রাখছে।

একটা ব্যাপারে ভারতের বিশেষত্ব দেখা যায় যেটা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, ঔপনিবেশিকতা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, আমাদের নিজেদের আর্যাবর্তের গৌরবময় ঐতিহ্যের ফল। সেটা হ'ল, সহজ কথায় মেয়েদের কম খেতে দিয়ে, অবহেলায়, কিংবা শিশু অবস্থায় খুন করার ফলে জনসংখ্যায় পুরুষ-স্ত্রী অনুপাতে বৈষম্য। প্রণব বর্ধন, সি. এন. গোপালন, লীলা বিসারিয়া এবং আরও অনেকে এই বৈষম্য দেখিয়েছেন। সারণি ২·৫ পড়লে দেখা যায় যে এই বৈষম্য, অর্থাৎ পুরুষদের সংখ্যাধিক্য, বিশেষ প্রকট উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে (আঞ্চলিক বিভাগে কোন প্রদেশ কোথায় সারণি ২·২ প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে), অপেক্ষাকৃত কম মধ্য ও পূর্ব অঞ্চলে, এবং একেবারেই নেই দক্ষিণ অঞ্চলে। আরও দেখা যায় যে গৌরবময় ঐতিহ্য আমরা এমন ভাবে ধরে রেখেছি যে মেয়েদের খুন করা ১৮৮১ থেকে ১৯৪১ ষাট বৎসরে কমেনি, কোথাও কোথাও বেড়েছে সন্দেহ হয়।

সারণি ২·৫

পুরুষ/স্ত্রী অনুপাত

(১০০০ স্ত্রীলোক প্রতি পুরুষের সংখ্যা)

অঞ্চল	১৮৮১	১৯০১	১৯২১	১৯৪১
পূর্ব	৯৯৫	১,০০৫	১,০৩১	১,০৮০
পশ্চিম	১,০৬৭	১,০৫৮	১,০৮৬	১,০৯৮
মধ্য	১,০৪০	১,০১৯	১,০২৯	১,০৩২
উত্তর	১,১১৫	১,১০২	১,১৩৫	১,১২৫
দক্ষিণ	৯৭৮	৯৮২	৯৮৫	৯৯৮

(আকর : লীলা বিসারিয়া, গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য)

এটা কি সম্ভব যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতা আমরা যা বলছি সেই কারণে নয়, অন্য কোনও কারণে? বোধহয় নয়। প্রথমত, বহু দেশের সংখ্যাতাত্ত্বিকেরা হিসেব কষে দেখেছেন যে স্ত্রী/পুরুষ জন্মের অনুপাত ১০০/১০৪ থেকে বড়

জোর ১০০/১০৭ এর মধ্যে হবে ; ভারতে এ থেকে মারাত্মক ব্যত্যয় হওয়ার কারণ নেই। দ্বিতীয়তঃ এমন হতে পারে যে ১৮৮১ কিংবা উনিশ শতকের অন্যান্য জনগণনায় স্ত্রীলোকদের অনেকের সংখ্যা গোণা হয়নি, পর্দা প্রথা ইত্যাদি কারণে, কিন্তু এই প্রবণতা বিংশ শতকে নিশ্চয় কমেছে ; যদি কমে, তবে সংখ্যা বৈষম্য কমবে, কিন্তু সারণিতে দেখা যাচ্ছে সেটা বেড়েছে। সুতরাং এই ব্যাখ্যা ধোপে টেঁকে না। অপরপক্ষে দেখা যাচ্ছে যে যেসব জায়গায়, যথা উত্তর অঞ্চলে, স্ত্রীশিশু (female infanticide) হত্যা উনিশ শতকে প্রচলিত, সেখানে সংখ্যা বৈষম্য সবচেয়ে বেশী ১৮৮১-১৯৫১ অবধি। কার্যকারণ সম্বন্ধ স্পষ্ট। আবার দক্ষিণ অঞ্চলে, যেখানে অনেক জায়গায় মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থা উন্নত এবং সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত, সেখানে স্ত্রী-পুরুষ সংখ্যা বৈষম্য নেই। সব শেষে এটাও মনে রাখা দরকার যে আইনতঃ দণ্ডনীয় স্ত্রীশিশু হত্যা ছাড়াও, অবহেলা ও অনশনও মেয়েদের বিরুদ্ধে বৈষম্য এনে থাকে আমাদের সমাজে। ১৯৮০ সালে জনগণনা দপ্তর-এর হিসেব অনুসারে পুরুষ/স্ত্রী শিশুর (৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত) মৃত্যুর হার এই ধরনের : উত্তরপ্রদেশে ৫৬/৬৬, হরিয়ানা ৩২/৪৩, পাঞ্জাব ২৪/৩০, মধ্যপ্রদেশ ৫৩/৬০, ইত্যাদি। কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং আসাম বাদ দিয়ে সর্বত্র স্ত্রীশিশুর মৃত্যুর হার পুরুষ-শিশুর চেয়ে বেশী। ১৯৬১-৭১ দশকে গড় আয়ু (life expectancy at birth) পুরুষের ৪৬·৪ বৎসর, স্ত্রীলোকের ৪৪·৭ বৎসর।

জনগণনা থেকে জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো এবং ঝোঁক আন্দাজ করা যায় যদি পাওয়া যায় উপজীবিকার হিসেব। অর্থাৎ কয়জন আছে কৃষিকর্মে নিয়োজিত, কয়জন শিল্পকর্মে, কয়জন ব্যবসায়ে ইত্যাদি। আমাদের দেশে এই হিসেবটা তেমন নির্ভরযোগ্য নয় অনেক কারণে। ডেনিয়েল থর্নার-এর মতে পশ্চিমী কায়দায় শ্রেণীবিভাজন বা বর্গীকরণ হয়েছিল এ দেশে জনগণনায় অনুচিত ভাবে ; এর ভিত্তি অগ্রসর পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশের শ্রমবিভাজন (division of labour), যেটা অনগ্রসর ঔপনিবেশিক ভারতে অনুপযোগী, অন্ততঃ প্রথম দিকের জনগণনা কালে। যদি কারিগর নিজেই জিনিস তৈরী করে বিক্রি করে, ফিরি করে, হাটে বসে, তবে 'কারিগরি' আর 'ব্যবসা' কোন্ বর্গে তার জায়গা হওয়া উচিত ? তাছাড়া আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে যেহেতু বিভিন্ন জনগণনায় আমলাদের বিভিন্ন মত অনুসারে বিভিন্ন ভাবে বৃত্তি বিভাগ করা হয়েছে যার ফলে এক দশকের সঙ্গে অপর দশকের তুলনা করা কঠিন। আর একটা মৌলিক সমস্যা এই যে গোড়ার দিকে জনগণনাতে 'কোন উপজীবিকার ওপর নির্ভর' এই ভিত্তিতে বর্গীকরণ করা হয়, আর পরে বিশ শতকের বেশীর ভাগ জনগণনাতে প্রতি ব্যক্তি কি উপজীবিকায় নিয়োজিত আছে সেই অনুসারে বিভাগ করা হয় ; ফলত তুলনা-মূলক সিদ্ধান্ত নিখুঁত হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে গোলমাল হয়েছে অতিসূক্ষ্ম বৃত্তিবিভাগ করতে গিয়ে—যথা, 'কৃষি', 'কৃষি শ্রম' এবং 'সাধারণ শ্রম' ('general labour') নামে তিনটি বিভাগ রাখা হয়েছিল প্রথম দিকের জনগণনা তালিকায়। সবশেষে, আর একটা গোলমেলে

ব্যাপার হল যে স্ত্রীলোকদের বৃত্তি সংক্রান্ত সংখ্যাগুলি পুরুষদের অনুরূপ সংখ্যাগুলির তুলনায় অনেক কম নির্ভরযোগ্য। এটার কারণ অনেক সময় নারীদের সাক্ষাৎ জবানবন্দী নেওয়া সম্ভব ছিল না জনগণনাকারীদের পক্ষে, অনেক সময় স্বামী বা সংসারের পুরুষ কর্তার বৃত্তি স্ত্রী'র বৃত্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হ'ত, ইত্যাদি; অনেক আদমসুমারির পরিচালক ও আমলারা নিজেদের প্রতিবেদনে স্ত্রীলোকদের উপজীবিকা বিষয়ক তথ্য নির্ভরযোগ্য নয় বলে মেনে নিয়েছেন। আমরা এই সমস্যার দরুণ আপাততঃ নীচের সারণিতে কেবল পুরুষ কর্মী (male work force) ধরেছি। উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা ও খুঁতগুলো মনে রেখে জনগণনার তথ্য এই ভাবে সাজানো যেতে পারে।

সারণি ২·৬

বৃত্তি অনুসারে পুরুষ কর্মীর বিভাগ (শতাংশ)

প্রথম বর্গ : কৃষক, কৃষি শ্রমিক, সাধারণ শ্রমিক, চা বাগিচা ইত্যাদিতে কর্মী, মৎস্যজীবী, বনজ-উপজীবী

দ্বিতীয় বর্গ : শিল্প, খনিজ নিষ্কাশন ও নির্মাণ শিল্পে নিয়োজিত

তৃতীয় বর্গ : সওদাগরি ও ব্যবসা, পরিবহণ, সঞ্চার, প্রশাসন ও অন্যান্য কৃত্যক উপজীবী

	১৮৮১	১৯১১	১৯৫১
প্রথম বর্গ	৭২·৪	৭৩·৮	৭৩·২
দ্বিতীয় বর্গ	১১·২	১০·৬	১০·৯
তৃতীয় বর্গ	১৬·৪	১৫·৫	১৫·৮

(আকর : জে. কৃষ্ণমূর্তি, গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য)

এই সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে কৃষিসংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বর্গে বৃদ্ধি বা শিল্প সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় বর্গে হ্রাস তেমন লক্ষণীয় নয়। এর একটা কারণ বোধ হয় ১৮৮১ সালের আগেই অবশিল্পায়নের ফলে পুরোন কুটির শিল্পের ক্ষতি যা হবার ঘটে গেছে; আর একটা কারণ জনগণনায় বৃত্তির হিসেবের উল্লিখিত সমস্যা। তবু মোটমাট যে ছবিটা বেরিয়ে আসে সেটা হল ঔপনিবেশিক আমলের অর্থনীতির স্থবিরতা, শেষ সাত দশকে কোনও বড় রকমের পরিবর্তন চোখে পড়ে না এই সারণিতে।

২

অর্থনৈতিক প্রগতির যে মাপকাঠি এখন হাতে হাতে ঘোরে সেটা হ'ল জাতীয় আয়ের হিসেব। বিশেষ করে জনপ্রতি গড় জাতীয় আয়ের অংক। উনিশ শতকের এমন হিসেব পাওয়া শক্ত। ১৮৭১ সালে ইংলণ্ডের ভারত উপ-সচিব (Under-Secretary of State) গ্রান্ট ডাফ বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে ভারতের গড় বার্ষিক জাতীয় আয় দুই পাউণ্ড স্টারলিং অর্থাৎ তৎকালীন হারে কুড়ি টাকা। এই হিসেবের ভিত্তি অপ্রকাশিত থেকে যায়। বছর দু-এক পরে দাদাভাই নওরোজি প্রস্তুত করেন একটি হিসেব যেটার সঙ্গে ডাফের এই অংকটা মিলে যায়। নওরোজি'র হিসেবে ভারতের মোট জাতীয় আয় ৩৪০ কোটি টাকা ১৮৬৭-৬৮ সালে, এবং জনপ্রতি আয় ২০ টাকা। এ ছাড়া আরো বেশ কয়েকজন নানা অংকে গড় জাতীয় আয় মাপ করেছিলেন : 'ইণ্ডিয়ন ইকনমিস্ট' সংবাদ পত্রের সম্পাদক রবার্ট নাইট (৬০ টাকা, ১৮৭১ সালে), ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট সদস্য হিণ্ডম্যান (৮০ টাকা, ১৮৮৬ সালে), সংখ্যাতাত্ত্বিক অ্যাটকিন্‌সন্ (৩৯·৫ টাকা, ১৮৯৫ সালে), ইত্যাদি। এর মধ্যে দুটি সরকারি হিসেব হল লর্ড ক্রোমার-এর (২৭ টাকা, ১৮৮১ সালে) এবং লর্ড কার্জন-এর (৩০ টাকা, ১৯০১ সালে)। মোটামুটি ইংরেজ পক্ষের চেষ্টা ছিল জাতীয় আয়ের প্রগতি প্রমাণ করা, আর নওরোজি থেকে জাতীয়তাবাদীদের চেষ্টা এইটা অপ্রমাণ করা। কিন্তু এই সব হিসেব থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায় না। একটা এককালীন হিসেব (point estimate) থেকে অন্যটার মধ্যে পদ্ধতি ও ধারণাসমূহের পার্থক্য, হিসেবে ব্যবহৃত তথ্যের দুর্বলতা, মূল্য সূচক দ্বারা বিভিন্ন বর্ষের মধ্যে তুলনীয়ত্ব স্থাপন করার উপযোগী সূচকের অভাব, ইত্যাদি নানা সমস্যা। উনিশ শতকের জাতীয় আয় সম্বন্ধে এসব এবং পরবর্তী কয়েকটি প্রয়াস এখনও সর্বস্বীকৃত কোনও ধারা উপস্থাপিত করতে পারেনি। বিংশ শতকের শুরু থেকে ছবিটা স্পষ্ট হয় কিছুটা।

সেই প্রসঙ্গে আসার আগে বলে নেওয়া দরকার যে জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিকেরা কেবল মাছিমারা কেরাণির মতন হিসেব করেননি। নওরোজি কেবল গড় জাতীয় আয়ের হিসেবের ভিত্তিতেই বৃটিশ শাসনে দেশের দুরবস্থা মাপ করেননি। অন্য নানা সূচক ব্যবহার করেছেন। যেমন জেলখানার খাবার খেয়ে কয়েদীদের স্বাস্থ্য আর বাইরে মুক্ত ব্রিটিশ প্রজাদের স্বাস্থ্য তুলনা করা ; অন্য মাপকাঠির অভাবে পরিপুষ্টির সূচক এখন সর্বদাই অনগ্রসর দেশে ব্যবহার হয়। নওরোজি'র জাতীয় আয়ের হিসেব সমালোচিত হয়েছে এই কারণে যে তিনি ব্যবসায়, পরিবহণ, প্রশাসন ও কৃত্যক প্রসৃত আয় হিসেবের মধ্যে ধরেননি। কিন্তু আমরা পরে দেখব যে এইভাবে কেবল উৎপন্ন (material production) মূল্যের ভিত্তিতে জাতীয় আয় হিসেব করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে, বিশেষ করে অনগ্রসর অর্থনীতিতে।

১৯০০ সাল থেকে উৎপাদন ও মূল্যমান সম্বন্ধে তথ্য নিখুঁত না হলেও

আগের শতকের তুলনায় নির্ভরযোগ্য। তাই ঐ সময় থেকে জাতীয় আয়ের ধারা সম্বন্ধে অনেকে গবেষণা করেছেন যাদের অনেকেই নির্ভর করেছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবসুব্রহ্মণিয়ন-এর সংগৃহীত তথ্যের ওপর। প্রতি বৎসরের ও নানা রকমের হিসেব দিলে সারণি ভয়াবহ রকমের সহজে লম্বা করা যায়। এখানে পাঁচসালা গড় হিসেব, মোট ও জনপ্রতি, দেওয়া গেল।

সারণি ২·৭

ভারতের জাতীয় আয় ১৯০০-১৯৪৭

বৎসর	গড় বার্ষিক জাতীয় আয় (NDP), কোটি টাকার হিসেবে	জনপ্রতি জাতীয় আয়ের পাঁচসালা গড় (টাকা)
১৯০০/০১—১৯০৪/৫	১৫০২	৫২·২
১৯০৫/০৬—১৯০৯/১০	১৫৭৫	৫৩·০
১৯১০/১১—১৯১৪/১৫	১৭৩০	৫৬·৫
১৯১৫/১৬—১৯১৯/২০	১৭৬০	৫৭·৩
১৯২০/২১—১৯২৪/২৫	১৮৪৪	৫৯·১
১৯২৫/২৬—১৯২৯/৩০	২০৪৪	৬২·৭
১৯৩০/৩১—১৯৩৪/৩৫	২১৩১	৬১·৬
১৯৩৫/৩৬—১৯৩৯/৪০	২২৫০	৬০·৬
১৯৪০/৪১—১৯৪৪/৪৫	২৪৪১	৫৬·৬
১৯৪২/৪৩—১৯৪৬/৪৭	২৫২৪	৬২·৩

(আকর : প্রথম কলম শিবসুব্রহ্মণিয়ন-এর ১৯৩৮-৩৯ সালের মূল্যে ধ্রুবায়িত হিসেব বা Constant Price অনুসারে ; দ্বিতীয় কলম একই হিসেবের ভিত্তিতে পাঁচসালা গড় নির্মলকুমার চন্দ্র দ্বারা গ্রন্থিত ; গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য)

এই অংকগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে জনপ্রতি জাতীয় আয় ধীরে ধীরে শামুকের চালে উঠতে থাকে এবং ১৯২০-এর দশকের শেষে সবচেয়ে উঁচুতে পৌঁছায়। তারপর ছেলেবেলার অংকের তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের চালে ওঠা-নামা, কিন্তু মোটামুটি জনপ্রতি আয় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে পঁচিশ বৎসরের বেশী, ৬২ টাকার আশেপাশে।

বলাই বাহুল্য যে এখানে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন সত্ত্বেও যাতে বিভিন্ন বৎসরের আয় তুলনা করা সম্ভব হয়, তাই হিসেব ১৯৩৮-৩৯ সালের মূল্য অনুসারে ধ্রুবিত (constant Price) হয়েছে। নির্মল কুমার চন্দ্রের একটি মূল্যবান প্রবন্ধে ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৬০-৬১ সালের মূল্য অনুসারে ধ্রুবিত হিসেব করা হয়েছে ; কিন্তু নেট ডোমেস্টিক প্রডাক্ট (ওপরের সারণিতে NDP) দেখা যায় এই দুটি

এবং শিবসুব্রহ্মণিয়নের হিসেবে একই চালে চলে এবং মোটামুটি বিশেষ দশক থেকে স্থির। পুরো ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সাল সময়ে বার্ষিক জনপ্রতি আয়ের বৃদ্ধির (কম্‌পাউণ্ড) হার ছিল মাত্র ০·৩৫ শতাংশ।

মোট জাতীয় আয়ের যেটুকু বৃদ্ধি দেখা যায় সেটা কৃষির উন্নতির জন্য ? অথবা নতুন শিল্পায়নের জন্য ? অথবা অন্য কোন আয় বৃদ্ধির জন্য ? এর উত্তর সম্ভবতঃ যথাক্রমে : না, হয়ত, এবং হ্যাঁ। অর্থনীতিবিদেরা সাধারণতঃ জাতীয় অর্থনীতিকে তিনটি প্রাকরণিক ক্ষেত্রে (sector) বিভক্ত করেন : প্রাথমিক (কৃষি ও পশুপালন, বাগিচা এবং মৎস্য-জীবী, বনজ-জীবী ইত্যাদির আয়), দ্বিতীয় ক্ষেত্র (শিল্প, খনিজ নিষ্কাশন, নির্মাণ শিল্প, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি), এবং তৃতীয় ক্ষেত্র (পরিবহণ, সওদাগরি, সঞ্চার, প্রশাসন ও কৃত্যক জনিত আয়, যাকে বলে সব মিলিয়ে সার্ভিস সেক্টর)। ১৯০০-৪৭ সালে মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অংশ প্রায় বাড়েনি ; ওটা প্রথম দশকে সর্বদাই বার্ষিক হাজার কোটি টাকার নীচে ছিল, পরের পঁচিশ বৎসর হাজার কোটি টাকার আশেপাশে ওঠানামা করেছে, এবং ১৯৩৫-এর পর এগারশ কোটি টাকা মতন ছিল।

তার তুলনায় শিল্পজ আয় অতটা অনড় নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে দু'শ কোটি টাকায় আশেপাশে, বিশের ও ত্রিশের দশকে ক্রমে তিনশ কোটি টাকায় উন্নতি, এবং চল্লিশের দশকে চারশ কোটি ছাড়িয়ে। ১৯০০-৪৬ সময়ে বার্ষিক আয় বৃদ্ধির (কম্‌পাউণ্ড) হার প্রাকরণিক প্রথম ক্ষেত্রে (কৃষি ইত্যাদি) ০·৪২ শতাংশ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (শিল্প ইত্যাদি) ১·৮২ শতাংশ, তৃতীয় ক্ষেত্রে ২·২২ শতাংশ। মোট জাতীয় আয়ের যে বৃদ্ধি ওপরের সারণিতে দেখা যায় তার একটা বড় কারণ এই তৃতীয় ক্ষেত্রের বৃদ্ধি। এই তৃতীয় ক্ষেত্রের কাজকারবার আগেই বলা হয়েছে। এখানে কোন সামগ্রী বা ভোগ্যদ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে না। তৃতীয় ক্ষেত্রজ আয়ের এই যে বৃদ্ধি সেটা অনেকটা শহুরে মানুষদের পকেট ভারী করছে, গ্রামের মানুষদের ট্যাঁক খালি করে। ওঙ্কার গোস্বামীর হিসেব অনুসারে জনপ্রতি গড় বাস্তবিক আয় (real income), অর্থাৎ পয়সার হিসেবে নয়, ক্রেতব্য ভোগ্যদ্রব্যের হিসেবে, শহুরে মানুষের বাড়ছে। ১৯০০-০১ সালে শহুরে মানুষের যা আয় ছিল সেটা গ্রামের মানুষের সাড়ে-তিন গুণ, ১৯৪৬-৪৭ সালে শহুরে আয় গ্রামীণ আয়ের ছয়-গুণ হয়ে দাঁড়াল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ক্ষেত্র নির্বিশেষে জাতীয় আয়ের মোট হিসেব যথেষ্ট নয়। ক্ষেত্র বিভেদ করা দরকার। সেই কায়দায় সাজানো ২·৮ নম্বর সারণি।

শতাংশের হিসেব থেকে পরিষ্কার যে জাতীয় আয়ের অংশীদার হিসেবে প্রাথমিক ক্ষেত্র পিছিয়ে গেছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্র সামান্যই এগিয়েছে, আর তৃতীয় ক্ষেত্র খুব বেড়েছে। শিল্পায়নের যদি প্রগতি হয় তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রের বৃদ্ধি হয়ে থাকে, বিশেষ করে প্রথম শিল্পায়নে। উদাহরণতঃ ইংলণ্ডের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রের অংশ ছিল যথাক্রমে ৩৩ এবং ২৩ শতাংশ ১৮০১ সালে, ২০ এবং ৩৪ শতাংশ ১৮৫১ সালে, আর ৬ এবং ৪০ শতাংশ ১৯০১

সারণি ২·৮
জাতীয় আয় (N.D.P.), প্রাকরণিক ক্ষেত্র অনুসারে
(শতাংশ)

বৎসর	প্রথম ক্ষেত্র	দ্বিতীয় ক্ষেত্র	তৃতীয় ক্ষেত্র
১৯০০/০১—১৯০৪/৫	৬৩·৬	১২·৭	২৩·৭
১৯০৫/৬—১৯০৯/১০	৬১·৭	১৩·৫	২৪·৮
১৯১০/১১—১৯১৪/১৫	৬০·১	১৩·৯	২৬·০
১৯১৫/১৬—১৯১৯/২০	৫৯·৬	১৩·৭	২৬·৭
১৯২০/২১—১৯২৪/২৫	৫৭·৪	১৩·৪	২৯·২
১৯২৫/২৬—১৯২৯/৩০	৫২·১	১৪·৯	৩৩·০
১৯৩০/৩১—১৯৩৪/৩৫	৫১·৪	১৫·৮	৩২·৮
১৯৩৫/৩৬—১৯৩৯/৪০	৪৯·৯	১৬·৪	৩৩·৭
১৯৪০/৪১—১৯৪৪/৪৫	৪৭·৬	১৬·৭	৩৫·৭

(আকর : শিবসুব্রহ্মণিয়ন-এর, ১৯৩৮-৩৯ সালের মূল্যমানে ধ্রুবিত, হিসেব থেকে নির্মল কুমার চন্দ্র দ্বারা গ্রন্থিত, গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য)

সালে। ঔপনিবেশিক ভারতের জাতীয় আয়ে কৃষিজ অংশ বিরাট থেকেই যায়।

এই সারণিতে তৃতীয় ক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি স্পষ্ট, এর দরুণ জাতীয় আয়ের হিসেব স্ফীত হয়েছে। জাতীয় আয় হিসেব করার অন্য এক পন্থা হল তৃতীয় ক্ষেত্রটিকে বাদ দিয়ে কেবল উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য ধরা। রুশ দেশে এই পন্থা পরিচিত। আমাদের দেশে দাদাভাই নওরোজি এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন কেননা তার মতে তৃতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় আয় উৎপন্ন হয় না, আপাত দৃষ্টিতে ঐ ক্ষেত্রে যেটা আয় সেটা প্রকৃতপক্ষে অন্য ক্ষেত্রজ আয়ের হস্তান্তর মাত্র। হালে একটি হিসেব করেছেন নির্মল কুমার চন্দ্র কেবল নিট্ উৎপন্ন সামগ্রীর ভিত্তিতে। এই হিসেবে জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ধীরে ৪২ টাকায় পৌঁছায় ১৯০০-১৯২০ সালে এবং পরের দশকে ওখানেই থেমে থাকে ; তার পর ১৯৩০ থেকে গড় আয় কমতে থাকে এবং ১৯৪০-৪৫ সালে ৩৯·৬ টাকায় পৌঁছায়। অর্থাৎ কৃষি ইত্যাদির প্রাথমিক ক্ষেত্র এবং শিল্পজ দ্বিতীয় ক্ষেত্রের আয় একত্রে জনপ্রতি হিসেবে ৪০ থেকে ৪২ টাকার কাছাকাছি প্রায় নিশ্চল হয়ে আছে ১৯০০ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত। আমাদের ১·৭ সারণিতে মোট জাতীয় আয়ের সামান্য যে প্রগতি দেখা যায় সেটার তুলনায় উৎপন্ন সামগ্রীর হিসেবটা আরও অনেক নিরাশাজনক।

উৎপন্ন সামগ্রী থেকে জাতির সাধারণ অবস্থা নির্ণয় করার একটা রকমফের হ'ল জনপ্রতি কত সামগ্রী মেলে তার হিসেব। যথা জনপ্রতি কত মণ খাদ্যশস্য বা কত গড় কাপড় প্রতি বৎসর ? শিবসুব্রহ্মণিয়নের মতে জনপ্রতি আহার্য খাদ্যশস্যের যোগান কমছে : ১৯০১-১০ সালে ছিল বার্ষিক ১৭২ কিলোগ্রাম,

এবং ১৯১১-২৩ সালে ১৭৫ কিলোগ্রাম ; এটা কমে দাঁড়ায় ১৫৯ কিলোগ্রাম ১৯২১-৩০ সালে, এবং ১৪৮ কিলোগ্রাম ১৯৩৯-৪০ সালে। কাপড় কত মেলে জনপ্রতি তার হিসেবে দেখা যায় যে ১৯৩০ অবধি উর্দ্ধগতি, ১০·৭ মিটর (১৯২১) থেকে ১৫·১ মিটর (১৯৩২) এবং তারপর সেখানেই স্থিতিলাভ।

এই পরিচ্ছেদে এটা স্পষ্ট যে কিছু প্রশ্ন আছে যার উত্তর দেওয়ার জন্য জাতীয় আয়ের গণিত তৈরী নয়। সবচেয়ে সহজ প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া সবচেয়ে শক্ত, সাধারণ লোকের কি অবস্থা ? পরে এই প্রশ্নে ফিরে আসব আমরা।

অধ্যায় ৩

দেশের শ্রীবৃদ্ধি ? ভূমিব্যবস্থা ও রাজস্বনীতির ধাঁচ

ভারতের নানা অংশের ভূমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত কেমন ছিল সেটা, বাঙলার 'চিরস্থায়ী' জমিদারি বন্দোবস্ত ছাড়া, আমাদের সবার কাছে তত পরিচিত নয়। কিন্তু যেসব বিভিন্ন ধরনের ভূমিব্যবস্থা উনিশ শতকে কায়েম হয়েছিল সেগুলি মোটামুটি না জানলে বোঝা শক্ত গ্রামীণ অর্থনীতির অবয়ব এবং অন্তর্দেশীয় নানা প্রভেদ। তাই আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সময়ে ইংরেজ সরকার যে ভূমিব্যবস্থা তৈরি করলো তার একটা ধারণা তৈরি করা দরকার।

ছোট ছেলেরা যেমন কাঠের চারচৌকো টুকরো বা ব্লক্স্ নিয়ে খেলা করে তেমন তিন ধরনের টুকরো মনে করা যাক্ রয়েছে। এদের নাম জমিদারি, রায়তওয়ারি আর মহলওয়ারি। এই প্রত্যেক ধরনের মধ্যে আবার প্রভেদ আছে : যেমন জমিদারি ব্যবস্থায় কোথাও রাজস্ব চিরস্থায়ী ভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া যায়, আবার অন্যত্র অস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্ব কিছুদিন পর পর নতুন করে নির্ধারণ করা যেতে পারে। আবার রাজস্ব নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াও বিভিন্ন হতে পারে : কোথাও ফসলের দাম হিসেব করে তার থেকে উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়ে চাষের নিট্ বা খাঁটি লভ্যাংশ থেকে একটা রাজস্ব বলে অংশ পাওয়া যায় ; অথবা ওসব ঝামেলা না করে যেমন রাজস্ব আগে ছিল সেটাকেই কৃষিপণ্যের দাম অনুসারে কমিয়ে বাড়িয়ে নতুন রাজস্ব নির্ধারণ করা চলে। অনুরূপ ভাবে মহলওয়ারি কি রায়তওয়ারি ব্যবস্থাতেও বন্দোবস্তের স্থায়িত্ব (চিরস্থায়ী, বা ৩০ বছর বা ২০ বছর ইত্যাদি), রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তি (চাষের লাভের হিসেব বা পুরনো রাজস্বের হিসেব ইত্যাদি) বিভিন্নতা সম্ভব। প্রকৃতই এসব বিভিন্নতা বিভিন্ন প্রদেশের ভূমিব্যবস্থায় কায়েম হয়েছিল। তাই ব্লক্স্-এর উদাহরণ—যেন মুষ্টিমেয় কয়েকটা ধরনের ব্লক রয়েছে, কিন্তু সেগুলো নানা ভাবে জোড়া দিয়ে অনেক বিভিন্ন ব্যবস্থা বৃটিশ ভারতে তৈরি হয়েছে। এই খেলাটা ধরতে পারলে ভূমিব্যবস্থার বিভিন্নতা হেতু জটিলতা সহজতর হয়ে আসে।

জটিলতা ইংরেজ শাসক স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেনি। শতাধিক বছর ধরে নানা পরীক্ষা ও নিরীক্ষা, ভুল আর তার শোধন করতে করতে, প্রত্যেক প্রদেশের

গ্রামীণ শ্রেণী সমাবেশ ও কৃষির অগ্রগতি বিচার করে, সবচেয়ে কম ঝামেলায় সবচেয়ে বেশি রাজস্ব কিভাবে উশুল করা যায় এই উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকশ্রেণী নানা জাতীয় ভূমিব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। এর ইতিহাসটা বলা দরকার সংক্ষেপে।

ধরা যাক ১৭৬৫ সালে, যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা সুবা'র দেওয়ানি বা রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পায় মোগল সম্রাটের কাছ থেকে, তখন এই ইতিহাস শুরু। ১৭৫৯-৬০ সালে ইংরেজ কোম্পানি প্রথমে চব্বিশ পরগণার জমিদারি, তারপর মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম আর বর্ধমানের রাজস্ব সংগ্রহের ভার পাওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই একলাফে মোগল সম্রাটের ফরমানে বাংলা সুবার দেওয়ানিতে উন্নীত হয়। কিন্তু ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৩ অবধি কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থাপনা করতে নাস্তানাবুদ হয়। এই ইতিহাসটা স্থানীয় সংবাদের পর্যায়ে পড়ে, তবে মোটামুটি জানা দরকার।

প্রথম পর্যায়— ১৭৬৫-১৭৭২ : নায়েব দেওয়ান নাম দিয়ে ইংরেজরা মহম্মদ রেজা খাঁ-কে সামনে খাড়া রেখে কিভাবে রাজস্ব বাড়ানো যায় তার চেষ্টা চালায় এই সময়ে। পরীক্ষামূলক ভাবে নীলাম করে স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহের ভার ইজারা দেওয়া, জেলায় রেভিনিউ সুপারভাইজর নিয়োগ (১৭৭০), মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় রেভিনিউ কাউন্সিল আর কলকাতায় কন্ট্রোলিং কমিটি নিয়োগ (১৭৭১) ইত্যাদি করা হয়। কিন্তু সমস্যা হল যে নীলাম ডেকে যারা দু-এক বৎসরের ইজারা নেয় তারা চটপট যথাসম্ভব লাভ করার জন্য দারুণ বেশি হারে খাজনা নিতে থাকে, অনেকসময় তা সত্ত্বেও কোম্পানিকে দেয় টাকা পুরিয়ে উঠতে পারে না। সুপারভাইজর সাহেবরা নিতান্তই অজ্ঞ, কোথায় কতটা করভার সহনীয় হতে পারে সে কথা জানে না, অথবা নির্বিকার, কেননা তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে ব্যস্ত। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে যখন এমন অবস্থায় প্রকৃতির মার এলো—অনাবৃষ্টি আর কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

বাংলার নবাব একদিকে শাসনকর্তা অপরদিকে রাজস্ব সংগ্রহটা ইংরেজ কোম্পানির হাতে—যেন দুই রাজা, যেটা ভয়ানক অবস্থা। বঙ্কিম এই দেওয়ানির আমলে দ্বিরাজকতা এবং ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন "আনন্দমঠ"-এর প্রথম দু-এক পাতায় :

> ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজদের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুল-কলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর গুলি খায় আর ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

এমন সময়ে ১৭৬৯-১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ :

> আশ্বিন-কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল,

রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না।...কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা...একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল। লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পর কে ভিক্ষা দেয়! গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে ছেলে স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

এই দুর্ভিক্ষের দিনে পদচিহ্ন গ্রামে "ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।" এখানেই মহেন্দ্র আর কল্যাণীকে রেখে আমাদের যেতে হবে। কিন্তু জেনে রাখা ভাল যে বঙ্কিমের বর্ণনা গালগল্প নয়, এর ভিত্তি উইলিয়ম হাণ্টারের দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটা ইতিহাস। আরেকটা কথা—রাজস্ব আদায় এমনই নিষ্করুণ ছিল যে ১৭৭০ সালের মন্বন্তরে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাঙালী মারা গেলেও রাজস্ব জমা ঠিক পড়েছিল।

১৭৭২-৮৬ দ্বিতীয় পর্যায়। ইংরেজ কোম্পানি ঠিক করল ১৭৭১-৭২ সালে স্বয়ং দেওয়ানি চালাবে, 'নেটিব' নায়েব দেওয়ানকে সরানো হল। রাজস্ব জমার কেন্দ্রীয় খাজাঞ্চিখানা (treasury) মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় সরানো হল। আরও বড় ব্যাপার এই যে ১৭৭২ থেকে দু-এক বছরের ইজারাদারির জায়গায়, আর সনাতন জমিদারদের দিকে পক্ষপাতিত্ব শুরু হ'ল কারণ তারা রাজস্বের ব্যাপারটা ভুঁইফোঁড় ইজারাদারদের চেয়ে জানে ভাল। তবে নীলামের ব্যবস্থাটা বজায় রইল কেননা সর্বোচ্চ রাজস্ব কতটা পাওয়া সম্ভব তার উত্তর নীলাম হলেই পাওয়া যায়। ওয়ারেন হেস্টিংস দেখলেন যে এই বন্দোবস্তে ঝামেলা সবচেয়ে কম। পাঁচ-সালা বন্দোবস্ত শেষ হলে, ১৭৭৭ সাল থেকে বাৎসরিক বন্দোবস্ত শুরু হয়, বেশীর ভাগ জমিদারদের সঙ্গে চুক্তি করে এবং গত তিন বছরের রাজস্বের ভিত্তিতে। আমলাতান্ত্রিক নানা পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল কলকাতা থেকে কেন্দ্রীয় রাজস্বনীতি নির্ধারণ করার যন্ত্রটাকে জোরদার করা—তাই কলকাতায় কন্ট্রোলিং কাউন্সিল অফ্ রেভিনিউ, তারপর রেভিনিউ বোর্ড, কমিটি অফ্ রেভিনিউ, সবশেষে বোর্ড অফ্ রেভিনিউ।

১৭৮৬ থেকে একটা নতুন পর্যায় শুরু যার শেষ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তে। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা সত্ত্বেও যুৎসই রাজস্বব্যবস্থা

কোম্পানি তৈরি করতে পারেনি সেটা ঘনঘন নীতি পরিবর্তন থেকেই টের পাওয়া যায়। এটাও টের পাওয়া যায় যে হেস্টিংসের আমল থেকে কোম্পানির উচ্চপদাধিকারিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে—কত সময়ের জন্য বন্দোবস্ত হওয়া উচিত, কাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত, কিভাবে রাজস্ব নির্ধারিত হবে ? রণজিৎ গুহ (**A Rule of Property for Bengal**) দেখিয়েছেন যে এর মধ্যে ইউরোপীয় অর্থবিদ্যার আধুনিক কালের প্রথম একটা ঘরানা, ফিজিওক্রাট যাদের বলে, প্রভাবশালী ছিল। ইতিমধ্যে ১৭৮৪ সালে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট্-এর ভারত আইনে সরকারের কোম্পানির ওপর দখল বাড়ল, ১৭৮৬ সালে নামজাদা একজন গভর্ণর এলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস সদর থেকে নির্দেশ নিয়ে যে শেষ একটা ফয়সালা করে ফেলতে হবে। তখনও বাংলাদেশ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠেনি, আশা ছিল যে সেদিকে সুরাহা হবে যদি রাজস্বব্যবস্থা পাকাপাকি রকম করা যায়। তাছাড়া রাজস্বের পরিমাণ যদি বেঁধে রাখা যায় তবে ভবিষ্যতে রাজস্ব বাড়াবার ক্ষমতা কোম্পানি হারাবে বটে কিন্তু আপাততঃ নিশ্চিন্ত হবে—এটা দরকার কেননা ঐ রাজস্বের উদ্বৃত্ত থেকেই কোম্পানি এদেশে মাল কিনে ইংলণ্ডে বেচতো। ১৭৮৯ সালে তাই কর্ণওয়ালিস একটা দশ-সালা বন্দোবস্ত করলেন জমিদারদের সঙ্গে এবং এই বন্দোবস্তই ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বলে ঘোষিত হ'ল। এক কথায় : ১৭৬৫-১৭৯৩ এর অভিজ্ঞতার ফল ছিল এই যে কৃষি উৎপন্নের পরিমাণ এবং দাম কত, কৃষি ব্যবস্থাকে উৎপন্ন না করে কতটা রাজস্ব নেওয়া যেতে পারে, রাজস্ব নির্ধারণ করতে আর আদায় করতে খরচ কিভাবে কমানো যায়, এসব কোম্পানির সাহেবদের আয়ত্তে এল না। শেষে নাস্তানাবুদ অবস্থায় কোম্পানি হালে পানি পেল যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস বললেন যে জমিদার দিয়ে রাজস্ব আদায় হোক, কত খাজনা প্রজা জমিদারকে দেবে সেটা নির্ধারণের দরকার নেই, দেওয়ান কোম্পানিকে দেয় রাজস্ব জমিদার দিলেই হ'ল, আর যদি না দেয় তবে জমিদার নাকচ হয়ে নতুন জমিদার বসানো হোক তার জায়গায়। এই হ'ল জমিদারি ব্যবস্থা। আর বার বার রাজস্ব নির্ধারণের ঝামেলা এড়াবার জন্য কর্ণওয়ালিসের সুপারিশ : ১৭৮৯-৯০ সালে দেয় রাজস্ব যা ছিল, সেটা মোটামুটি জমিদারের প্রতি প্রজাদের দেয় খাজনার নয়-দশমাংশ, সেটাই চিরস্থায়ী ভাবে রাজস্ব ধরে নেওয়া যাক্। এই হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

২

চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত নানা কারণে তখন কর্ণওয়ালিস ও কোম্পানির কর্তাদের কাছে মন্দের ভাল মনে হয়েছিল। প্রথমতঃ, রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করতে কোম্পানি ১৭৬৫ সাল থেকে নাজেহাল হয়েছিল। নিস্তার পাওয়ার উপায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত মালিকানার 'যাদু স্পর্শে' জমিদারদের আনুকূল্যে চাষ আবাদের প্রসার হবে এমন একটা আশা ছিল। মনে রাখতে হবে যে তৎকালীন ইংলণ্ডে এমন অনেক জমিদার ও বর্ধিষ্ণু চাষী

'কৃষিবিপ্লব'-এর দ্বারা শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। তৃতীয়তঃ, হয়ত একটা রাজনৈতিক হিসেবও কর্ণওয়ালিস নীতির পেছনে ছিল—জমিদার শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে অন্ততঃ বৃটিশরাজের সমর্থক হবে। চতুর্থতঃ, জমিদার রাজস্ব জমা দেওয়ায় অপারগ হলে জমিদারি নীলাম হবে এই নিয়ম (যাকে 'সূর্যাস্ত আইন' বলা হত কারণ এটা জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট দিনের শেষে জমিদারি খারিজ হয়ে যেত) এই আশায় করা হয়েছিল যে দক্ষতার অভাব হলেই জমিদারি হাতবদল হবে। শেষতঃ, ১৭৭০-এর কুখ্যাত মন্বন্তরে বাঙলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে ; আশা ছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর চাষ-আবাদ আবার বাড়বে।

যেসব আশা করে চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত কায়েম করা হয় ১৭৯৩ সালে, তার মধ্যে শেষ তিনটি মোটামুটি পরিপূরিত হয় : জমিদারদের আনুগত্য, রাজস্ব আদায়ে দক্ষতা, এবং বাঙালীর স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধির ফলে চাষ-আবাদের প্রসার। ১৮৬০-এর দশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কেমন চেহারা ছিল "বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ, আশ্চর্যের বিষয়, এতদিনের ঐতিহাসিক গবেষণার পরেও শ্রেষ্ঠ :

> ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধির ফল কৃষিকার্য্যের বিস্তার।...আরেক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রিটিশ রাজ্য হইয়া পর্য্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য বাড়িতেছে...সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর বৎসর অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চাষ বাড়িতেছে।...চাষবৃদ্ধির ফল কি ? দেশের ধনবৃদ্ধি...এ ধন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য—পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কিছু রাজভাণ্ডারে যায়।...বণিক ও মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।...অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামীরই হস্তে যায়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমির খাজানা বাড়িবে। যে ভূমির আগে একজন প্রার্থী ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার দুইজন প্রার্থী দাঁড়াইবে।...বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে ঝিঙ্গা পটলের দর বাড়ে, প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমির হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি জমিদারের উদরেই গিয়াছে।

মনে রাখা ভাল যে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে যেমন 'সাম্য' প্রবন্ধ সম্বন্ধে মত বদলিয়েছিলেন, এই 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ পুনঃপ্রকাশ কালে লিখেছিলেন ('বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় ভাগ, ১৮৯২) :

> ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা জানা যায়...জমিদারদের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গেছে।

এখানে ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের কথা বলা হচ্ছে—এর কথা পরে আসবে। যাই হোক, বঙ্কিম এইখানে জমিদারদের অনর্জিত আয় বৃদ্ধি

(unearned increment of income) তত্ত্বটি বুঝিয়েছেন অননুকরণীয় ভাবে। এর ফলাফল সবাই জানে—জমিদারির আয় বাড়ার সঙ্গে কৃষিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের হারের উন্নতির কোনও সম্পর্ক ছিল না ; জমিদারেরা রাজস্ব আদায়ে দক্ষ, কিন্তু কৃষির উন্নতিতে অনুৎসুক, অনেক সময়ে জমিদার প্রবাসী (absentee landlord)। "হাসিম শেখের আর রামা কৈবর্তের কিসে মঙ্গল...বল দেখি চশমা-নাকে বাবু ?"

লক্ষ করার বিষয় যে বঙ্কিম পুরনো জমিদারদের পতন সম্বন্ধে হাহাকার করেননি। এটা সত্যি যে ১৭৯৩-১৮১৫ সালের মধ্যে কমবেশি চল্লিশ শতাংশ জমিদারি হাতবদল হয়। কিন্তু একটা দস্তুর দাঁড়িয়ে গেছে এই নিয়ে হাহাকার করা—যে পুরনো জমিদারেরা গেলেন আর যতসব ব্যবসায়ী, বেনিয়ান ইত্যাদি তার জায়গায় এলো। এটা বাজে কথা। কোন প্রমাণ নেই যে পুরনো জমিদারেরা 'ভাল' ছিল। কৃষকের পয়সা গুণে নেবে হয় কোন মুচিরাম গুড়, নয় কোন মহারাজা, এতে কারো সন্তোষের কারণ দেখা যায় না—মহারাজের পক্ষে ছাড়া। তাছাড়া যেসব নতুন হাতে জমি এলো তাদের অধিকাংশ ব্যবসাদার নয় ; জমিদারের আমলা, কর্মচারী, পেশাদার মানুষ এবং অন্যান্য জমিদার নীলামে কিনতো সূর্যাস্ত আইনের শিকার জমিদারিগুলিকে। এটা অধ্যাপক সিরাজুল ইস্‌লাম (The Permanent Settlement in Bengal) হিসেব দিয়ে প্রমাণ করেছেন।

এখন ভূমিব্যবস্থা ও শাসননীতির প্রশ্নে ফিরে যাওয়া যাক্। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঐসব ফলাফল ছাড়াও শাসকদের চোখে সেটার বড় একটা ত্রুটি হ'ল এই যে ১৭৯৩ সালে নির্ধারিত রাজস্ব আদায় হতে লাগলো বটে, কিন্তু রাজস্ব বাড়াবার কোন সুযোগ রইল না। লাভের গুড় কৃষকও নয়, সরকারও নয়,—মধ্যবর্তী জমিদার এবং তারও অধীন পত্তনীদার ইজারাদারের দল খেয়ে যায়। এই মধ্যবর্তীদের স্ফীতি, সংখ্যা ও আয়ের হিসেবে, স্বাভাবিক—বাংলার ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত ফ্লাড কমিশন (Floud Commission, 1938-40)-এর মতে "চিরস্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারিত এবং জমিদারকে দেয় খাজনার ক্রমবৃদ্ধির মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল ব্যবধানের পরিণাম।" প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তের এই পরিণতি উনিশ শতকের গোড়াতেই স্পষ্ট হয়েছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় কেন জমিদারি সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়ে কোম্পানি অন্য ভূমিব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে লাগলো। উদ্দেশ্য মধ্যবর্তী শ্রেণী বাদ দিয়ে সরাসরি রায়তের সঙ্গে রাজস্ব-চুক্তি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদলে ২০ বা ৩০ বছর অন্তর রাজস্ব পুনর্নির্ধারণ যাতে কৃষির প্রসার ও বাজার বাড়লে সরকার বাড়তি আয়ের অংশ পেতে পারে। বাংলার ভূমিব্যবস্থার গলদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছাড়াও আরেকটা ব্যাপার ছিল নতুন চিন্তার পেছনে—সেটা হ'ল ইংলণ্ডের উপযোগবাদী (utilitarian) অর্থনীতি ও শাসননীতির প্রভাব, মানে ডেভিড রিকার্ডো ও জন বেস্থামের প্রভাব। অধ্যাপক এরিক স্টোক্‌স্ (English Utilitarians and India) এই দুই মনীষীর, বিশেষতঃ বেস্থামের, ভারতের

শাসননীতির ওপর প্রভাব বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে রিকার্ডোর প্রভাব সম্বন্ধেই আলোচনা করব কেননা বেন্থাম-এর ছাপ পড়েছে মূলতঃ আইন ও রাজনৈতিক জগতে। রিকার্ডো উনিশ শতকের প্রথম ভাগের অর্থবিদ্‌দের মধ্যে অন্যতম ; পরের প্রজন্মে সনাতনী অর্থবিদ্যার ওপর তার প্রভাব দারুণ, আবার সনাতনীদের সর্বপ্রধান সমালোচক কার্ল মার্কস-এর লেখাতেও দেখা যায় একমাত্র রিকার্ডো সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও একটু নরম ভাব। তখনকার দিনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলাদের প্রশিক্ষণের জন্য ইংলণ্ডে হেইলবেরি কলেজে অর্থবিদ্যা শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হত ; ইউরোপে প্রথম যে কয়েকটি অর্থবিদ্যার অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে ঐ কলেজে একটি, আর টমাস মলথাস ছিলেন প্রথম অধ্যাপক। এই কলেজের ছাত্রদের মাধ্যমে তো বটেই, তাছাড়া অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মাধ্যমে (যথা, কোম্পানির লণ্ডন অফিসের উচ্চপদাধিকারী জেম্‌স্‌ মিল, যিনি জন স্টুয়ার্ট মিল্‌-এর পিতা হিসেবে বোধহয় আরও বিখ্যাত, এলফিনস্টন, এডওয়ার্ড স্ট্রেচি ইত্যাদি) উপযোগবাদ ও রিকার্ডোর নীতি প্রভাব বিস্তার করে এই দেশে।

রিকার্ডোর মতে (১৮২১ সালে তার **প্রিন্সিপল্‌স্‌ অব পলিটিকল ইকনমি** প্রকাশিত) জমির জন্য জমিদাররা যে খাজনা পায় সেটা সীমিত পরিমাণ প্রকৃতির দানের ওপর একচেটিয়া মালিকানার খাতিরে। জমিদার উৎপাদনের জন্য কিছু করে না। শ্রমিক দেয় শ্রম, পুঁজিপতি দেয় পুঁজি, উদ্যোগী ব্যবসাদার দেয় উদ্যোগ সংগঠক চেষ্টা—তাদের কাছে কর নেওয়া মানে উৎপাদনের ওপর একটা ভার চাপানো, তার বিকাশ ব্যাহত করা। কিন্তু জমিদার যেহেতু উৎপাদনের জন্য কিছু করে না, কেবল মালিকানার খাতিরে অনর্জিত আয় ভোগ করে, জমিদারের আয়ের ওপর কর বসানো সবচেয়ে ভাল, উৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রগতি তাতে ব্যাহত হয় না। এই নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে হলে, জমিদারদের মালিকানার আয়ের যতটা সম্ভব বেশি অংশ রাজস্ব হিসেবে সরকারের প্রাপ্য হওয়া উচিত—এর মানে সম্ভব হলে জমিদারি ব্যাপারটাই উঠিয়ে দেওয়া। অবশ্য উঠিয়ে দিলেও কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব কি হিসেবে নেওয়া হবে সেই প্রশ্ন ওঠে। তার উত্তর : কৃষিজ দ্রব্যের মোট মূল্য থেকে কৃষকের শ্রমের মূল্য এবং উৎপাদনের জন্য খরচ বাদ দিয়ে যে অংশ বাকি থাকে তার একটা অংশ রাজস্ব হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। এই অংশ অর্ধেক না দুই-তৃতীয়াংশ না কত হবে সেটা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়।

সংক্ষেপে এই হল রিকার্ডিয় রাজস্ব নীতি যেটা ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই নীতির জমিদারি-বিরোধী দিকটা স্পষ্ট। বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সরকারি আমলাদের মোহমোচন ও বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার কথা আগেই বলেছি। এই দুটি ব্যাপার একত্রে রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ভূমিব্যবস্থার পক্ষে টেনে নেয় বেশিরভাগ শাসকশ্রেণীর ইংরেজদের। নতুন উপযোগিতাবাদী চিন্তাধারার অনুসরণ করে তাদের উদ্দেশ্য : কৃষকের শ্রমের মূল্য সমেত কৃষিকর্মের খরচ বাদ দিয়ে যা বাকি থাকে তার ওপর রাজস্ব নির্ধারণ

(এটা রাজস্ব নির্ধারণের তত্ত্ব, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা দেখি প্রকৃত বন্দোবস্তের সঙ্গে এর ক্ষীণ সম্পর্ক), এবং কিছু বৎসর অন্তর অন্তর রাজস্ব পুনর্নির্ধারণ করে বা খাজনার বৃদ্ধির সঙ্গে রাজস্বের সমতা রক্ষা করা। রায়তওয়ারি মানে সরাসরি রায়তের সঙ্গে রাজস্ব চুক্তি আর মহলওয়ারি ব্যবস্থা মানে রায়তের বদলে মহল বা গ্রাম বা গ্রামসমষ্টিকে রাজস্বের জন্য দায়ী ধরে নেওয়া।

৩

রায়তওয়ারি ব্যবস্থার জনক টমাস মানরো, ইনি কেমন ভাবে জেলা শাসকের পদ থেকে মাদ্রাজের গভর্ণর হওয়া অবধি একনিষ্ঠভাবে এই ব্যবস্থা নির্মাণ করেন, অধ্যাপক নীলমণি মুখোপাধ্যায় (The Ryotwari System in Madras) তা দেখিয়েছেন। এই ব্যবস্থার মূল কথাটা সহজ, রায়তের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, কতটা রাজস্ব ? এর উত্তর গোলমেলে কারণ তত্ত্বটা সোজা হলেও সহজ নয় এইসব হিসেব করা : উৎপন্ন কৃষিজ দ্রব্যের পরিমাণ কত ; বিভিন্ন উৎপাদনের মূল্য বাজার দরে কত ; কৃষকের বীজ সার পশুপালন ইত্যাদির খরচ কত ; বেতন হিসেবে কৃষক পরিবারের কতজনের কয়দিনের খরচ শ্রমের মূল্য ধরা হবে ; স্থায়ী কৃষি পুঁজি অর্থাৎ লাঙল, বলদ ইত্যাদির অবক্ষয় (depreciation) বাৎসরিক হিসেবে কত ধার্য করা উচিত, ইত্যাদি। প্রথম দুটি উত্তর থেকে পাওয়া যাবে মোট আয়, আর বাকি উত্তরগুলি থেকে পাওয়া যাবে উৎপাদনের খরচ ; খরচ বাদ দিয়ে যা বাকি রইলো তার পঞ্চাশ শতাংশ হবে রাজস্ব, এই ছিল মাদ্রাজ রাজস্ব নীতি। যে ধরনের তথ্য ও সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব দরকার তার অভাবে এই সব প্রশ্নের উত্তর প্রায় সময়েই পাওয়া যেত না এবং উনিশ শতকের শুরু থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত মোট আয়, নিট আয় ইত্যাদি নিয়ে বহু আলোচনা চলে ; এটা স্পষ্ট ছিল বিশেষভাবে মানরোর নিজের মতে যে রাজস্ব গোড়ার দিকে বড়ই উঁচু হারে ধরা হয়েছিল বিশেষভাবে যেহেতু ফসল ও তার দামের কমা-বাড়ার সঙ্গে রাজস্বের তারতম্য ঘটত না। ১৮৬১ সালে নয়া বন্দোবস্ত শুরু হয় ৩০ বৎসরের জন্য এবং এবারে মোট আয় থেকে খরচ বাদ দিয়ে নিট যা থাকে তার পঞ্চাশ শতাংশ ধরা হয় রাজস্ব।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও রায়তের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি ও অস্থায়ী বন্দোবস্ত মাদ্রাজের মত কায়েম হয়। এখানে একই রাজস্ব তত্ত্ব গৃহীত হয়। বোম্বাইয়ের আর. কে. প্রিংগল্ ও জর্জ উইনগেট-এর মত রাজস্বতত্ত্ববিদ্ খুব কম ছিল। কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরকম। ১৮২৪-২৮, ১৮৩৫-৭২ সালে দফায় দফায় যে বন্দোবস্ত করা হয় তার মূল সূত্র উৎপাদন ও খরচের হিসেব নয়, বিভিন্ন জমির উৎপাদন ক্ষমতা অর্থাৎ উৎকর্ষ এবং প্রাক্তন বন্দোবস্তে রাজস্বের হার। জেলার মোট রাজস্ব দামের হেরফের আর প্রাক্তন রাজস্বের হার অনুসারে নির্ধারণ করে তারপর জমির উৎকর্ষ অনুসারে রায়তদের জমির ওপর

রাজস্ব ভাগ করে দেওয়া হত। অনেকটাই এটা জেলা অধিকর্তার অভ্যস্ত আন্দাজের ব্যাপার। মাদ্রাজের মতন বোম্বাইতেও বন্দোবস্ত ৩০ বৎসরের জন্য নির্ধারিত হত।

লক্ষ করার বিষয় যে মাদ্রাজে ও বোম্বাইতে সমষ্টি বা সংগঠন হিসেবে গ্রামের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করা হয়। অথচ মাদ্রাজে মানরো কিংবা বোম্বাই প্রদেশে এলফিনস্টন গ্রামীণ সমাজের প্রাচীনতা ও প্রশাসনিক কার্যকারিতার ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন : কার্ল মার্ক্স-এর ভারতীয় গ্রাম সম্বন্ধে তাত্ত্বিক নিবন্ধগুলি এলফিনস্টন ইত্যাদির প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই। রায়তের সঙ্গে সরাসরি চুক্তির ফলে গ্রামব্যবস্থার যে কোনই জায়গা রইলো না রাজস্ব প্রশাসনের যন্ত্রে, তার জায়গায় যে এসে দাঁড়ালো কৌশলনিপুণ অনেকসময় ঘুষখোর অধস্তন সরকারি কর্মচারী, এটা অনেকেই অবাঞ্ছনীয় মনে করে। অযোধ্যার কিছু অংশ, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী এলাকা, এবং পাঞ্জাব, যেগুলি আস্তে আস্তে ইংরেজদের হাতে এলো সেসব জায়গায় গ্রামীণ সমাজসংহতি এবং প্রশাসনিক ভূমিকা বেশ সজীব ছিল এটা ইংরেজ শাসকগণ বোধ করে। উত্তর ভারতে যে প্রদেশটাকে তখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বলা হত—এখন উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম ভাগ—সেখানে গ্রামগুলিকেই রাজস্ব প্রশাসনের কাজে ব্যবহার করার ধারণা দানা বাঁধে—অথবা যেখানে কোনও ভূস্বামী পুরো মহালের অধিকর্তা সেখানে তার সঙ্গেই চুক্তি চলতে পারে বলে মনে হয়। এরই সঙ্গে চাই রায়তওয়ারির মতনই ৩০ বছরের অস্থায়ী বন্দোবস্ত, এবং একই রাজস্ব নির্ধারণের নীতি। গ্রাম বা মহাল ভিত্তিক ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে রায়তওয়ারির কিছু নীতির এই সংকর বিবাহে ঘটকালি করলেন হোল্ট্ ম্যাকেন্‌জী। ১৮১৯ সালে তিনি একটি প্রতিবেদনে এই নতুন ধরনের মহালওয়ারি ভূমিব্যবস্থার সূত্রপাত করেন, ১৮২২ সালে ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় এবং তার পরে গভর্ণর উইলিয়াম বেণ্টিংকের সমর্থন ও রবার্ট বার্ড ও জেম্‌স্ টম্‌সন্-এর ১৮৩৩-৫৩ সালের বন্দোবস্তে এই ব্যবস্থা চূড়ান্ত রূপ পেল। বোম্বাই-এর তুলনায় উত্তর ভারতীয় বন্দোবস্ত অনেক বৈজ্ঞানিক জরিপ ও হিসেবের ভিত্তিতে হয়েছিল মনে হয় ; এখানেও উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল আবাদ খরচ বাদ দিয়ে উৎপন্নের নিট্ মূল্যের একটা অংশ—দুই-তৃতীয়াংশ নেওয়া হবে ঠিক হয় ১৮৩৩ সাল থেকে। এটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি ধরা হয়েছিল। তাই ১৮৫৫ সালে স্থির করা হয় যে যেখানে ভূস্বামী খাজনা পায় সেখানে খাজনার অর্ধেক এবং অন্যত্র নিট্ উৎপাদনের মূল্যের অর্ধেক রাজস্ব হবে। কিন্তু আর সব প্রদেশের মতন এখানেও এই নিট্ উৎপাদনের মূল্য হিসেব করাটা এতই দুরূহ ছিল যে শেষে হরে দরে একটা আন্দাজি হিসেবে রাজস্ব নির্ধারণ হতে থাকে—জমির আগেকার রাজস্ব কত ছিল, কৃষি উৎপন্নের দাম কমল কি বাড়লো, আর আশেপাশে খাজনার হার কি, এই ভিত্তিতে। ভারতের সর্বত্র ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে বেডেন পাওয়েলের বিরাট বইটি (Land Systems of British India) পড়লে এটা বোঝা যায়।

এখন তিনটে মূল ভূমিব্যবস্থার ছবি পাওয়া গেল। বাংলায় চিরস্থায়ী

জমিদারি, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে অস্থায়ী ৩০ বৎসরের রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত, উত্তর ভারতে ৩০ বৎসরের মহালওয়ারি। মহালওয়ারি ব্যবস্থাই স্থান-কাল-পাত্রের হেরফেরের খাতিরে একটু অদলবদল করে পাঞ্জাবে এবং মধ্যপ্রদেশে কায়েম করা হয়। যেমন পাঞ্জাবে গ্রাম সমাজের কড়া জান ছিল, মধ্যপ্রদেশে মালগুজার শ্রেণী প্রায় ছোট জমিদার গোছের ছিল—সেই ওজনে হেরফের। আবার অযোধ্যার তালুকদারদের স্থান বাংলার জমিদারদের মতনই, কিন্তু এদের সঙ্গে চুক্তি বাংলার মত চিরস্থায়ী হয়নি, ৩০ বৎসরের। বাংলার চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরতম জেলাগুলিতে (এখন এই অংশগুলি বেশিরভাগ অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত) বসানো হ'ল কেননা এখানে জমিদারশ্রেণী প্রবল ছিল। উড়িষ্যাতেও জমিদারদের অগ্রাহ্য করা গেল না, কিন্তু বাকি সব প্রদেশেই রায়তওয়ারির বিভিন্ন সংস্করণ বেরোল—যথা সিন্ধু প্রদেশ, আসাম, কুর্গ ইত্যাদি। লক্ষ করার বিষয় যে সাধারণতঃ অস্থায়ী বন্দোবস্তগুলি ৩০ বছরের, কিন্তু অনগ্রসর প্রদেশে শীঘ্র আবাদ ও খাজনা বাড়বার আশায় বন্দোবস্ত ২০ বছরের বেশি হতো না—যথা, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ। সারা ভারতে এই তিনটি ব্যবস্থার প্রসার কেমন দাঁড়িয়েছিল তার একটা হিসেব ১৯২৮-২৯ সালে পাওয়া যায় : মোট আবাদী জমির ১৯ শতাংশ জমিদারি বন্দোবস্তে, ২৯ শতাংশ মহালওয়ারি বন্দোবস্তে, ৫২ শতাংশ রায়তওয়ারি বন্দোবস্তে।

৪

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ইংরেজ শাসকদের সামনে ভূমিব্যবস্থা ও রাজস্বনীতির ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন তিনটি—"কে রাজস্বের জন্য দায়ী হবে ?" (জমিদার বা রায়ত বা গ্রাম-মহাল ইত্যাদি) "কত রাজস্ব দেবে ?" (নিট্ উৎপাদনের মূল্যের হিসেবে বা সনাতন খাজনা আদায়ের নিরিখে ইত্যাদি) এবং "রাজস্ব নির্ধারণ কখন হবে ?" (একবার হয়ে চিরস্থায়ী বা ৩০ বছর অন্তর বা ২০ বছর অন্তর ইত্যাদি) ? এই তিন প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রদেশে গজিয়ে ওঠে স্থান কাল ও পাত্র ভেদে, কখনও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা কখনও তাত্ত্বিক প্রভাবের ফলে। এই উত্তরগুলি চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত এবং অস্থায়ী রায়তওয়ারি ও মহালওয়ারি বন্দোবস্ত, এই তিন ঘরানার নানা টুকরো জুড়ে বিভিন্ন প্রদেশে তৈরি হয়েছিল। এটা মনে রাখলে ভারতের ভূমিব্যবস্থার ইতিহাসের জটিলতা ও অন্তর্দেশীয় বিভিন্নতাটাকে বুঝতে সাহায্য পাওয়া যায়। এই ভূমিব্যবস্থার ইতিহাস সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লেখা মারাত্মক সহজ। কোন আমলা কাকে কি চিঠি লিখলেন, তার উত্তরে কি প্রতিবেদন এল ইত্যাদি। সেই পুরনো ইতিহাসের ঘরানা— 'তাহার-পর-সমরসিংহ-সিংহবিক্রমে- জঙ্গ বাহাদুরকে-রণক্ষেত্রে- পর্য্যুদস্ত-করিলেন' ইত্যাদি— তার চেয়েও এই আমলাদের ইতিহাস আরও ভয়াবহ এবং হয়ত অনেক সময় তাৎপর্যহীন। কাজেই মোদ্দা

ব্যাপারটা কি দাঁড়াল সেটাই ধরবার চেষ্টা করেছি আমরা।

সবশেষে দেখতে হবে উনিশ শতকের শেষ ভাগে বা বিশ শতকের গোড়ায় এই যে ভূমিব্যবস্থার সমাবেশ তার ফলাফল নিয়ে প্রচুর তর্ক হয়, প্রথমে আমলা মহলে পরে জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকায়। বাংলা (ও বিহারের) চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত চিন্তাধারার যে ঘরানা, তারা উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে হেরেছিল রায়তওয়ারি ও মহালওয়ারির সমর্থকদের কাছে সে তো আমরা দেখেছি। কিন্তু এটাও দেখেছি যে অস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় প্রথম পর্যায়ে খুব উঁচুহারে রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হচ্ছিল এবং রাজস্ব নির্ধারণের তত্ত্ব আর তার ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে ফাঁক ছিল। এছাড়া রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে সাহেবি কড়াকড়ি এসে গেল সনাতন ঢিলেঢালা মাপ-মকুব-নিষ্কর দেওয়ার নবাবি কায়দার বদলে। তারপর উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে মনে হয় বিভিন্ন প্রদেশে একটা মন্দাও এসেছিল এবং কোন কোন জায়গায় চাষ আবাদ কমে যায়—তবে এ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত হয়নি। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ : ১৮০২-০৪, ১৮০৬-০৭, ১৮১২-১৫, ১৮১৯-২০, ১৮২৩-২৬, ১৮৩০-৩২, ১৮৩৭, ১৮৫৪, ১৮৬০—এই সব বছরে বড় গোছের দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল সেসব এলাকায় যেখানে রায়তওয়ারি ও মহালওয়ারি ব্যবস্থা নিয়ে নানা পরীক্ষা, হিসেব, প্রতিবেদন, তত্ত্ব, হু-হু করে লেখা হচ্ছিল সরকারি দপ্তরে দপ্তরে। কোম্পানির সরকার খতম হয়ে মহারাণীর সরকার আসার পর প্রথমেই উত্তর ভারতে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব ও পূর্ব রাজস্থান) দুর্ভিক্ষ, ১৮৬০ সালে এই দুর্ভিক্ষের পর প্রথম সরকার দ্বারা দুর্ভিক্ষের বিষয় খতিয়ে অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়।

বেয়ার্ড স্মিথের মতে দুর্ভিক্ষ বারবার আসছিল সেইসব প্রদেশে যেখানে রাজস্ব বন্দোবস্ত অস্থায়ী ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলে কৃষি আয়ের কিছুটা কৃষির উন্নতিতে নিয়োজিত হবে, নচেৎ পরের দফার বন্দোবস্তে বর্ধিত রাজস্বের ভয়ে কেউ বিনিয়োগ করবে না।

কিন্তু এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ওকালতির বিরুদ্ধে রিকার্ডিয় রাজস্ব নীতির প্রবক্তারা খুব সমালোচনা শুরু করলেন। তা সত্ত্বেও লণ্ডনে ভারতসচিব চার্লস উড নীতিগত ভাবে বেয়ার্ড স্মিথের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই নিয়ে তর্ক ও টালবাহানা চলতে চলতে দুটি সমস্যা দেখা দিল। প্রথম, 'সিপাহী বিদ্রোহ দমনের খরচ অনেক, ভারত সরকারের দেনা বাড়ল, ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের চাপে অনেক আমদানি কর রেহাই দিয়ে সরকারের আয় কমলো, ইত্যাদি—অর্থাৎ আর্থিক অনটন। দ্বিতীয়তঃ, ১৮৭০-এর দশকের শুরু থেকে পৃথিবীর বাজারে রূপোর দাম সোনার তুলনায় কমতে লাগলো, সুতরাং ভারতীয় রৌপ্যভিত্তিক মুদ্রার মূল্য স্বর্ণভিত্তিক বৃটিশ মুদ্রার তুলনায় কমতে লাগলো, এদিকে মহারাণীর সরকারের 'দিশি খরচ' (অর্থাৎ কিনা বিদেশি খাতে, ইংলণ্ডে, খরচ যাকে বলা হত 'হোম চার্জেস') সেটা বাড়তে লাগলো—অর্থাৎ আর্থিক অনটন। এই অনটনের মুখে ভবিষ্যতে রাজস্ব বাড়ানোর ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ

করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা বৃটিশ ভারতের সরকারের পক্ষে অসম্ভব। তাই টালবাহানা চলতেই লাগলো এবং শেষে ভারতসচিব পূর্বের সিদ্ধান্ত খারিজ করে ১৮৮২ সালে ঘোষণা করলেন যে অস্থায়ী বন্দোবস্তই চলবে। এর প্রায় দুই দশক পরে রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে দাবী করতে শুরু করেন। এই নিয়ে বড়লাট কার্জন-এর সঙ্গে রমেশ দত্তের বিতর্ক অনেকের জানা। যেটা তেমন পরিচিত নয় সেটা হচ্ছে রমেশ দত্ত যৌবনের উৎসাহে ১৮৭৫ সালে একটা বই লিখেছিলেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে তো বটেই, কিন্তু তার বড় কথাটা ছিল কৃষকের জমিদারকে দেয় খাজনাটাকেও চিরস্থায়ীভাবে বেঁধে দেওয়া যাতে জমিদারের শোষণ উত্তরোত্তর না বাড়ে। এই লেখার ফলে জমিদারদের কাগজ হিন্দু পেট্রিয়টে কড়া সমালোচনা, সিভিল সার্ভিস-এর শাসানি, জমিদার বন্ধুদের অনুযোগ। শেষ বয়সে রমেশ দত্ত যখন আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে প্রস্তাব করেন, তখন কিন্তু আর কৃষক-জমিদারের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা তোলেননি, কেবল সরকারকে দেয় রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথাই বলেন। এবং তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসেরও দাবী ছিল একই ধাঁচের। এটা ঠিকই, যেখানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সেখানেই সরকারের হাতে কৃষিজ আয় কম পরিমাণে দিতে হয়। যেমন ১৯৩৩-৩৪ সালের একটা হিসেব অনুসারে বাংলা প্রদেশে প্রতি একর আবাদী জমির ওপর রাজস্ব মাত্র শূন্য দশমিক বিরানব্বই টাকা, যখন মাদ্রাজে রাজস্ব গড়ে একর প্রতি দুই দশমিক বাষট্টি টাকা। কিন্তু রাজস্ব কমিয়ে কার টেঁক ভারি হ'ল, "কাহার শ্রীবৃদ্ধি" ? বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর আগেই দেখেছি। চিরস্থায়ী বনাম অস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন হ'ল প্রজাস্বত্বের ওপর ভূমি ব্যবস্থার প্রভাব কেমন হ'ল এবং সরকার প্রজাস্বত্ব রক্ষার জন্য কি করল ? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাবো পরের এক পরিচ্ছেদে যার বিষয় গ্রামীণ শ্রেণী-বিন্যাস।

অধ্যায় ৪

কৃষির বাজার আর কৃষক, মজুর, মহাজন

আজকের দিনে বাজারের গণেশ কৃষি-লক্ষ্মীকে চালনা করে। সাবেক কালে এমন ছিল না। চাষের ফসলের বাজার চিরকালই ছিল। তবে কত পরিমাণ ফসল বাজারে বিক্রী হবে, কতটা চাষীর নিজের ঘরেই যাবে, কতটা চাষীর গ্রামেই কি আশেপাশে অন্য জিনিস বা অবশ্যকরণীয় কিছুর জন্য যজমানির খাতিরে বিনিময় হবে, সেটা বদলায় স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে। মধ্যযুগে ভারতে গ্রামগুলি স্বয়ংভর ছিল, এ বিশ্বাস এককালে ঐতিহাসিকদের ছিল। ইরফান হাবিব প্রমুখ অনেকে ইদানীং দেখিয়েছেন যে যথেষ্ট পরিমাণে কৃষি দ্রব্য বাজারে আসত এবং এটা মোগল যুগের শেষভাগে বাড়ছিল, কেননা রাজস্ব ফসলের পরিবর্তে মুদ্রায়, এবং হয়ত মোট উৎপাদনের তুলনায় বর্ধমান অনুপাতে, সংগৃহীত হচ্ছিল। তাছাড়া প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ যদি শহরে থাকে, হাবিবের হিসেব অনুসারে, তাহলে গ্রামের ফসলের চাহিদা শহরে যথেষ্ট হবেই। ইউরোপীয়দের সঙ্গে, বিশেষভাবে সপ্তদশ শতক থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগুলির মাধ্যমে পশ্চিম জগতের সঙ্গে যে বাণিজ্য, তাতে রপ্তানি হত মূলত কুটীর শিল্পের উৎপাদন, কিন্তু দু-একটা কৃষি পণ্যও ছিল (যথা, রঞ্জক নীল) এবং বহির্বাণিজ্যে তৈরী মালের চাহিদার ফলে অন্তর্বাণিজ্যে কিছু কাঁচা মালের (যথা তুলো) চাহিদা বাড়লো। এসব কারণে কৃষিজ দ্রব্যের বাজার ছিল না এমন নয়।

কিন্তু উনিশ শতক থেকে যে ভাবে কৃষিপণ্যের বাজার তৈরী হল সেটা ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমতঃ পরিমাণগত পার্থক্য—অর্থাৎ বাজারে যতটুকু পৌঁছায় তার সঙ্গে মোট উৎপাদনের অনুপাতের হিসেবে। দ্বিতীয়তঃ, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আওতায়, ইংলণ্ডের কারখানার আঁচে ভারতের কৃষিপণ্যের বাজার গরম হওয়াটা ধাতেই আলাদা ব্যাপার।

অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুরোনো প্রাক্-ঔপনিবেশিক ধারার দুটি কার্যকারণ সম্বন্ধ উনিশ শতকেও বহাল রইল: এক, রাজস্বের তাড়না অর্থাৎ খাজনা দেওয়ার জন্য ফসল বিক্রী, এবং দুই, শহরে চাহিদা। কিন্তু এই পরিবেশে নূতন কিছু উপাদান কৃষির বাজার তৈরী ত্বরান্বিত করল। প্রথম, অন্তর্বাণিজ্যের পরিবহণের উন্নতি। বিলিতি পুঁজিতে তৈরী রেলপথ দেশের সুদূর অন্দর থেকে

কৃষির উৎপাদন বাহির মহলে নিয়ে এলো, মাদ্রাজ, কলকাতা, বোম্বাই বা করাচির জাহাজ ঘাটে। পরের পরিচ্ছেদের সরকারি নীতির আলোচনায় দেখব যে এটা ইংলণ্ডের বণিক শ্রেণীর বিশেষ শিল্পপতিদের উদ্দিষ্ট ছিল—কাঁচামাল, যথা তুলো, উপনিবেশ থেকে সরবরাহ বজায় রাখার জন্য রেলপথ তৈরী (অপরপক্ষে শিল্পদ্রব্য উপনিবেশে চালান করা)। বাইরের মহলে, নূতন ঔপনিবেশিক নগরে আধুনিক পোতাশ্রয়, সওদাগরি আমদানি রপ্তানি দপ্তর, ব্যাঙ্ক, ইত্যাদি বিলিতি ও কিছু দিশি পুঁজির কেন্দ্রস্থলে এক জগৎ। দেশের ভেতরে চাষী মহাজন পাইকার দালালদের আরেক জগৎ—রেলপথ সেতুবন্ধ স্বরূপ এই দুই স্তরের মধ্যে। রেলপথের সহকারী হল দিশি নৌকা, বলদটানা গাড়ী এমনকি মানুষের পিঠে মাল, নদীনালায় চালু স্টিমার, জাহাজ, সরকারি উদ্যোগে তৈরী রাস্তাঘাট। এই ভাবে দেশের ভেতরের কেনাবেচার বাজারের পথ সুগম হল। দ্বিতীয়তঃ এরই ফল হ'ল কৃষির আঞ্চলিক বিশেষীকরণ। অর্থাৎ বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক বিশেষত্বের সুযোগ নিয়ে বিশেষ ফসল ফলানর প্রবণতা বাড়লো। যেমন ধরা যাক্ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির, বর্তমানে মহারাষ্ট্রের, দাক্ষিণাত্যের জেলাগুলিতে আগ্নেয় শিলাজাত কালো মাটি তুলো চাষের সবচেয়ে ভাল জায়গা; সেখানে চাষীর পক্ষে আগে তুলা আর গম আর জওয়ার বাজরা যুগপৎ আবাদ করাটাই স্বাভাবিক ছিল, কেননা নিকটস্থ বাজার ছাড়া তুলো বেচবে কোথায়, আর নিজের খাওয়ার জন্য, গ্রামের চাহিদার জন্য খাদ্যশস্যও চাই। কিন্তু ১৮৬০ সালের পর থেকে তুলোর বাজার ইংলণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত, তাই তুলোর আবাদে বিশেষীকরণ করে সেই পয়সায় খাদ্যশস্য কেনা যেতে পারে। যেখানেই বাণিজ্যের রাস্তা সুগম সেখানেই কম বেশী বিশেষীকরণ চালু হ'ল। এর মানে চাষী বাজারে কেবল বিক্রেতা নয়, ক্রেতাও বটে।

দেশের ভেতরে এই প্রবণতার সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের সম্পর্কটা স্পষ্ট। বহির্বাণিজ্যে চালিকাশক্তি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে ইংলণ্ডে শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা তো রয়েছেই। এই চাহিদা মেটাতে কি দরকার? প্রথমতঃ ইংলণ্ড থেকে ভারতে পরিবহণের উন্নতি। দক্ষিণ আফ্রিকার শিং পেরিয়ে অতলান্তিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের রাস্তাটা ক্রমেই সুগম হল লোহা-ইস্পাতের বাষ্পীয় পোত চালু হবার পর। তারপর ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খালের পথ খোলা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এতে যে কেবল আগে যা কৃষি দ্রব্য চালান হচ্ছিল সেগুলি আরও কম সময়ে পৌঁছতে লাগলো তা নয়, এতে প্রতি কিউবিক টন মালের জাহাজ ভাড়া প্রায় ৩০ শতাংশ কমে গেল। তার মানে এক তো ভারতের মাল আরও সস্তায় ইউরোপ পৌঁছতে লাগল অর্থাৎ বাজার বাড়লো, যেমন তুলোর বাজার। এছাড়া জাহাজ ভাড়া যখন বেশী ছিল তখন প্রতি কিউবিক টনের গড় মূল্য যে সব পণ্যের বেশী সেগুলিই কেবল চালান করাটা লাভজনক হত; জাহাজ ভাড়া যত কম হতে লাগলো অনেক নতুন কৃষিপণ্য চালান হতে লাগলো যেহেতু আয়তনের তুলনায় মূল্য কম হলেও সেটা এবার পড়তায় পোষায়। চাল এবং গমের রপ্তানি বাড়া এর উদাহরণ।

দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের দিকে ভারতীয় কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে বৃটিশ ভারতের সরকার যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। রেলপথের বিন্যাস করা হয়েছিল সামুদ্রিক পোতাশ্রয় আছে এমন সব শহর অবধি দেশের কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে। রেলভাড়া এমন ভাবে নির্ধারিত হল যে কাঁচামাল সস্তায় যেসব শহরে পৌঁছতে পারে। (একই পথে শিল্পদ্রব্যের ওপর ভাড়া বেশী ধার্য হয়)। সবচেয়ে বড় কথা সরকারি করনীতি কৃষিপণ্য রপ্তানির পক্ষপাতী : ১৮৬০ সালে প্রথম বাজেট প্রণেতা ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী (তখন বলা হত গভর্নর জেনেরেলের কাউন্সিলের ফিনান্স মেম্বার) জেম্‌স উইলসন এই নীতি চালু করেন। তাঁর বক্তব্য, ভারতের স্বাভাবিক সুবিধা কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করা, তাই থেকে ভারত যথা সম্ভব বহির্বাণিজ্যে আয় করবে, এই রপ্তানির ওপর করভার চাপালে বাইরে বাজার নষ্ট হবে। অর্থাৎ ভারত কৃষিপ্রধান দেশ রূপে কাঁচা মাল রপ্তানি করে শিল্পসমৃদ্ধ ইংলণ্ডকে যোগান দেবে। এই করনীতি, কৃষিদ্রব্যের রপ্তানি-শুল্ক কম রাখা, প্রায় সম্পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য হয়ে দাঁড়ায় ১৮৮২ সালের পর ; শতকের শেষ দিকে চাল ছাড়া প্রায় সমস্ত প্রধান কৃষিপণ্য বিনা শুল্কে রপ্তানি হত। মহাযুদ্ধের পর, জেম্‌স উইলসনের বাজেটের প্রায় ষাট বৎসর পরে, রপ্তানি শুল্ক চালু হয় কাঁচা চামড়া (১৯১৯), পাট ও চা (১৯২২), কাঁচা তুলো (১৯২৩) ইত্যাদি পণ্যের উপর। ১৯৩০-এর দশকের পণ্যনীতি পরে আলোচ্য।

কি কি মূল কারণে উনিশ শতকে ভারতের কৃষিপণ্যের বাজার প্রসারিত হচ্ছিল বোঝা গেল। মোদ্দা কথা ভারত পুঁজিবাদী অর্থনীতির পৃথিবীব্যাপী যন্ত্রের একটা অংশে পরিণত হচ্ছিল, কৃষক তার ফল ভোগ করতে শুরু করল। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে কেমন করে রঞ্জক নীল ও আফিমের চাষে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বিনয় চৌধুরী তার চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে আমাদের আলোচ্য পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৮৫০-এর পর, প্রথম বাজারের ধাক্কা এল তুলোর চাষের ওপর। পৃথিবীব্যাপী যে যন্ত্রের কথা বলেছি তার একটা চমৎকার উদাহরণ এই ঘটনা। আব্রাহাম লিংকন্‌, যাঁর নাম কোন ভারতীয় চাষী কিংবা দু-একজন বাদে কোন ম্যানচেস্টরের কারখানা শ্রমিক কেউ জানতো না, তিনি স্থির করলেন যে কালো আমেরিকান দাসদের মুক্তি দিতে হবে, আর তৎক্ষণাৎ সেই নিগ্রো দাসের ভাগ্যের সঙ্গে ঐ ইংরেজ শ্রমিক আর ভারতের চাষীর ভাগ্য জড়িয়ে গেল। ম্যানচেস্টরের কাঁচা মাল, তুলো আসত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে সাহেব মালিকদের অধীন নিগ্রো দাসদের দিয়ে আবাদ করা বাগিচা থেকে। ১৮৬০ সালে লিংকনের নীতির বিরুদ্ধে ঐ স্বার্থের খাতিরে দক্ষিণের প্রদেশগুলি গৃহযুদ্ধ শুরু করে। ফলে তুলো আবাদ ব্যাহত, বন্দরগুলি অবরুদ্ধ। ফলে ইংলণ্ডে তুলো আমদানি প্রায় বন্ধ, ম্যানচেস্টরের কারখানায় কাঁচামালের অভাব। ফলে ইংরেজ কারখানা মালিকেরা, বিশেষ ম্যানচেস্টর বণিক সমিতি চাপ দিল লণ্ডনে পার্লামেণ্টে এবং ভারত সচিবের ওপর—ভারত থেকে কাঁচা তুলো আনাও। সরকারি চেষ্টা ছাড়াও, স্বাভাবিক ভাবেই কাঁচা তুলোর আমদানি কমায় ইংলণ্ডে তার বাজার দর বাড়লো এবং তার ফলে ভারত থেকে তুলো রপ্তানিতে

লাভ বাড়লো। লাভ বাড়ার ফলে বোম্বাই কিংবা করাচির অনেক আমদানি-রপ্তানির সওদাগর কোম্পানি দালাল লাগালো তুলো সংগ্রহ করতে। বড় শহরের দালাল থেকে, মফঃস্বল শহরের শেঠ আর আড়তিয়া থেকে, গ্রামে গ্রামে মহাজন আর পাইকারদের কাছে খবর গেল। দাম যত বেশী চড়ে চাষীরা আর সব ফসল ছেড়ে তুলো আবাদ শুরু করে। দু-এক বৎসর সত্যই চাষীদের হাতে আশাতীত কাঁচা টাকা আসছিল। ১৮৬১-৬৩ সালে তুলোর আবাদ বর্তমান মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে খুব বাড়ল, ম্যানচেস্টরে রপ্তানি হল। ১৮৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধে লিংকনের জয়লাভের ফলে আমেরিকার তুলো রপ্তানি ফের শুরু হল। ভারত এবং অন্যান্য কিছু দেশের মালের ওপর আবার আমেরিকার মাল এসে পড়ায় তুলোর বাজার দর চট করে নেমে গেল। ভারতের কিছু ব্যবসায়ী সর্বস্বান্ত হ'ল, চাষীর অবস্থা যথাপূর্বং। তুলোর আবাদ যে শুরু হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে আশাতীত দামের লোভে, সেটা তুলোর বাজার সাধারণ অবস্থায় ফেরার পর স্থিতিলাভ করল। প্রসঙ্গতঃ, তুলোর বাজার যখন গরম ছিল তখন রপ্তানি ব্যবসায়ে যে লাভ কিছু দিশি বেনের হাতে এসে পড়ে সেটা সম্ভবতঃ বোম্বাইতে দিশি সুতি কারখানা গড়তে প্রাথমিক পুঁজির জোগান দিয়েছিল।

১৮৬০-১৮৬৪ সালের তুলোর আবাদের প্রসার, আমেরিকা থেকে, ইংলণ্ড থেকে ভারত অবধি কেনাবেচার ঘূর্ণি কিভাবে ভারতে কৃষককে টেনে নিল তার একটা উদাহরণ। এতটা নাটকীয় ঘটনা সংঘাত সর্বত্র না থাকলেও কৃষির বাণিজ্যীকরণ ব্যাপারটায় অন্য ক্ষেত্রেও একই কার্য-কারণের খেলা। ১৮৬০-১৮৯০ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে তুলো, বাংলায় (বিশেষ করে পদ্মার ওপারে বর্তমান বাংলাদেশে) পাট, যুক্ত প্রদেশে অর্থাৎ বর্তমান উত্তর প্রদেশে চিনির জন্য আখ, মাদ্রাজে চিনা বাদাম (তামিল ও তেলেগু অঞ্চলে 'চিন্না' বলতে বোঝায় 'ছোট'), বিস্তার লাভ করে। এ ধরনের ফসলকে অনেক সময় নগদা ফসল (cash crop) বলা হয়, কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে এগুলি বাজারের জন্যই মূলতঃ আবাদ হয় এই জন্য। মানে কিন্তু এই নয় যে বাজার এই নগদা ফসলেই সীমাবদ্ধ। এই প্রক্রিয়াতে খাদ্যশস্য আবাদও স্বয়ম্ভরতার আওতা থেকে বেরিয়ে আসে। কেন? কেননা নগদা ফসলের কান টানলেই খাদ্যশস্যের মাথাও বাজারের দরজায় ঠোকা মারে—নগদা ফসলে আঞ্চলিক বিশিষ্টিকরণের পরিণাম খাদ্যশস্যের জন্য বাজারের দ্বারস্থ হওয়া, আর খাদ্যশস্যে বিশিষ্টিকরণ মানে তেল গুড় তামাকের জন্য বাজারের উপর নির্ভরতা। এমনও হয়েছে, যেমন অধ্যাপক সৌগতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, যে বাংলাদেশের বিশ শতকের গোড়ায় কতক জেলা উঁচুদরের ধান বাজারের জন্য আবাদ করে, খাওয়ার জন্য সস্তাদরে বর্মী চাল আমদানি করত।

তবু নগদা ফসল বাজারের ফসলের শীর্ষভাগে। এবং যেহেতু সর্বভারতীয় কোন হিসেব পাওয়া যায় না খাদ্যশস্যের কত পরিমাণ বাজারজাত হচ্ছে, নগদা ফসল-এর হিসেব থেকে অনুমান করা চলতে পারে কমপক্ষে কতটা বাজারের জন্য চাষ আবাদ হচ্ছে। সরকারি হিসেবে মোটামুটি দেখা যায় যে ব্রিটিশ ভারতে

(বর্মা প্রদেশ সহ) ১৯০১-১৯৩৭ সালে খাদ্যশস্যের (অর্থাৎ ধান, গম, জওয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ডাল ইত্যাদি) আবাদ করা জমির এলাকা বেড়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ, যেখানে নগদা ফসলের আবাদী এলাকা বেড়েছে অনেক বেশী হারে—ইক্ষু বা আখে ৬৯ শতাংশ, তুলা ৫৯ শতাংশ, তৈল বীজ ৩৬ শতাংশ। একমাত্র পাট চাষের আবাদী জমি বেশী বাড়েনি, মাত্র ১৪ শতাংশ, কারণ পাট কেবলমাত্র বাংলাদেশের জেলার উপযুক্ত ফসল। অধ্যাপক জর্জ ব্লিন-এর গবেষণা পুস্তকের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে হিসেব করে বার করা যাক ১৮৯১-১৯৪৬ সালে ভারতের (বর্মা বাদ দিয়ে) কৃষির গতি প্রকৃতি।

সারণি ৪·১

কৃষি : বৃটিশ ভারতে গড় বাৎসরিক বৃদ্ধির হার, ১৮৯১-১৯৪৬, শতাংশের হিসেবে (%) ; বিয়োগচিহ্ন মানে হ্রাস

জন সংখ্যা	০·৬৭
(সমস্ত ফসলের) আবাদী জমির এলাকা	০·৪০
(সমস্ত ফসলের) উৎপাদন	০·৩৭
খাদ্যশস্যের উৎপাদন	০·১১
নগদা ফসলের উৎপাদন	১·৩১
খাদ্যশস্যের একরপ্রতি উৎপাদন	–০·১৮
নগদা ফসলের একরপ্রতি উৎপাদন	০·৮৬

(আকর : জর্জ ব্লিন, 'এগ্রিকালচারাল ট্রেণ্ডস্ ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৮৯১-১৯৪৬')

এই সারণিতে লক্ষ করার বিষয় যে নগদা ফসলের (ইক্ষু, তৈলবীজ, তামাক, তুলা, পাট) মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রতি দশকে তের শতাংশ মতন, যেখানে মোট খাদ্যশস্যে বৃদ্ধির হার দশকে মাত্র এক শতাংশ বাড়ল। আরও মনে হয় যে অপেক্ষাকৃত ভাল জমি, ভাল সার, বেশী সেচের জল, অর্থাৎ অধিক বিনিয়োগ বোধহয় নগদা শস্যেই হচ্ছে, কেননা একর প্রতি উৎপাদনের হার দশকে সাড়ে-আট শতাংশের বেশী ; খাদ্যশস্যে এই গড় দশকে দুই শতাংশের কম।

২

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কৃষিপণ্যের বাজার বাড়লো এবং বাজারের মুখাপেক্ষী হয়ে আবাদ বাড়তে লাগলো তার ফলে কি ধরনের পরিবর্তন গ্রামীণ অর্থনীতিতে শুরু হল ? মহারাষ্ট্র সম্পর্কে অধ্যাপক ধনঞ্জয় রামচন্দ্র গাড্‌গিল, রবীন্দ্রকুমার, নীল চার্লসওয়ার্থের তথ্যপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় তাই আমরা মহারাষ্ট্রে তুলোর বাজার ১৮৬০ থেকে কিভাবে কৃষি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করল, একটা উদাহরণ হিসেবে গভীর ভাবে দেখতে পারি। বাজরা কিংবা গমের পরিবর্তে তুলোর চাষ করলে বাজারের সঙ্গে কৃষি অর্থনীতি সম্পৃক্ত হয়ে উঠবে সেটা জানা কথা,

বিশেষ করে যদি সেটা দু-একজন কৃষকের তুলো আবাদ না হয়ে ব্যাপকভাবে আঞ্চলিক বিশিষ্টিকরণ হয়ে দাঁড়ায়। এর মানে কি ? (১) বাজারে, বিশেষ করে বোম্বাই বা ম্যানচেস্টরের বাজারে, যে তুলোর চাহিদা সেটা সাবেক কালে যে দিশি তুলো আবাদ হ'ত তার থেকে আলাদা। সাবেকি দিশি তুলো যা ছিল, তার কার্পাস আঁশ আকারে ছোট, বাজারে যে তুলোর চাহিদা সেটা মিশরীয় কিংবা ক্যালিফর্নিয়া তুলোর মতন লম্বা আঁশের (long stapled)। ম্যানচেস্টরের ও আধুনিক সূতী কলে এই লম্বা আঁশের তুলো ছাড়া অসুবিধা কেননা ছোট আঁশের তুলোর থেকে যন্ত্রে সুতো তৈরী করলে বার বার ছিঁড়ে যায়। সুতরাং লম্বা আঁশের কার্পাস আবাদ করতে দরকার বিলিতি তুলোর জাত কিংবা নতুন ধরনের দিশি-বিলিতি মেশানো দো-আঁশলা বীজ। সুতরাং টাকা বেশী ঢালতে হবে—তাছাড়া তুলোর আবাদে অন্য অনেক শস্য, যথা বাজরার তুলনায় সার ও সেচের জল বেশী লাগে, তাতেও টাকা চাই। এক কথায় বাজারের জন্য তুলো আবাদ করতে কিছু বেশী বিনিয়োগ করতে হয়, যার মানে কৃষককে অনেক সময় ধার করতে হত। ধার দেবার জন্য তৈরী রয়েছে গ্রামের বেনে বা মহাজন, এরা মহারাষ্ট্রে 'বনি' নামে পরিচিত। এরা নাগপুর কি বোম্বাই-এর দালালদের পক্ষ থেকে তুলো চালান দেবার ধান্দায় উৎসাহী। সুতরাং কৃষক আগাম টাকা পেল নতুন জাতের তুলো আবাদ করার জন্য। যদি বড় গোছের ঋণ হয় তবে দলিলে লেখা রইল আগামী ফসলের ওপর বেনের দাবী। (২) এই জাতীয় আবাদির জন্য ঋণ (production loan) ছাড়াও ঘরে ফসল ওঠা অবধি পেটে খাওয়ার জন্য (consumption loan) দরকার হলেফের সেই মহাজন। বাজারে মন্দার জন্য ফসলের দাম কম হলে, বৃষ্টি ঠিক সময় ঠিক পরিমাণে না হলে, কিংবা এইরকম অন্য কোন কারণে যদি কৃষকের আয় কোন বৎসর কম হয় সে খাবে কি ? বাজরা যখন আবাদ করত তাই খেতে পারতো, এখন তুলো ফলায় তাই ধার। এই জাতীয় ধারের সুদ সাধারণতঃ খুব উঁচু হারে ধরা হ'ত—১৮৭৬ সালে দাক্ষিণাত্যে কৃষক বিদ্রোহের পর এক অনুসন্ধানে জানা যায় যে 'দুনি' (২০০%), 'তিরপত' (৩০০%) জাতীয় অভাবনীয় হারে সুদ গোনা হত। বিশেষ অধমর্ণ চাষী যদি হয় স্বত্বহীন প্রজা। (৩) নতুন জাতের তুলোর চাহিদা ম্যানচেস্টারে (তিন চতুর্থাংশ ইঞ্চি লম্বা মাপের)—কিন্তু সে বাজারে মাল পৌঁছান চাষীর আয়ত্তের বাইরে। মহাজন এবং আরও অনেকগুলি তুলোর কারবারী মধ্যবর্তী না হলে চাষী তার পণ্য বাজারজাত করতে পারে না। সাবেক কালে যখন সে তুলো আবাদ করত, আশেপাশে সুতো কাটুনি আর তাঁতীর দল কিনে নিত ; কিন্তু তারা এই নতুন লম্বা আঁশওয়ালা তুলো বেশী দাম দিয়ে কিনতে যাবে কেন ? সুতরাং বাজারের জন্য তুলোর চাষ মানে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে চাষীর টিকি বাঁধা রাখা। (৪) প্রসঙ্গতঃ, আরেকটা ব্যাপার হল যে সাধারণ ভাবে অবশিল্পায়নের (de-industrialisation) ফলে এবং বিশেষ ভাবে ১৮৬০-৬৪ সালে তুলোর দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় তাঁর শিল্পের অবস্থা খারাপ হল। কাঁচা তুলোর রপ্তানি হয়ে তাঁতীর কাঁচামালে টান পড়লো, যেটুকু মেলে

সেটা তার পক্ষে অগ্নিমূল্য। তাঁত যদি বন্ধ হয়, ম্যানচেস্টরের আমদানি-ই ভরসা। সেই কাপড় গ্রামে পৌঁছায় কে ? সেই বেনে বা তার জাতভাই কেউ। চাষী তাই কেনে। (৫) তুলোর দাম বেশী হল বিদেশে বাজার বাড়াতে, বিশেষ বাজার যখন তেজী, যেমন ১৮৬০-৬৪। কিন্তু সে দামের কতটা পায় চাষী ? ম্যানচেস্টরে তুলোর দর কত সেই খবর বোম্বাইতে পৌঁছায়, সেখান থেকে নাগপুরের মত ছোট শহরের বাজারে, সেখান থেকে মফঃস্বল শহরে শহরে, তারপর গ্রামে। চাষীর কাছে বাজারের খবর (market information) সহজ লভ্য নয়—বিশেষ প্রথম পর্যায়ে যখন বাজারের জন্য উৎপাদন শুরু হ'ল। তাছাড়া কেবল সম্পন্ন চাষী পারতো বলদ গাড়ি করে তুলো শহরের বাজারে বিক্রীর জন্য নিয়ে যেতে, বেশীর ভাগ তুলো বিকিয়ে যেত গ্রামেই একচেটিয়া ক্রেতা গ্রামের বেনের কাছে। এমনি শহরেও বিভিন্ন দালাল আড়তিয়ার মধ্যে ষড় থাকার ফলে ঠিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে তুলো কেনার দাম নির্ধারিত হত না। এক কথায় বাজারজাত করার যন্ত্রটাই এমন তৈরী হল যে চাষী ধরতে পারতো না উচিত দাম সে পেলো কি না। (৬) কৃষি দ্রব্যের যদি দাম বাড়ে তবে বোম্বাইয়ের মত রায়তওয়ারি এলাকায় রাজস্বের ঊর্ধ্বগতি অবধারিত। প্রকৃতপক্ষে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেকগুলি জেলায় ১৮৬০-৬৪ সালের তেজী তুলোর বাজার থাকাকালীন রাজস্ব বন্দোবস্ত হওয়ায় খুব উঁচু হারে খাজনা ধার্য হয়। এক কালে কৃষকের লাভের কিছুটা সরকারের হাতে যেত। কিন্তু সেটা খুব বড় অংশ নয়। আসল বড় অংশ গেল বেনে মহাজনের হাতে। (৭) নতুন তুলোর আবাদের আর একটা ফল এই যে তুলো পরিষ্কার করার (ginning) বিলিতি বা তার অনুকরণে দেশে তৈরী যন্ত্র দরকার হ'ল। এই যন্ত্র আমেরিকার হুইট্‌নি জিন (Whitney gin) যন্ত্রের একটা দিশি সংস্করণ। সাবেক কালে চাষীর বৌ বা তাঁতী বৌ খুব সামান্য একটা চরকা বা হাতগুড্ডি নামক যন্ত্রে বীজ থেকে তুলোর আঁশ ছাড়িয়ে পরিষ্কার করতো। কিন্তু লম্বা আঁশওয়ালা নতুন জাতের তুলোর বীজ আর আঁশ অপেক্ষাকৃত আঁট হওয়ার ফলে দিশি পদ্ধতিতে ছাড়ান যেত না। তার মানে তুলো নিষ্কাশন যন্ত্রের কারখানায় নিয়ে গিয়ে নতুন জাতের তুলো পরিষ্কার করতে হ'ত। কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজির অনুপ্রবেশের এটাও একটা পথ। চাষী নিজের বলদ গাড়িতে তুলো নিয়ে যেতে পারে জিন্ যন্ত্রের মালিকের কাছে তুলো পরিষ্কার করতে ; এটা সম্ভব সচ্ছল চাষীর পক্ষে। অথবা চাষী অপরিষ্কৃত তুলো কম দামে গ্রামের মহাজন কিংবা ভ্রাম্যমান পাইকারদের হাতে তুলে দিতে পারে ; এটা গরীব চাষী করতে বাধ্য। (৮) গরীব আর সচ্ছল চাষীর মধ্যে এই পার্থক্য ছাড়াও, অন্যান্য অনেক ব্যাপারে কৃষির বাণিজ্যীকরণ এদের মধ্যে বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে। দাক্ষিণাত্যে ১৮৮০-র দশক থেকে 'বনি' বা মারোয়াড়ি মহাজনদের জায়গায় সম্পন্ন চাষী এবং মারাঠা আমল থেকে প্রতিপত্তিশালী দেশমুখ পাতিল মিরাসদার জাতীয় গ্রামীণ উচ্চবর্গের লোকেদের দেখা যায়। পরের এক পরিচ্ছেদে এ নিয়ে আলোচনা হবে।

এই উদাহরণ থেকে দেখা যায় কৃষি বাজার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেনে আর

মহাজনি পুঁজির অনুপ্রবেশ কি ধরনের পরিবর্তন আনে। এই যে 'বনি' বা বেনে, তারাই আগাম দেয় তুলো চাষ করতে, তারাই একমাত্র মধ্যবর্তী তুলো বাজারজাত করতে, তারাই বাজরা কিংবা গম কিংবা টাকা ধার দেয় চাষীর পেট চালাবার জন্য, তারাই ম্যানচেস্টরের কাপড় গ্রামে বিক্রী করে দিশি তাঁত বন্ধ হলে, তারাই বাজারের দাম আয়ত্তে রাখে, তারাই টাকা এগিয়ে দেয় সরকারের খাজনা দিতে চাষী অপারগ হলে। এই শ্রেণী ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্তম্ভস্বরূপ বলা চলে।

এই উদাহরণ থেকে এটাও প্রতীয়মান যে ঔপনিবেশিক কৃষিপণ্যের বাণিজ্যের প্রক্রিয়ায় কৃষকের পরাধীনতা নানা ভাবে বাড়ে: উৎপাদনের বিনিয়োগের জন্য আগাম, খাজনার জন্য বা খাওয়ার জন্য কর্জ, পণ্য বিক্রয় করার জন্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর নির্ভরতা ইত্যাদি। পরে দেখব যে এই অধীনতা ছোট গরীব কৃষকদের সম্বন্ধে অনেক বেশী সত্য; বর্ধিষ্ণু ও গরীব কৃষকদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে ওপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় এবং অনেক জায়গায় বর্ধিষ্ণু চাষী মহাজনের ভূমিকায় নেমে পড়ে। অনেকের মতে কৃষকদের নীচের স্তরে কৃষি বাণিজ্যের প্রসার জবরদস্তির নামান্তর (forced commercialisation), স্বেচ্ছা প্রণোদিত ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়।

সবশেষে বলা দরকার যে কৃষিজ দ্রব্য বিপণনের (marketing) ব্যবস্থা সর্বত্র এক নয়, কিন্তু অনুরূপ। তুলোর ব্যবসায় চাষীর উৎপন্নের ক্রেতা গ্রামে বেনে মহাজন বা ভ্রাম্যমান পাইকার, তার উপর আড়তিয়া এবং তুলো পরিষ্কার কারখানা (ginnery) মালিক, তার উপর পাইকারি হারে কেনাবেচার বড় দালাল নাগপুর জাতীয় বড় শহরে, এবং তার ওপর বোম্বাইতে রপ্তানি কোম্পানি কিংবা কারখানা মালিকের দালাল। পাটের ব্যবসায় সবচেয়ে নীচে ফড়ে জাতীয় খুচরা ক্রেতা, তার উপর বড় ব্যাপারী এবং আড়তদার, তার উপর পাটের গাঁইটের (baler) কারবারী, তার ওপর কলকাতা পাটকল কিংবা রপ্তানি কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্ট। এই সব মধ্যবর্তী ব্যবসাদার একটা লভ্যাংশ অবশ্যই কেটে নিত পণ্যের ন্যায্য দাম থেকে। ইক্ষু বা আখ বিক্রীর ব্যাপারটা আরও সহজ ছিল, আখ অনেক হাত বদল হলে কিংবা গুদামে রাখলে শুকিয়ে যাবে, রস এবং চিনি নষ্ট হবে—তাই সে ক্ষেত্রে দালাল কম, অথবা সরাসরি চিনি কারখানা দ্বারা ক্রয় হত। গম কিংবা চালের ব্যবসাতেও কয়েক স্তরে দালাল ছিল। লক্ষ্ণীয় যে যেসব জায়গায় পরিবহণ ও রাস্তা উন্নত হয়েছিল এবং সাধারণ কৃষকের অবস্থা ভাল সেখানে বিপণনে মধ্যবর্তী কম সংখ্যায়; এই সম্বন্ধে ১৯২৩ সালের পাঞ্জাবের প্রতিবেদনে জানা যায় যে অনগ্রসর করনাল জেলার গম প্রায় সবটাই গ্রামেই পাইকারের হাতে বিক্রী হত, আর একটু অগ্রসর রোটক জেলার ৫০%; অপর পক্ষে সমৃদ্ধ লায়ালপুর জেলায় প্রায় সমস্ত গম পাইকারদের পাশ কাটিয়ে 'মণ্ডী' বা বড় বাজারে বিক্রী হত। আরেকটা উপায়ে মহাজন আর দালালদের পাশ কাটিয়ে বিপণন হতে পারত, উৎপাদকদের কো-অপারেটিভ দ্বারা; কিন্তু এগুলি এত কম সংখ্যক ও দুর্বল, এবং বর্ধিষ্ণু

চাষীদের করতলগত ছিল বলে এদের প্রভাব নগণ্য।

কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্য বিকাশ একটা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটা সাবেকী অর্থনৈতিক ধারণা আছে যা অধ্যাপিকা ভেরা এনষ্টি থেকে আজকেরও অনেক সমাজ ও অর্থতত্ত্ববিদ্ সমর্থন করেন—যে সাধারণ ভারতীয়, বিশেষভাবে অনুন্নত অশিক্ষিত কৃষক পুরোনো এমন সব মূল্যবোধের (value system) মধ্যে আবদ্ধ যে তারা অর্থনীতির যুক্তি মেনে কাজ করে না, যে তাদের মন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রতি প্রতিক্রিয়াবিহীন, যে তারা গতানুগতিকতার দাস। কৃষিতে উনিশ শতকে, বিশেষ ভাবে শেষ ভাগে, যে বাণিজ্য বিপ্লব হল তা এই অনুমান সম্পূর্ণ রূপে অপ্রমাণ করে। অধ্যাপক ধর্ম নারায়ণ সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবে দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন ফসলের দামের ওঠা নামার সঙ্গে-সঙ্গে আবাদী জমির ব্যবহারের (land utilisation) ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে: অর্থাৎ, কোন ফসলের বাজার দর বাড়লে পরে বেশী চাষী সেদিকে ঝুঁকেছে, এবং বিপরীত অবস্থায় সেই ফসলের আবাদ কমেছে। এই ধরনের মূল্য অবধানতা (price responsiveness) প্রমাণ করে যে কৃষি গতানুগতিক রাস্তায় গড়ায়নি, বাজারের গতি দ্বারা চালিত হয়েছে। অবশ্য এ জন্য কতটা দায়ী বেনে মহাজন পাইকার দালাল ইত্যাদি এবং কতটা এটা কৃষকদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। মোটামুটি বলা চলে যে মূল্য অবধানতা অন্ততঃ বিশ শতকে কৃষির গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে। অর্থাৎ আধুনিক কালে বাজারের গণেশই কৃষিলক্ষ্মীকে পথ দেখিয়েছে।

৩

উনিশ শতক থেকে গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণী—ভূমিহীন শ্রমিক বা মজুর থেকে শুরু করে ভূস্বামী খাজনা আদায়কারী বা জমিদার শ্রেণী পর্যন্ত—কিভাবে উদ্ভূত হল, কিভাবে তাদের সম্বন্ধ গড়ে উঠল, এটা এখনও এতই বিতর্কিত যে সংক্ষেপে আমাদের এই পরিচ্ছেদের ছোট চৌহদ্দিতে আয়ত্তে আনা শক্ত ব্যাপার। যেমন ধরা যাক, কৃষিমজুর শ্রেণী—সুরেন্দ্র পটেল এবং তার আগে রজনী পাম দত্ত ইত্যাদি লেখকেরা এই শ্রেণী ঔপনিবেশিকতার ফল হিসেবে দেখেন, অপর দিকে ধর্মা কুমার ইত্যাদির মতে উপনিবেশীকরণের সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই কেননা প্রাক্-ঔপনিবেশিক কাল থেকে এই শ্রেণী ছিল এবং সংখ্যায় বাড়েনি। কিংবা ধরা যাক্ আরেকটা মূল প্রশ্ন: কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এল কিনা, কবে এল, ইত্যাকার প্রশ্নগুলির উত্তরে ডেনিয়েল থর্নার, অশোক রুদ্র, উৎসা পট্টনায়ক ইত্যাদি বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিতর্ক তুলেছেন সেটা ঐতিহাসিকদেরও বিতর্কে নামিয়েছে। অনুরূপভাবে জোতদার শ্রেণীর উৎপত্তি ও চরিত্র, প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তন, রায়তওয়ারি ও মহালওয়ারি অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-বিভেদীকরণের (differentiation) প্রসার, ইত্যাদি অনেক বিষয়ে মৌলিক মতপার্থক্য দেখা

যায়। সবচেয়ে বড় কথা, এই বিষয়ে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক আঞ্চলিক ইতিহাসের পথে গবেষণা করেছেন বলে, এবং স্বভাবতঃই গ্রামীণ সমাজের আঞ্চলিক বিভিন্নতা অত্যন্ত প্রকট বলে, ঐ ঐতিহাসিকদের সাবধানবাণী মনে রাখা প্রয়োজন—সারা দেশের সম্বন্ধে সামান্যীকরণ (generalisation) এই ক্ষেত্রে খুব কম প্রশ্নেই সম্ভব। আমাদের আলোচনা এই সব সীমার বাইরে যেতে পারে না, বড়জোর একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরি করা যায়।

স্বাধীনতার আগে শেষ নির্ভরযোগ্য জনগণনা হয়েছিল ১৯৩১ সালে (১৯৪১ সালে যুদ্ধের জন্য দায়সারা কাজ হয়)—তার ভিত্তিতে সুরেন্দ্র পটেলের কৃত বিশ্লেষণ থেকে ঔপনিবেশিক আমলের শেষ দিকে গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাস কেমন ছিল সে সম্পর্কে আন্দাজ পাওয়া যায়।

পিরামিডের সবচেয়ে নিচের তলায় আছে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক, সংখ্যায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ ; এরা কৃষিতে নিয়োজিত জনসংখ্যার ৩৭.৮ শতাংশ। এর মধ্যে আবার অন্ততঃ ৩০ লক্ষ মানুষ খৎবন্দী শ্রমিক বা ঋণদাস (bonded labourer)। তার ওপরে আছে "অতি ক্ষুদ্রচাষী"—পটেল ৫ একরের কম জমিতে মালিকানা কিংবা স্বত্বহীন রায়ত কিংবা ভাগচাষের ভিত্তিতে নিয়োজিত চাষীদের এই শ্রেণীতে রেখেছেন : ভারতে বেশিরভাগ জায়গাতেই পাঁচ একরের নিচে জমির আবাদ থেকে সারা বছরের অন্ন সংস্থান হয় না, শ্রম বিক্রয় অপরিহার্য হয়, তাই এই শ্রেণী কৃষিশ্রমিকদের কাছাকাছি। এই জাতীয় অতিক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি (৯ শতাংশ), স্বত্বহীন রায়ত ও ভাগচাষীর সংখ্যা ২ কোটি ৭০ লক্ষ (২৪.৩ শতাংশ)। তার ওপরের স্তরে ৫ একরের বেশি জমির মালিক অথবা স্বত্বসম্পন্ন রায়ত : মোট সংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ (অর্থাৎ কৃষিতে নিয়োজিত জনসংখ্যার ২৫.৩ শতাংশ)। বাকি রইল পিরামিডের শীর্ষে যারা বসে, "খাজনা-ভোগী শ্রেণী"—এই নামকরণের কারণ এরা সকলেই আইনতঃ জমিদার তালুকদার নয়, কিন্তু জমিদারদের মতই এদের অনেকে জমির মালিকানার দরুন খাজনা পায়—ছোটবড় মিলিয়ে এরা ৩.৬ শতাংশ।

সবচেয়ে নিচের তলার বাসিন্দাদের মধ্যে ঋণদাসদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। ঋণদাস মানে টাকা ধার করে শোধ না করতে পারার ফলে শ্রমের দ্বারা পরিশোধের চেষ্টায়, অথবা টাকা ধার পেতে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার বদলে নিজেদের বন্ধক দিয়ে, যারা দাসখৎ গোছের সই করেছে। একটা পুরনো আঠেরো শতকীয় বাংলা শব্দ বোধহয় আরও উপযোগী, খৎবন্দী শ্রমিক (bonded labour)। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে কামিয়া, তামিলনাড়ুতে পান্নিয়াল, গুজরাটে হালি, ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলির অনেকে এই অবস্থায় নেমেছিল। অনেক সময়েই এইসব ঋণদাস সেসব উপজাতীয় যারা নিজেদের জমি আগন্তুক হিন্দু চাষী বা উচ্চবর্ণ হিন্দুদের কাছে হারিয়েছিল, যথা গুজরাটের ভীল উপজাতি। তবে তথাকথিত তপশিলী জাতিভুক্তমানুষই বোধহয় ছিল সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় এই শ্রেণীতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে। বহুবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার শিকার এই খৎবন্দী শ্রমিকদের মুক্তির

চেষ্টা হয়েছে, এই গত দশক পর্যন্ত। এই প্রচেষ্টার শুরু জাতীয়তাবাদী নেতাদের ও কিছু ইংরেজ আমলাদের সহানুভূতি নিয়ে, ১৯২০ সালে যখন বিহার ও উড়িষ্যা কামিয়তি আইন পাশ হয়। এই আইন পাশ হওয়ার সময়ে সরকারি অনুসন্ধান থেকে খৎবন্দী শ্রমিকদের অবস্থা কিছুটা জানা যায় : ঋণদাতা শ্রমিকদের সমস্ত শ্রমের মালিক ছিল ; খাওয়া-পরা ছাড়া সাধারণতঃ কোন বেতন শ্রমিকদের দেওয়া হত না ; হাতে টাকা না পাওয়ায় শ্রমিকের পক্ষে ঋণ শোধ করা প্রায় অসম্ভব ছিল ; আইনতঃ প্রসিদ্ধ হলেও প্রথা অনুসারে ঋণদাসত্ব পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারী মেনে নিত ; ঋণদাতা প্রায় মালিকের মত দাসখৎ অথবা খৎবন্দী শ্রমিককে হস্তান্তর করতে পারত অন্য মালিকের হাতে। ১৯২০ সালের আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় যে এক বছরের বেশি স্থায়ী খৎ বা বণ্ড আদালত অগ্রাহ্য করবে এবং খৎবন্দী শ্রমিককে 'ন্যায্য পাওনা' দিতে হবে। এই আইন প্রকৃত অবস্থায় কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি : সময়সীমার আইন সহজেই পাশকাটানো যায় যদি প্রতি বৎসর নতুন খৎ সই করিয়ে নেওয়া হয়, আর 'ন্যায্য পাওনা' খুবই স্থিতিস্থাপক একটা মাপকাঠি। সবচেয়ে বড় কথা 'ন্যায্য পাওনা' বেতন কতটা সেটা প্রমাণ করতে হবে আদালতে, আর সেটা করার আর্থিক সামর্থ্য খৎবন্দী শ্রমিকদের কোথায় ? কাজেই আইন বিশেষ কোন কাজে আসেনি। আর সামাজিক ও জাতপাতের বিচারে নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী যারা তাদের বন্দীদশা কেবল আর্থিক কারণে নয়, গ্রাম সমাজে তথাকথিত উচ্চজাতিদের নানাবিধ ক্ষমতার দরুণও। ঔপনিবেশিক আমলে যে সমস্যার সমাধান হয়নি তা পরে নানা রাজনৈতিক সমস্যারও সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের সময়ে জাতপাতের রাজনীতিকে জোরদার করেছে।

খৎবন্দী শ্রমিকেরা ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের একটা অংশ। মোট ভূমিহীন শ্রমিকদের সংখ্যা যে কত তা বিতর্কের বিষয়। জনগণনার হিসেব অনুসারে ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার ২১ শতাংশ (জনগণনা ১৯০১), ২৪.৮ শতাংশ (১৯১১) ; তারপরের জনগণনার হিসেবে ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা কৃষিতে নিয়োজিত জনসংখ্যার ২০.৬ শতাংশ। (১৯২১) এবং ৩১.৩ শতাংশ (১৯৩১)। সংখ্যাতত্ত্ববিদ সত্যব্রত সেনের বিশ্লেষণ অনুসারে এই ওঠানামা বিভিন্ন জনগণনার বিভিন্ন পদ্ধতির জন্য, ১৯০১-১১ এবং ১৯২১-৩১ জনগণনার মধ্যে তুলনা করা শক্ত, কিন্তু মোটামুটি ১৯৩১ অবধি অর্ধশতকে ভূমিহীন শ্রমিকদের সংখ্যা বেশ বেড়েছে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুরেন্দ্র পটেল এ বিষয়ে একমত। তবে ভূমিহীন শ্রমিক আর ভাগচাষী আর স্বত্ববিহীন রায়ত (tenant at will) ইত্যাদি বর্গগুলি জনগণনাকারী আমলারা অনেক সময়ে মিশিয়ে ফেলার ফলে যে গণনাবিভ্রাট হয় পটেল তা দেখিয়েছেন এবং নিজে পুনর্গণনা করেছেন—তার ফলাফল আগেই বলা হয়েছে। তার মতে ভূমিহীন শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি কৃষির বাণিজ্যীকরণের মাধ্যমে মহাজনি কারবার ও কৃষকের ঋণভার বৃদ্ধির ফল ; এক কথায় *ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সঙ্গে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের বৃদ্ধির কার্যকারণ সম্বন্ধ*

আছে, যার একটা প্রমাণ উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশকের পূর্বে ভূমিহীন শ্রমিকদের অস্তিত্ব প্রায় চোখে পড়ে না। এই মতের সঙ্গে গুরুতর অমিল আছে অধ্যাপক ধর্মা কুমারের : তাঁর মতে ভূমিহীন শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি যেটুকু ঘটেছিল সেটাকে রজনী পাম দত্তের আমল থেকে মার্কসীয় লেখকেরা অতিরঞ্জিত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে ভূমিহীন শ্রমিকদের অস্তিত্বের যথেষ্টই প্রমাণ আছে প্রাক-উপনিবেশিক ভারতে, অন্ততঃ তাঁর গবেষণার এলাকা দক্ষিণ ভারতে ছিল। সম্ভবতঃ মতভেদের পেছনে আছে ধারণার বা সংজ্ঞার গরমিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজদের দলিলদস্তাবেজ ভূমিহীন দাস শ্রেণীর শ্রমিকের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দক্ষিণ ভারতের অনেক অংশে। তবে এটা এক ধরনের ভূমিদাসত্ব যেটা জাতিপ্রথা ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রভুত্বের দরুণ গড়ে উঠেছিল : ধর্মা কুমার এই জাতীয় ভূমিহীনত্বের কথাই মূলতঃ বলেছেন। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক কারণে চাষী নিজ জমি হারিয়ে স্বত্বহীন প্রজা, অথবা আরও নিচে ভাগচাষী বা শ্রমজীবী হয়ে পড়ার যে প্রক্রিয়া পটেল ইত্যাদি বলেছেন সেটা আরেক জাতের ভূমিহীনত্ব। এই দ্বিতীয় ধরনের ভূমিহীনত্ব যে ঔপনিবেশিক আমলে বাড়ছে, এবং এর সঙ্গে কৃষির বাণিজ্যীকরণের যে প্রক্রিয়া আগে বলা হয়েছে তার সঙ্গে বাড়ছে এতে সন্দেহ করার মতন প্রমাণ এখনও উপস্থাপিত হয়নি।

১৯৫১, সালে কৃষি শ্রম অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ কৃষিশ্রমিক। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক পরিবারের কিছু না কিছু জমি ছিল, অর্ধেকের কোন জমিই ছিল না। কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য সামান্য কারণ সম্পূর্ণ ভূমিহীন নয় যারা তারাও মূলতঃ নির্ভর করত অপরের জমিতে মজুরির বেতনের ওপরে। বিশেষ লক্ষ করার বিষয় যে এই শতকের মাঝামাঝি মজুরের বেতন টাকাতেই বেশি দেওয়া হত, যদিও ফসলের অংশবিশেষ দেওয়াটাই আগে চালু ছিল।

পুঁজিবাদী কায়দায় আবাদ কত দূর এগিয়েছে এ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়ে গেছে। দু-তিন দশক আগে অনেক ঐতিহাসিক, যথা সুলেখ চন্দ্র গুপ্ত, কৃষি বাণিজ্যের প্রসার বা কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং পুঁজিবাদী ধারায় কৃষিকর্ম প্রায় সমার্থক দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। এটা সম্ভবতঃ অতিসরলীকরণ হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে ডেনিয়েল থর্নার প্রশ্নটি যখন তুলেছিলেন পুঁজিবাদী ধরনের কৃষির সংজ্ঞা তাঁর কাছে ছিল এই : বেতন দিয়ে মজুর খাটানো, বাজারজাত করে লাভের দিকে চোখ রেখে কৃষিপণ্য উৎপাদন, বিক্রয়লব্ধ লাভের টাকাকে পুঁজি হিসেবে চাষ-আবাদে নিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি। ১৯৭০ থেকে অধ্যাপক অশোক রুদ্র গবেষণা পত্রে আরও বিশদ সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন। এই সব সংজ্ঞার মধ্যে প্রধান জিনিসগুলি : কৃষক যদি নিজের আয়ত্তে জমি রাখে অপর কাউকে ইজারা না দিয়ে, যদি ভাড়াটে মজুরের শ্রম বেশি ব্যবহার করে নিজ *পরিবারের শ্রমের অনুপাতে, যদি আবাদের কাজে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ বৃদ্ধি পায়,* যদি উৎপন্নের বেশিরভাগ বাজারজাত হয়, উৎপাদনে বিনিয়োগ যদি বাজারে

লাভের হিসেব দ্বারা মূলতঃ চালিত হয় তবে পুঁজিবাদী ধারায় কৃষি চালু হচ্ছে ধরে নেওয়া যায়। এখন এই সব হিসেব সূক্ষ্ম ভাবে করা শক্ত, আর সংজ্ঞার বিভিন্ন উপাদান কোনটা কত ওজনের গুরুত্ব পাবে এই নিয়েও মতভেদ আছে। সুতরাং মতভেদ পুঁজিবাদী ধারায় কৃষি এসেছে কি আসেনি এই নিয়ে, অথবা আরও সূক্ষ্ম ভাবে, প্রবণতা যদি ঐদিকে হয় তবেই কি যথেষ্ট অথবা সংজ্ঞার সব শর্ত পরিপূরিত হওয়া প্রয়োজন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব তর্ক স্বাধীনতার পর, মূলতঃ ১৯৭০ এর দশকের পরের কাল নিয়ে। তার আগের শতক নিয়ে যে ঐতিহাসিকেরা ভেবেছেন তারা কৃষিব্যবস্থায় পুঁজিবাদী ধারা গড়ে ওঠার উপযোগী জমি কিভাবে তৈরি হচ্ছিল তার ওপরে জোর দিয়েছেন : ক্রমান্বয়ে বর্ধমান কৃষি উৎপন্ন বাজারজাত হওয়ার ফলে স্বয়ম্ভরতা থেকে বাজার-নির্ভর চাষ আবাদ, কৃষি উৎপাদনের গতি প্রকৃতির ওপর বাজার দরের প্রভাব, কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীবিভেদীকরণ (differentiation), গ্রামীণ অর্থনীতিতে টাকার লেনদেন বৃদ্ধি এবং টাকার উৎস মহাজনি কারবারিদের কাছে জমি হারানোর ফলে কৃষকদের ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক অবস্থায় অবনতি ইত্যাদি। এ দিকগুলি আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু এই প্রস্তুতি সত্ত্বেও কেন পুঁজি বিকাশ কৃষিব্যবস্থায় হ'ল না এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের উত্তর এখনও অস্পষ্ট। একটা তাত্ত্বিক প্রবণতা এই ধরনের : ঔপনিবেশিক অর্থনীতি আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রেখেছিল। ঔপনিবেশিক সরকার পুঁজিবাদী সম্পত্তি ব্যবস্থা আইন দ্বারা স্থাপিত করে কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থা তাই থেকে গজিয়ে ওঠে না। আরেক ধরনের দৃষ্টিকোণ এই যে গোলমাল কৃষির বাণিজ্যীকরণ যে প্রকারে হয়েছিল সেখানেই। কৃষিতে বিনিয়োগ কম বা প্রায় হয়নি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কেননা কৃষিপণ্যের বাজারের বৃদ্ধিজনিত লাভ কৃষকদের হাতে থাকেনি। কিছুটা গেছে ভূমিরাজস্ব রূপে সরকারের হাতে, কিছুটা জমির মালিকদের কাছে খাজনা হিসেবে, এবং বড় অংশ গেছে মহাজনি কারবারি আর বাজারের বেনেদের হাতে। সুতরাং কৃষির বাজার বাড়ছে, কিন্তু পুঁজি জমছে না, যে পুঁজি কৃষিতে বিনিয়োগ করে উৎপাদন বাড়বে, লাভ বাড়বে, পুঁজি বাড়বে। আর মূলতঃ যারা লাভবান হচ্ছে ঔপনিবেশিক আমলে কৃষির বাণিজ্যীকরণে, তারা কুসীদজীবী, জমিতে টাকা ঢালতে অনভ্যস্ত, এবং হয়ত বেশি লাভ পায় মহাজনি কারবারে আর সওদাগরিতে টাকা খাটিয়ে—কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ করার তুলনায়। আরও এক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে বলেন কৃষিব্যবস্থাতেই তার অনগ্রসরতার সমস্ত কারণ পাওয়া যাবে এমন নয়—দেখতে হবে ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি ও শিল্পের অনগ্রসরতার পারস্পরিকতা। কেন স্বত্বহীন প্রজা (tenant) কিংবা ভাগচাষী কিংবা ভূমিহীন কৃষিমজুর জমিমালিক দ্বারা শোষণের ফাঁদে আটকে থাকে? তার কারণ তারা শ্রমের বাজারে সস্তায় বিকোয় বলে, অর্থাৎ যারা প্রজা ভাগচাষী কিংবা মজুর কৃষিজ আয়ে তাদের অংশ নিতান্ত ছোট হলেও বাধ্য হয়ে সেটা মেনে নেয়, কেননা তারা যাবে কোথায়? যদি সম্যক শিল্পায়ন হত তবে ঐ শ্রেণীর মজুরেরা কৃষির বাইরে

অন্যত্র জায়গা পেতে পারত, কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে শিল্পের অনগ্রসরতার ফলে তারা জমির মালিকের হাতে বাঁধা বলির পশুর মতন।

এই সব মতগুলি পরস্পরবিরোধী নয়। সুতরাং কেন কৃষি অনগ্রসর অবস্থায় পড়ে রইল ও পুঁজিবাদী ধারায় আধুনিক কৃষি কেন বিলম্বিত হল তার উত্তর এই সব তত্ত্বেই কিছু কিছু পাওয়া যায়। এখানে বলে রাখা ভাল যে দু-একজন এমনও আছেন যাঁরা পুঁজিবাদী ধারা ঔপনিবেশিক আমলেই এসে গেছে বলে দাবী করেন। যথা, গুণ্ডের ফ্রাংক-কে অনুসরণ করলে বলতে হবে যে পৃথিবীব্যাপী পুঁজিতন্ত্রের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ভারতের মত উপনিবেশ যখন অংশীদার হ'ল তখনই উপনিবেশ পুঁজিবাদী বিবর্তনের সীমান্তে (periphery) ঢুকে পড়ল ; উনিশ শতকীয় ভারত সম্বন্ধে ইমানুয়েল ওয়ালেরস্টাইনের এই মত। আবার এমনও বলা হয়েছে যে উনিশ শতকের শেষভাগেই টাকার আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে কৃষিব্যবস্থায় এবং এটাই কৃষির অন্তর্ভুক্তি (subsumption) পুঁজির পারবশ্যে। তবে এই জাতীয় মত এখনও সর্বজনস্বীকৃত নয়, তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে নানা ফাঁক আছে। আপাততঃ এটুকু বলা যায় যে ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন যে খাস ঔপনিবেশিক আমলে কৃষির বাণিজ্যীকরণের ধারা, সামন্ততান্ত্রিক ভূব্যবস্থার টিঁকে থাকার ক্ষমতা, পুঁজির মালিকদের সঙ্গে কৃষি বিনিয়োগের ক্ষেত্রের দূরত্ব, কৃষিব্যবস্থার ওপর শিল্পায়নের অভাবের প্রভাব, ইত্যাদি নানা কারণে কৃষিপণ্যের বৃদ্ধি কিংবা ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকের বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও কৃষির পক্ষে আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন বন্দোবস্তে উত্তরণ সম্ভব হয়নি।

এই অর্থে সামগ্রিক অনগ্রসরতা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু হালে ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন যে এই সীমাবদ্ধতা মানে কিন্তু এই নয় যে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনহীন স্থাণু অবস্থায় ছিল। দুই ধরনের পরিবর্তনের ওপর গবেষণা হচ্ছে—প্রথম, উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি, বিভিন্ন ফসল আবাদের কমা-বাড়া, উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি মানে একর প্রতি বা মাথাপিছু উৎপাদনের হিসেবে, ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী বিভেদীকরণ (differentiation) অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে আধুনিক গবেষণায়। এইটা নতুন কেননা দু-তিন দশক আগেও সব কৃষকই গরীব আর ক্রমাগত গরীবি বাড়ছে এই গোছের একটা সামান্যীকরণ ঐতিহাসিকদের অভ্যস্ত ছিল।

প্রথম ধারায় গবেষণা হালে অনেক পালটিয়েছে পুরোন ধারণাগুলিকে। কিছু উদাহরণ : মৌসুমি বৃষ্টির প্রভাব উৎপাদনের ওপর সকলেরই জানা ; কিন্তু নতুন যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হল এই যে অনাবৃষ্টির ফলে কেবল সাধারণভাবে আবাদের ফসল কমায় না, নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন উৎকৃষ্ট জমির তুলনায় বেশী প্রভাবিত হয় বলে, এবং নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন উৎকৃষ্ট জমির সবচেয়ে নিম্নবর্গের চাষীর ভাগে সাধারণতঃ পড়ে বলে, অনাবৃষ্টির একটা ফল কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্যের বৃদ্ধি (রাঘবন, ১৯৮৫)। আর একটা সংশ্লিষ্ট ব্যাপার এই যে কৃষির বাণিজ্যীকরণের দরুণ পূর্বের সস্তা কিন্তু গরীব চাষীর খাওয়ার উপযোগী ফসলের পরিবর্তে, বাজারে দামী ফসল উৎপন্ন হওয়ায়, অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল

নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে, এবং বিশেষভাবে বাড়ে পূর্বে অনাবাদি বর্তমানে আবাদি (marginal) জমিগুলোতে ; অতএব কৃষিপণ্য উৎপন্ন করতে গিয়ে দ্বিতীয় জাতীয় জমিতে কৃষকের ঝুঁকি বাড়ছে (প্রভু মহাপাত্র, ১৯৮৫)। বাজার দর অনুসারে বিভিন্ন ফসলের আবাদ চাষী করবে এটা স্বতঃসিদ্ধ মনে করা হত, ধর্ম নারায়ণের গবেষণার অনুসরণে ; কিন্তু নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে এটা সত্য হলেও চাষীর নিজস্ব একটা যুক্তি (peasant rationality) আছে যার মধ্যে বাজার দর কেবল নয়, প্রায় সমান ওজনে আছে অন্যান্য হিসেব, যথা ফসলের উপজ গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য, শ্রমের দর, আঞ্চলিক পরিবেশানুগ গতানুগতিক আবাদ প্রথা, ইত্যাদি (শ্রীপ্রকাশ, ১৯৮৫)। ১৮৪০-৭০ পর্যায়ে সরকারি হিসেব থেকে কৃষির প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল বোম্বাই প্রদেশে, এমন একটা ছবি ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছিলেন ; এখন খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছে যে সম্ভবতঃ ঐ পর্যায়ে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়েনি, গবাদি পশুর সংখ্যা কমেছে, কেবল হিসেব পরের দিকে আরও সুষ্ঠু হওয়ার ফলে (wider coverage) বিপরীত ভ্রান্তি সৃষ্ট হয়েছে (সুমিত গুহ, ১৯৮২)। উৎপাদনের ধারা সম্বন্ধেও বিতর্ক রয়েছে : যথা এলেন হেস্টন (১৯৭৩) বহু ব্যবহৃত জর্জ ব্লিন্-এর উৎপাদনের হিসেব সম্বন্ধে সন্দিহান—যদিও মনে হয় হেস্টনের যুক্তি দুর্বল এবং যে ধরনের সূক্ষ্ম নির্ভুলতা অপরের কাছে প্রত্যাশা করেন তা তার নিজের কাজে দেখা যায় না (মফকরুল ইসলাম, ১৯৭৯ ; সতীশ মিশ্র, ১৯৮৩)। তবে এটা স্বীকার্য যে আগে যেমন ভাবা হ'ত যে কৃষির বাণিজ্যীকরণ মানে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নগদা ফসলের বৃদ্ধি সেটা সব অঞ্চলে সত্য নয় : ১৯২১ সাল থেকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ নানা অঞ্চলে নগদা ফসলে বিশেষীকরণের পূর্বতন ধারা ব্যাহত হয় (অশোক মোদী, ১৯৮২ ; ক্রিস্টোফর বেকর, ১৯৮৪)।

এই উদাহরণগুলিতে উৎপাদনের ধারা সম্বন্ধে নতুন গবেষণার গতি কিছুটা আন্দাজ করা যায়। অনুরূপ ভাবে কৃষি-অর্থনীতিতে বিভিন্ন বর্গের সম্পর্ক এখন বিতর্কের বিষয়। যথা, মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি (Subinfeudation) ও খাজনা বৃদ্ধি : বেডেন পাওয়েল থেকে অমিত ভাদুড়ী (১৯৭৬) বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক ঐ সংখ্যাবৃদ্ধিকে খাজনা বাড়ার মূল কারণ হিসেবে দেখেছেন ; অপর দিকে, বাংলায় অধ্যাপক আবদুল্লা (১৯৮০) এই দুই বৃদ্ধির মধ্যে কোনও সম্পর্ক দেখতে পান না, এবং মফকরুল ইসলাম (১৯৮৩) এই সম্পর্ক এখনও অপ্রমাণিত মনে করেন। সাধারণতঃ ঐতিহাসিকেরা স্বত্বভোগী (occupancy) প্রজা এবং স্বত্বহীন (tenant at will) প্রজাদের মধ্যে শ্রেণীবিভেদের ওপরে জোর দেন ; কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয় এখন যে স্বত্বহীন প্রজাগিরি বাংলা প্রদেশে একরকম আর পাঞ্জাবে অন্যরকম, একদিকে গরীব চাষী বাধ্য হয়ে স্বত্বহীন প্রজা হিসেবে বেশী খাজনা দিয়ে চাষ করে, অপর দিকে বর্ধিষ্ণু চাষী নিজের মালিকানায় বা স্বত্বে যে জমি আছে তার বাইরে অন্য জমিতে স্বত্বহীন প্রজা হিসেবে চাষ করে লাভের জন্য ; আইনের চোখে এই দুই চাষীই স্বত্বহীন প্রজা, কিন্তু শ্রেণী হিসেবে এরা আলাদা নিশ্চয় (নীলাদ্রি ভট্টাচার্য, ১৯৮৩)।

উত্তর ও পূর্ব বাংলায় উনিশ শতকের শুরু থেকেই কিছু বর্ধিষ্ণু চাষীদের ব্যাপারী ও মহাজনি ভূমিকায় দেখা যায় (রত্নলেখা রায়) ; কিন্তু তার অর্থ কি এই যে প্রাক্ঔপনিবেশিক আমল থেকেই এই ধারা সমান চলে আসছে, ঔপনিবেশিকতা বা বাণিজ্যীকরণ কৃষিব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেনি ? এমন ভাবা বোধহয় ভুল হবে কেননা ঐ চাষী-ব্যাপারী-মহাজন সংখ্যায় কত ছিল, উৎপাদনের কতটা তাদের হাতে, মহাজনি পুঁজির কি অনুপাত তাদের হাতে, এসবের কোনও সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি ; এবং বিংশ শতকে ক্রমান্বয়ে এই ধারায় জোতদার মহাজন শ্রেণীর বৃদ্ধির প্রমাণ আছে ঔপনিবেশিক ধাঁচে কৃষির বাণিজ্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গে (বিনয়ভূষণ চৌধুরী ১৯৮৩ ; ওংকার গোস্বামী, ১৯৮৪)। উত্তর প্রদেশে কৃষির বাণিজ্যীকরণ প্রক্রিয়ার দুটি পর্যায় চমৎকার স্পষ্ট খাদ্যশস্যের পণ্যীকরণ (মাজিদ সিদ্দিকি, ১৯৭৮) এবং ইক্ষু চাষে পুঁজির বর্ধিত আধিপত্যের ক্ষেত্রে (শহিদ আমিন, ১৯৮৪)।

এ ভাবে ঔপনিবেশিক আমলের কৃষি ব্যবস্থার ছবিটা আঞ্চলিক ইতিহাসে নতুন গবেষণা দ্বারা, নতুন বিতর্কের পথে, এখন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ হচ্ছে। একটা দিকে কেবল এই প্রগতির অভাব দেখা যায়—প্রজাস্বত্বের ব্যাপারে ঔপনিবেশিক নীতি ও গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাসে তার প্রভাব। সব শেষে এ বিষয়ে দু-এক কথা বলা দরকার। সরকারকে জমির "মালিক" হিসেবে রাজস্ব (revenue) যারা দেয় তাদের নীচে, এবং কৃষিশ্রমিক ও ভাগচাষী শ্রেণীর ওপরে, বিভিন্ন প্রকারের স্বত্বভোগী "প্রজারা" মালিককে খাজনা (rent) দেয়—এবং এরা গ্রামীণ সমাজের বিরাট একটা অংশ। এই প্রজাদের প্রচল-স্বীকৃত নানা স্বত্ব ইংরেজ আইনের কায়দায় কোম্পানির আমলে, বিশেষ করে জমিদারি অঞ্চলে, প্রায় অবলুপ্ত হতে থাকে। আগেই উল্লেখ করেছি ইউটিলিটেরিয়ন বা উপযোগবাদী চিন্তাধারার জমিদার বিরোধী মনোবৃত্তি (অধ্যায় ৩)। ফলত উনিশ শতকে প্রজাদের অত্যধিক শোষণে কৃষিব্যবস্থা পর্যুদস্ত হওয়ার আশঙ্কায় প্রজাস্বত্ব সংরক্ষণ করার জন্য চিন্তা ও নীতি। অবশ্য নীতিগত ভাবে এই প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা এক জিনিস, আর আইন দ্বারা হাতে কলমে সেটা কার্যকরী করা আর এক ব্যাপার। এই জটিল ইতিহাসের একটা আভাস মাত্র এখানে দেওয়া যেতে পারে।

বাংলায় জমিদারি বন্দোবস্তের পরের কয়েক দশকে প্রজাস্বত্ব প্রায় লোপাট হয়, বিশেষ করে ১৮১২ সালের 'পঞ্চম' আইনের (অর্থাৎ রেগুলেশন ৫) দরুণ : জমিদার যে কোন প্রজার কাছে যে কোন হারে খাজনা আদায় করতে পারত এবং অনাদায়ে প্রজাকে উৎখাত করতে পারত। ঐ আইনে কেবল পত্তনিদারদের (tenure holder) স্বত্ব স্বীকৃত হয় এবং তাদের নীচে স্তরে স্তরে অধীন পত্তনিদার ইজারা বন্দোবস্তে বৃদ্ধিলাভ করল। ১৮৫৯ সালের 'দশ আইন' প্রথম প্রজাস্বত্ব স্বীকার করে এই হিসেবে যে, বারো বৎসরের বেশী যে প্রজা একই জমিতে দখল রেখে চাষ করেছে তার সেই জমি চাষ করার অধিকার (occupancy) স্বীকৃত হল। কিন্তু প্রজাদের এতে বিশেষ লাভ হয়নি, কেননা

বারো বৎসর ধরে এই ভাবে স্বত্ব তৈরী হওয়ার সুযোগ না দিয়ে জমিদার তার আগেই প্রজা বদল করতে পারত। তাছাড়া খাজনার হারের কোন সীমা নির্দিষ্ট হয়নি। বরঞ্চ ১৮৬২ সালে কলকাতা হাই কোর্টের একটা বিখ্যাত মামলায় বিচারপতি বার্নস্ পিকক রায় দিলেন যে জমিদার প্রজার কাছে যে কোন খাজনা দাবী করতে পারে।

১৮৫৯ সালের আইন কতটা অন্তঃসারশূন্য এটা স্পষ্ট হল। জর্জ ক্যাম্বেল প্রমুখ আমলারা এতে বিচলিত হন, এবং তিনি যখন বিচারপতি ১৮৬৫ সালে তখন আর একটা বিখ্যাত মামলায় (তথাকথিত Great Rent Case) পনেরজন বিচারপতির যুক্ত বিচারে (full bench) হাইকোর্টের ১৮৬২ সালের রায় নাকচ করা হয়। নতুন সিদ্ধান্ত এই যে জমিদার প্রজার খাজনা বাড়াতে পারবে কেবল মোট উৎপন্ন যে হারে বেড়েছে সেই হারে। অর্থাৎ একটা সমীকরণের অংক—
পূর্বের খাজনা : পূর্বের উৎপন্ন ::
বর্ধিত খাজনা : বর্ধিত উৎপন্ন
অর্থাৎ, ধরা যাক, ১৮৫০ সালে জমির যে খাজনা ছিল সেটা তৎকালীন মোট উৎপন্নের যে অনুপাত, নতুন নির্ধারিত খাজনা বর্তমান উৎপন্নের সেই অনুপাত হবে, তার বেশী নয়। এই সিদ্ধান্তে মহলওয়ারি এলাকার উপযোগবাদী নীতির ছায়া স্পষ্ট। কিন্তু এটা প্রয়োগ করা শক্ত, উৎপন্নের হিসেব কোথায়?

১৮৭০-এর দশকে আমলা মহলে আলোচনা চলতে থাকে, কি করা যায়? ইতিমধ্যে ক্যাম্বেল প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে বই লিখে ফেলেন, প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন্ আয়ারল্যাণ্ডে এই আইন প্রণয়নে তাকে বিশেষজ্ঞ মেনে নেন, ক্যাম্বেল ছোট লাট হয়ে বাংলার শাসন ভার নেন, পাবনায় প্রজাবিদ্রোহ দেখা যায়, একটা খাজনা আইন কমিশন প্রতিবেদন পেশ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাংলার প্রজার অবস্থা যথাপূর্বং। শেষে ১৮৮৩ সালে একটা খসড়া আইন তৈরী হয়। গোড়ায় এর উদ্দেশ্য ছিল একটা খাজনার হার বেঁধে দেওয়া, কিন্তু এতে আমলারা সন্দিহান এবং জমিদারদের প্রতিভূ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ন এসোসিয়েশন প্রতিবাদমুখর। অগত্যা আয়াল্যাণ্ডের নতুন প্রজাস্বত্ব আইনের অনুকরণে স্থির হয় যে নতুন খাজনা জমিদার দাবী করতে পারে পুরোন খাজনার সাড়ে-বারো শতাংশ অধিক, এবং পনের বৎসরের মধ্যে খাজনা পুনরায় বৃদ্ধি চলবে না। অবশ্য মামলা করে আদালতের নির্দেশে খাজনা বাড়াবার রাস্তা খোলা রইল। আর দখলি স্বত্ব সম্বন্ধে স্থির হয় যে বারো বৎসরের বেশী কোন জমিদারের অধীন প্রজা যে কোন জমি যদি চাষ করে থাকে, তার প্রজা হিসেবে দখল স্বীকৃত (এটা ১৮১২ সালের আইনের পূর্বলিখিত ফাঁকটা বন্ধ করল)। এই হল ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন।

এই আইনের ফলে আইন দ্বারা স্বত্ব-সংরক্ষিত শ্রেণী আর একটা বাড়ল, প্রকৃত যারা জমি চাষ করে খায় তাদের বেশীর ভাগ আইনের আওতার বাইরে রইল। ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালে দুটি সংশোধন বিধিবদ্ধ হয়; এতেও বিরাট

সংখ্যক বর্গাদারদের কোনই স্বত্ব সাব্যস্ত হয়নি, কেবল স্বত্বভোগী বা 'অকুপেন্সি' রায়তদের নীচে যে উপস্বত্বভোগী রায়ত, তার একটা নিতান্ত সীমিত উপস্বত্ব আইন স্বীকার করে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন কিভাবে এই সব আইন তৈরীতে মালিকানা ও স্বত্বসম্পন্ন শ্রেণী-স্বার্থের মধ্যে সমঝোতার প্রক্রিয়ায় স্বত্বহীন চাষী ও ভাগচাষীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হল।

বাংলার ১৮৮৫ প্রজাস্বত্ব আইনের অনুকরণে ১৮৮৭-১৯০৭ সালে আইন বিধিবদ্ধ হয় উত্তর মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, মালাবার ইত্যাদি অঞ্চলে। বর্তমান পঞ্জাব (১৯০১), মহারাষ্ট্র (১৮৭৯), উত্তরপ্রদেশ (১৯০০) ইত্যাদি অঞ্চলে আর এক ধাঁচের আইন কয়েক খেপে তৈরী হল : ঋণের জন্য কৃষকের হাত থেকে জমির মালিকানা যাতে বেনে মহাজনদের হাতে না যায়। জমি বিক্রয় ও ঋণের দায়ে ক্রোক নানা বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়, যাতে জাত চাষা যারা তাদের হাত থেকে জমি বেনেরা না নিতে পারে। এর ফল এই যে জাত বেনেদের বদলে বর্ধিষ্ণু চাষীরা মহাজনি কারবার করার আরও সুযোগ পেল, কেননা তাদের হাতে চাষের জমি হস্তান্তর সরকার ও আইনের চোখে দুষ্য নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও বর্ধিষ্ণু, জমির মালিক ও ছোটখাট মহাজন জাতীয় কৃষকদের শ্রীবৃদ্ধির সুযোগ।

প্রজাস্বত্ব বা জমি হস্তান্তর আইন দ্বারা কৃষি অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ কতদূর ও কোন দিকে যাবে এই প্রশ্ন এক দিকে যেমন ইংরেজ আমলাদের মধ্যে উপযোগবাদী ও হস্তক্ষেপ বিরোধী নীতির প্রবক্তাদের মধ্যে বিতর্কের বিষয়, অপর দিকে শাসিত জাতির নানা স্বার্থগোষ্ঠীর (interest group), জাতীয় কংগ্রেস, স্বরাজ পার্টি, জাস্টিস্ পার্টি ইত্যাদি দলের রাজনীতির এবং ক্রমবর্ধমান কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামের মূল প্রশ্ন। সেই রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের এখনকার আলোচনার চৌহদ্দির বাইরে।

অধ্যায় ৫

অনটন, অনশন, মন্বন্তর

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ছায়া বাংলার চেতনায় সহজে যাবে না।

> ১৯৪৩ সালের বাংলার মন্বন্তর মানুষের মারাত্মক দুর্দশা ও মৃত্যুর সংগে পরিচিত আমাদের কালেও একটা বিরাট দুঃসময়রূপে স্মরণীয়। দশ থেকে বিশ লক্ষ মানুষ এই মন্বন্তরে এবং আনুষঙ্গিক মহামারীতে মারা যায়। আরো অনেকে যারা মরেনি তারা অন্নাভাব ভোগ করে মাসের পর মাস, অসুখে ভোগে এবং অন্যান্য দুর্ভোগে পীড়িত হয় যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দুর্ভিক্ষের দরুণ পর্যুদস্ত হবার ফল।

এইভাবে শুরু হচ্ছে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের ওপর স্যর জন উড্‌হেড-এর নেতৃত্বে সরকারি দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের প্রতিবেদন। এটা বিশেষ অনুধাবন যোগ্য একটা দলিল যদিও প্রত্যাশিতভাবে এতেও আছে সরকারি পক্ষে ওকালতি এবং তথ্যের নির্বাচনে একপেশে হবার প্রবণতা। প্রতিবেদনে দুর্ভিক্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

> ১৯৪৩-এর গোড়ার মাসগুলিতে জেলা শাসকেরা দুর্ভিক্ষ আসন্ন মনে করেন। মে ও জুন মাসে দুর্ভিক্ষ নোয়াখালি, চট্টগ্রাম জেলায় প্রকট হয় এবং মৃত্যুর হার খুব বেড়ে যায়। জুলাই মাস থেকে সমস্ত গ্রামবাংলা দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পড়ে এবং মৃত্যুর হার স্বাভাবিকের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন থেকে মৃত্যুসংখ্যা বেড়ে ডিসেম্বরে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যায় পৌঁছায়। যদিও স্থানীয় খাদ্যাভাব সর্বত্র সমান ছিল না প্রদেশের প্রায় সর্বত্রই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে চালের দাম গরিব মানুষের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় এমন কোথাও ছিল না যেখানে তারা অন্নাভাব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল।....১৯৪৪ সালের অধিকাংশ সময় মৃত্যুসংখ্যার হার উঁচু থেকে যায়....আমাদের হিসেব অনুসারে জনসংখ্যার একদশমাংশ—ষাট লক্ষ মানুষ—দুর্ভিক্ষের দ্বারা গুরুতর রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৪৩ সালের প্রথমভাগে চালের দাম যখন বাড়তে থাকে, যথেষ্ট শস্য মজুত যাদের ছিল না সেসব গরীব মানুষেরা খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে অপারগ হয়ে পড়ে। কিছুদিন সামান্য যা জমানো ছিল তাই খাওয়া,

অথবা তাদের যৎসামান্য সম্পদ বিক্রি করে ক্রমবর্ধমান দামে চাল কেনা, তারপর অনশন। বেশীর ভাগ নিজ নিজ জায়গায় থেকে যায় এবং এরা অনেকেই মরে। বাকীরা নিজ গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ে খাদ্যের সন্ধানে এবং এই বুভুক্ষু ও সম্বলহীন জনতার যাত্রা ছিল এই মন্বন্তরের সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক। সহস্র সহস্র মানুষ শহর ও মহানগরের দিকে যায়; ১৯৪৩ অক্টোবর মাসে কলকাতায় উদ্বাস্তুর সংখ্যা অন্ততঃ এক লক্ষ আন্দাজ করা হয়।....পরিবারের কাঠামো ভেঙে পড়ে আর নীতিবোধও বিনষ্ট হয়। দুঃস্থ মানুষেরা অমানবিক স্তরে গিয়ে পৌঁছায়, সহায়হীন ও আশাহীন যান্ত্রিক পুতুলের মতন কেবল জান্তব ক্ষুধার তাড়নায় চালিত।

সন্দেহ করার কারণ আছে যে সরকারি দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনে মৃতের সংখ্যা কমিয়ে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা অন্যান্য হিসেব অনুসারে তিরিশ লক্ষের বেশী হতে পারে। দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতা সেইসময় সংবাদপত্র ইত্যাদির প্রতিবেদনে ধরা পড়লেও সম্যক উপলব্ধ হয়নি। একটা ব্যাপার অনেকে জানেন না: বৃটিশ সরকার বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে খবর ১৯৪৩ সালে একটা গোপন সার্কুলার দ্বারা সেন্সরের অধীন করেনেয়। তা সত্ত্বেও ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে কলকাতার পথে ঘাটে না খেতে পাওয়া মানুষের মিছিল ও ক্রমবর্ধমান মৃতের সংখ্যা। সেপ্টেম্বর—অক্টোবর ১৯৪৩ সালে গড় মৃত্যুর সংখ্যা কলকাতায় ৪৩১২ প্রতি সপ্তাহে; যেখানে গত কয়েক বৎসরে মৃত্যুর হার ছিল ৫০০ থেকে ৬০০। এই অভিজ্ঞতা কলকাতা তথা বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজকে বিচলিত করে, যার প্রমাণ জায়নুল আবেদিনের আঁকা ছবি, বা শম্ভু সাহার আলোকচিত্র বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা, বিভূতিভূষণ ও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকের সাহিত্যে।

সরকারের দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন ও অধুনা গবেষণার দ্বারা যা জানা যায় তাতে মনে হয় দুর্ভিক্ষের অনেকগুলি কারণ ছিল। ১৯৪২ সালের শেষে আমন ধান ও ১৯৪৩ সালের বোরো এবং আউষ ধান মিলিয়ে বাংলার জনসংখ্যার পক্ষে ৪২ কিংবা ৪৩ সপ্তাহের উপযোগী খাদ্য ছিল, যেটা এমন কিছু কম নয় কেননা, এর সংগে যোগ দিতে হবে সম্ভাব্য আমদানি এবং গত বৎসরের শস্যের অব্যবহৃত উদ্বৃত্ত। ১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে ৩৯ সপ্তাহের উপযোগী খাদ্যশস্য ছিল, ১৯৩৬ সালে ৪৪ সপ্তাহের উপযোগী খাদ্য ছিল—কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয়নি। ১৯৪৩ সালে অন্য অনেক সমস্যা দেখা যায়: বর্মা দেশ জাপানী অধিকারে থাকায় সেখান থেকে চালের আমদানি বন্ধ হয়। মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, খুলনা, বাখরগঞ্জ ইত্যাদি জেলায় ১৯৪২ থেকে 'উদ্বৃত্ত ধান' সরকার সরাতে থাকে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারের জন্য এবং সম্ভাব্য জাপানী অনুপ্রবেশ ঘটলে তাদের জন্য শস্য যাতে না থাকে সেই উদ্দেশ্যে। একই উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার সেইসব অঞ্চলে ২৬ হাজারের বেশী নৌকো নষ্ট করে দেয় এবং ২০ হাজার নৌকো অন্যত্র সরিয়ে দেয় যার ফলে সত্তর শতাংশ নৌকো মাল পরিবহণ ও মাছ ধরা ইত্যাদির কাজ থেকে অপসারিত হয়;

যুদ্ধকালীন সরকারি খাদ্যনীতি বিশেষভাবে আন্তঃ-প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক খাদ্যচালানের উপর কন্ট্রোল নানা জায়গায় খাদ্যাভাব তৈরি করে এবং কালোবাজারি প্রণোদিত করে। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলে চালু মত ছিল যে বাংলার প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক গলদের জন্যে আংশিক খাদ্যাভাব প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে, যদিও এর বিরুদ্ধে মুসলিম লিগ-এর পক্ষপাতি নানা যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন জনাব আফজল হোসেন, দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিটির সভ্য হিসেবে।

প্রকৃত পক্ষে এ সমস্ত আংশিক কারণসমূহের পশ্চাদ্‌পটে দৃষ্টির বাইরে থেকে যায় বৃহত্তর সমস্যা—বাংলার চাষীদের অধিকাংশের ক্রমবর্ধমান অনটন যার ফল খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির সংগে তার ক্রমক্ষীয়মান ক্রয়ক্ষমতা। ১৯৩৯ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশনের উদ্যোগে সেট্‌লমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট দ্বারা যে অনুসন্ধান হয় এবং ১৯৪১-এর জনগণনা থেকে যা তথ্য জানা যায় তাতে হিসেব করা যায় যে ওই সময় নাগাদ বাংলা প্রদেশে প্রায় ৭৫ লক্ষ কৃষিনির্ভর মানুষের মধ্যে ২০ লক্ষের কম কৃষিজীবীর ৫ একর অথবা অধিক জমি ছিল; ভূমিরাজস্ব প্রতিবেদন অনুসারে অন্ততঃ ৫ একর নিতান্ত আবশ্যক একটা পরিবারের সারা বৎসরের ভরণ-পোষণের জন্য (জমি কেবল আমন শস্যের উপযোগী হলে নিম্নতম ৮ একর)। মোট ৩০ লক্ষ মানুষ মূলতঃ বর্গাদারি এবং/অথবা ভূমিহীন চাষী হিসেবে মজুরীর উপরে নির্ভরশীল ছিল। ভূমিরাজস্ব কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় যে ১৯৩৯ সালে বাংলা প্রদেশে জমির ক্ষুধা প্রবল; তাছাড়া ছিল উপযুক্ত বিনিয়োগের অভাবে একর প্রতি উৎপাদন কমার প্রবণতা। আরেকটা প্রায় সমকালীন তথ্য স্মরণীয়: ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টর-এর ১৯৩৩ সালের তদন্ত অনুসারে বাংলাদেশে ৩১ শতাংশ মানুষ অত্যন্ত অপরিপুষ্টির দ্বারা নিগৃহীত (তুলনায় সর্ব্বভারতীয় গড় ২৬ শতাংশ) এবং কেবল ২২ শতাংশ পুষ্টিকর খাদ্যের কারণে সবল (সর্ব্বভারতীয় গড় ৩৯ শতাংশ)। অর্থাৎ অপুষ্টির প্রাবল্য বাংলা প্রদেশে ভারতের মত গরীবদেশেরও গড় অবস্থার চেয়ে অনেক খারাপ স্তরে, দুর্ভিক্ষের বহু আগেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক অমর্ত্যকুমার সেনের বাংলার ১৯৪০-৪৪-এর দুর্ভিক্ষ তথা সাধারণভাবে দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা অনুধাবনযোগ্য। বাংলার এই দুর্ভিক্ষ ছাড়াও, ১৯৭০-এর দশকের ইথিওপিয়া এবং বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে অমর্ত্য সেনের নতুন চিন্তার ধাঁচ হল মালিকানার অধিকারের সংগে পরিদান অধিকারের (exchange entitlement) সূত্র ধরে দুর্ভিক্ষ কোন্ শ্রেণীর মানুষকে পর্যুদস্ত করে সেটা ধরবার চেষ্টা। "পরিদান অধিকার" বোঝায়

> সেই ক্ষমতা যার দ্বারা লোকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে সমাজের আইনানুগ পথে, যথা উৎপাদন করার ক্ষমতা, লেনদেন ব্যবস্থা, সরকারের নিকট সাব্যস্ত দাবী, এবং অন্যান্যভাবে খাদ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া।

একদিকে এই পরিদান প্রক্রিয়া এবং অপরদিকে মালিকানার ধাঁচটাকে দেখা

দরকার। কেবল মাথাপ্রতি কত খাদ্য মজুদ রয়েছে এই গড় হিসেবটা থেকে দুর্ভিক্ষে লোকে মরে কেন আর কারা মরে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, অমর্ত্য সেনের হিসেব অনুযায়ী বাংলা প্রদেশে ১৯৪৩ সালে খাদ্য যোগান গত পাঁচ বৎসরের গড় থেকে মাত্র ৫ শতাংশ কম ছিল এবং ১৯৪১ সালের থেকে ১৩ শতাংশ বেশী ছিল। আসলে ১৯৪২-৪৪ সালে বাংলায় পরিদান অধিকারের একটা বড় ওলটপালট হয়েছিল। যুদ্ধকালীন ব্যয় ও সেই জন্য প্রচুর কাগুজে টাকা ছাপা হয়, ফলত মুদ্রাস্ফীতি, এই ব্যয়ের ফলে কিছু লোকের হাতে টাকা আসায় তাদের অস্বাভাবিক ক্রয়ক্ষমতা, চালের বাজারে ফাটকাবাজী এবং গুদামজাত চাল আটক রেখে কালোবাজারি, ইত্যাদি। মোট ফল এই যে, ব্যবসায়ী শ্রেণীর লাভ বাড়ল, মজুরী বিশেষ করে কৃষি মজুরীর বেতন বাড়ল না, চালের দাম ছোট চাষী আর ক্ষেতমজুরের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে গেল, শহুরে বেতনভোগী শ্রেণী চালের দাম বাড়া সত্ত্বেও সরকারি রেশন ব্যবস্থার দৌলতে কোনমতে বেঁচে গেল। সাধারণভাবে বলা চলে যে এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর পরিদান অধিকার বদলানোর ফলে, অথবা মালিকানা হাতবদল হবার ফলে, পরিদান অধিকারচ্যুত বা মালিকানাচ্যুত শ্রেণী অনটন, অর্ধাশন ও শেষে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। দুর্ভিক্ষ একটা ঘটনা যেটাকে বৃহত্তর এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখা দরকার।

প্রাসঙ্গিক একটা গবেষণা উল্লেখ্য : "আধুনিক বাংলায় সাচ্ছল্য ও অনটন" নামক বইতে পল্ গ্রীনো ১৯৪৩-৪৪-এর দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন নৃতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তার দৃষ্টি একদিকে বিগত একশ' বৎসরে কৃষিব্যবস্থার ক্রমাবনতির ইতিহাসে, অপরদিকে বাঙালী সংস্কৃতিতে কোনও এক বিগত সাচ্ছল্যের স্বর্ণযুগের বিশ্বাস, "ধনধান্যের" ধারণা, ধানের প্রতীকী ব্যবহার ইত্যাদির ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিকে। গ্রীনোর মতে বাংলার কৃষির ক্রমানবনতির শেষ মার ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ও লোকবিশ্বাসে সচ্ছল সোনার বাংলার অধুনা অলীক ছবিটাকে চূর্ণ করে দিল। গ্রীনোর গবেষণার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে দুর্ভিক্ষে কেন এত বাঙালী নিশ্চেষ্ট মৃত্যুবরণ করলো, কেন প্রতিবাদের অভাব ? তার মতে এর জন্য দায়ী বাঙালী সংস্কৃতিতে ও লোকজীবনে রাজা-প্রজা, রক্ষক-অনুগৃহীত, দয়াধর্ম-কৃপা প্রার্থনা জাতীয় ধারণা সমূহের আধিপত্য। এটা একটা ভাববার বিষয় : অনেকে লক্ষ করেছে যে যখন হাজার লোক কলকাতার রাস্তায় মরেছে তারা ভিক্ষা চেয়েছে কিন্তু জোর করে কেড়ে নেবার চেষ্টা করেনি। তবে সম্ভবত গ্রীনো এবং আরও অনেকে প্রতিবাদের অভাবটাকে বেশী বড় করে দেখেছে। বাংলার গোপন পুলিশ রেকর্ডে দেখা যায় যে অনেক ধানের গোলা লুঠ হয়েছিল (বিশেষ করে রাজনৈতিক চেতনার কেন্দ্রস্থল মেদিনীপুরে) ১৯৪২ সালে ; ডাকাতি নামে নথিবদ্ধ হয়েছে অনেক ধান লুঠের ঘটনা ১৯৪৩ সালে আউসধান উঠবার পর। এটাও মনে রাখতে হবে যে নিকটে সামরিক উপস্থিতি ও যুদ্ধকালীন প্রশাসনিক কড়াকড়ির সামনে চাষী মজুরের পক্ষে প্রতিবাদ সহজ ছিল না। মহাযুদ্ধকালীন

এই অস্বাভাবিক অবস্থার শেষ হলে কয়েক বৎসর পর তেভাগা আন্দোলনে প্রতিবাদমুখর কৃষকদের দিকে তাকালে, অথবা ১৯৪২ সালে কংগ্রেস অনুপ্রাণিত মেদিনীপুরের দিকে তাকালে, মনে হয় যে রাজনৈতিক চেতনার ওপরে নির্ভর করে বাংলার কৃষকের সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা, সহনশীল নিশ্চেষ্টতা তাদের চিরকেলে চরিত্র নয়।

২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উনিশ শতকে জনসংখ্যার উপর দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতম কারণ ছিল। এইজন্যে সেই অদৃষ্ট-বাদী বাক্য : এ দেশের চাষাবাদ মৌসুম নিয়ে জুয়া খেলার সমান। সাধারণত দুর্ভিক্ষের সংগে মহামারী, বিশেষ করে কলেরা জাতীয় আন্ত্রিক রোগ দেখা যেত। সারণি ৫·১ দেখলে বড়মাপের দুর্ভিক্ষগুলির ফল আন্দাজ করা যায়।

সারণি ৫·১

ভারতে দুাভক্ষের প্রকোপ, ১৮৫৩-১৯৪৩

(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)
বৎসর	অঞ্চল	দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনসংখ্যা (লক্ষ)	মৃতের সংখ্যা (লক্ষ)
১৮৫৩-৫৫	মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, রাজস্থান	২০০	অজানা
১৮৬০-৬১	পঞ্জাব, রাজস্থান, কচ্ছ, বিশেষতঃ বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ	১৩০	২০
১৮৬২	সাধারণভাবে দাক্ষিণাত্য	অজানা	অজানা
১৮৬৬-৬৭	বিহার, মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চল, হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণ মহীশুর, বিশেষতঃ উড়িষ্যা	১১৮	৯·৬
১৮৬৮-৭০	গুজরাট, বোম্বাই, বর্তমান উত্তর প্রদেশের দক্ষিণাংশ, বিশেষতঃ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ	২১০	৪·২
১৮৭৩-৭৪	মধ্যপ্রদেশ, বিহার, বাংলা	১৭০	অজানা
১৮৭৬-৭৮	বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মহীশুর, মাদ্রাজ, বিশেষতঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সি	৩৬৪	৪৩

১৮৭৭-৭৮	কাশ্মীর, বর্তমান উত্তর প্রদেশ	অজানা	১২·৫
১৮৮৮-৮৯	উড়িষ্যা, মাদ্রাজের গঞ্জাম, বিহার	১২·৫	১·৫
১৮৯৬-৯৭	রাজস্থান, বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, বিশেষতঃ মধ্যপ্রদেশ	৯৬৯	৫১·৫
১৮৯৯-১৯০০	মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, রাজস্থান, পূর্ব পঞ্জাব, পশ্চিম ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি	৫৯৫	১০
১৯০৫-০৬	বোম্বাই প্রেসিডেন্সি	অজানা	০·২
১৯০৬-০৭	উত্তর বিহার	১৩০	অজানা
১৯০৭-০৮	মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ	৫০০	অজানা
১৯৪৩-৪৪	বিশেষতঃ বাংলা, অংশতঃ উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ	৬০০	২০

(আকর : দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনাদি, প্রবীণ বিসারিয়া দ্বারা গ্রন্থিত, 'কেম্‌ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ২ ; সংখ্যাগুলিকে তৎকালীন প্রশাসনিকদের অনুমান বলা চলে মাত্র।)

দুর্ভিক্ষের ফলে কেবল প্রাণহানি নয়, কৃষিব্যবস্থা কয়েক বৎসর বিপর্যস্ত হত কারণ আবাদে ব্যবহৃত গবাদি পশুর মৃত্যু, তৈরী জমি অনাবাদি পড়ে থাকায় ক্ষতি, চাষীর সঞ্চিত পুঁজি নষ্ট হওয়ায় পুঁজি বিনিয়োগে তার অপারগতা, ইত্যাদি। এইসব দূরগামী প্রভাবগুলিকে সামলাতে না পারলেও বিশ শতকের গোড়ায় দেখা যায় যে মহামারী ও অনশনে মৃত্যু থেকে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের বাঁচানোর জন্য ইংরেজ সরকার একটা ব্যবস্থিত কার্যধারা (famine code) রপ্ত করেছে ; আজকের দিনেও এই দুর্ভিক্ষ কালীন প্রশাসনিক কার্যধারা মেনে চলা হয়। কিন্তু এটা হল দুর্ভিক্ষের সাময়িক ন্যূনীকরণ। দুর্ভিক্ষের শিকড় অনেক গভীরে। দুর্ভিক্ষগুলি সংকটকাল বলে চোখে পড়ে, কিন্তু এর পেছনে আছে দৈনন্দিন অনটন যেটা সংবাদপত্র বা সরকারি নথিতে প্রতিবেদনযোগ্য নয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি গড় আয়ু কত কম ছিল যেটা অস্বাস্থ্যের ও অপরিপুষ্টির একটা সূচক। পরিপুষ্টির সম্ভাবনা কোথায় যেখানে জনপ্রতি খাদ্য যোগান কমছে ? (সারণি ৫·২)

খাদ্যশস্য অর্থে সারণির হিসেবে ধরা হয়েছে চাল, গম, বাজরা, যব, জোয়ার, ভুট্টা, ছোলা এবং ডাল জাতীয় শস্যাদি। এসবের জনপ্রতি যোগান ১৯২১ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে ৩০ শতাংশ কমছে দেখা যাচ্ছে শিবসুব্রাহ্মণিয়ন্‌-এর হিসেবে হেস্টন-এর হিসেবে ১৫ শতাংশ। যদিও হেস্টন সন্দেহ উৎপাদনের সরকারি

সারণি ৫·২

জনপ্রতি বার্ষিক খাদ্যশস্যের যোগান
(টনের হিসেবে)

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৪৬
জর্জ ব্লিনের হিসেব (বৃটিশ ভারত)	০·২৩	০·২৩	০·২২	০·২০	০·১৬	০·১৬
শিবসুব্রহ্মণিয়নের হিসেব (সম্পূর্ণ ভারত)	০·২০	০·২০	০·২০	০·১৮	০·১৫	০·১৪
এলেন হেস্টনের হিসেব (সম্পূর্ণ ভারত)	০·১৭	০·১৮	০·১৮	০·১৭	০·১৫	০·১৬

(আকর : হেস্টন, 'কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া,' ২, ৪৬০ পৃঃ এবং ব্লিন ও শিবসুব্রহ্মণিয়ন, পূর্বলিখিত, গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য)

হিসেব সম্বন্ধে, এবং আমি সন্দিগ্ধ হেষ্টনের হিসেব সম্বন্ধে, এখানে মোটামুটি একই ধারা দেখা যায় তার এবং অন্যদের হিসেবের মধ্যে (যদিও খাদ্যের যোগান কি পরিমাণে কমলো সেটায় মতভেদ আছে)। হেষ্টন-এর অনুমান যে লোকে কম খাদ্যশস্য পেলেও তার বদলে ফল আর তরিতরকারি কিনছে আর খাচ্ছে : মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

তাহলে দাঁড়াল এই যে বৃটিশ রাজত্বের শেষ কয়েক দশকে জনপ্রতি খাদ্যশস্যের যোগান কমছে। আগেই দেখেছি যে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস-এর ডিরেক্টর স্যার জন মেগ'র তদন্ত অনুসারে ১৯৩৩ সালে বৃটিশ ভারতের গ্রামের মানুষের ২৬ শতাংশ অপরিপুষ্টিতে ভোগে। এরা কারা? দুই-একটা দুর্ভিক্ষ কমিশন-এর প্রতিবেদন দেখা যাক্। ১৮৬০-৬১ সালে উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষে বেয়ার্ড স্মিথ-এর প্রতিবেদন অনুসারে এরা ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক, তথাকথিত নীচু জাতের মানুষ যেমন, চামার এবং তাঁতী। তাঁতীদের অবস্থার অবনতি শিল্প বিনাশের ফলে কেমন ছিল আগেই দেখেছি। বিশেষ করে ১৮৬০-৬৪ সালে তাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়, কারণ তুলোর দাম পৃথিবীর বাজারে বেড়ে যাওয়ায় ভারত থেকে প্রচুর রপ্তানি, ফলতঃ দিশি তাঁতীর কাঁচা মাল তুলোর যোগান পড়ে যায় আর দাম বাড়ে। ১৮৬৬-৬৭ সালে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের মধ্যে বড় সংখ্যা ছিল গ্রামীণ শিল্পী, বিশেষত বিহারের নুনিয়ারা (গন্ধক উৎপাদক, এদের ব্যবসা বিনষ্ট হয় আমদানির ফলে)। ১৮৭৩-৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রতিবেদনেও গ্রামীণ শিল্পীরা হাজির। তবে সব ক্ষেত্রেই ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ : মজুরীর হিসেব উনিশ শতকে পাওয়া শক্ত তবে বোধহয় কখনো খাদ্যশস্যের দামের সংগে তাল রেখে বাড়েনি। আর কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা কি হারে বাড়ছে উনিশ শতকের শেষভাগে তা আমরা জানি।

নৃতাত্ত্বিক অধ্যাপক তারক দাস হিসেব করেছিলেন যে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় কলকাতায় দুস্থদের মধ্যে ৪০ শতাংশ দিনমজুর ৫৪ শতাংশ তপশীলি জাতিভুক্ত।

৩

দেখা গেল যে দুর্ভিক্ষ একটা অস্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু তার শিকড় আছে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রমেশচন্দ্র দত্তের ভারত সরকারকে উদ্দিষ্ট বিখ্যাত প্রস্তাব (১৯০০) স্মরণ করা দরকার। যদিও বড়লাট কার্জন সাহেব তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন এবং বেশ এলেম দেখিয়েছিলেন দত্তের সংগে বাদানুবাদে, এই প্রস্তাবটির মূল্য এই যে এটা কেবল সাময়িক দুর্ভিক্ষকালীন সাহায্য প্রস্তাব নয়, দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে। রমেশ দত্তের মতে কারণগুলি হল, ভূমি রাজস্ব নির্ধারণে স্থায়িত্বের অভাব ; রাজস্ব কৃষি উৎপাদনের তুলনায় অন্যায় রকমের বেশী ; এবং ফলত বেশীর ভাগ কৃষকের নিয়ত ঋণী অবস্থা। তার প্রস্তাব ছিল এই যে ভূমি রাজস্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হোক এবং ভূমিরাজস্বের উচ্চতম সীমা হওয়া উচিত জমির মালিকের ক্ষেত্রে নেট উৎপাদনের (অর্থাৎ উৎপাদনের বাজার দর থেকে উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়ে যে মূল্য দাঁড়ায়) অর্ধেক, এবং অন্যান্য কৃষিজীবীর ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ। কার্জন সাহেব স্বীকার করেননি যে ভূমি রাজস্বের ভার গ্রামীণ দারিদ্র্যের ও দুর্ভিক্ষের কারণ ; তিনি দাবী করেন যে ইংরেজ সরকার বরঞ্চ দুর্ভিক্ষ নিবারণ করেছে। বিদেশী কিছু গবেষণায় ইংরেজ সরকারের এই মতটা আবার পুনর্জন্ম নিচ্ছে আধুনিক সাজে। উদাহরণ, অধ্যাপিকা মিশেল ম্যাক্ আল্পিন-এর (১৯৮৩) "দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত : পশ্চিম ভারতে খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ১৮৬০-১৯২০" গবেষণা পুস্তক। এই যুক্তিধারা ভাল করে বোঝা দরকার কেন না সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার কারণে আমাদের অনুকরণপ্রিয়তা প্রবল এবং বোধহয় শীঘ্রই এই ধারার বশবর্তী দিশি হাতে অনুরূপ গবেষণা পয়দা হবে। ম্যাক্ আল্পিনের বক্তব্য মোটামুটি এই : (১) বৃষ্টিপাত, উৎপাদনের হার, জনসংখ্যা ইত্যাদি সংখ্যাতাত্ত্বিক ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন যে দুর্ভিক্ষের কারণ প্রাকৃতিক, অনাবৃষ্টি। (২) মহারাষ্ট্রে ১৮৬০-১৯২০ সালে ভূমি রাজস্বের প্রকৃতমূল্য ক্রমে কমেছে কারণ কৃষিপণ্যের মূল্য ক্রমাগত বেড়েছে। (৩) তাছাড়া ইংরেজ সরকার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কমিয়েছে ত্রাণ ব্যবস্থার দ্বারা। (৪) রেলপথ বাড়ার সংগে দুর্ভিক্ষের প্রভাব সংকুচিত হয়েছে এবং চাষীদের অর্থাগম হয়েছে। (৫) যেসব চাষীরা জমির মালিক তারা কৃষির বাজার বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের প্রসারের সংগে তাল রেখে সুবিধানুগ শস্য আবাদ করে, এবং আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, সামগ্রিক ভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি করেছে। এই উন্নতিতে নিশ্চয় ভূমিহীন শ্রমিকেরাও শরিক হয়ে থাকবে, কেননা, বর্দ্ধিষ্ণু চাষীর জমিতে ভূমিহীন মজুরের

কাজের সুযোগ এবং মজুরী নিশ্চয় বেড়ে থাকবে। (৬) ম্যাক্ আল্পিন স্বীকার করেন যে চাষীদের ঋণভার বেড়েছে কিন্তু সেটা স্বাভাবিক তো বটেই, এমনকি হয়ত চাষীদের সাচ্ছল্যের প্রমাণ কেননা তা না হলে ঋণ এত পায় কি করে।

এই প্রতিপাদ্যগুলির সমর্থনে সংখ্যাতাত্ত্বিক নানা কারুকৌশল দেখানো হয়েছে কিন্তু সংখ্যার ভিত্তিতে বড় রকম গলদ আছে। এবং দ্বিতীয় আপত্তির বিষয় হল যে অনেক তথ্য সঠিক হলেও তার দ্বারা সবসময় সিদ্ধান্তগুলি সমর্থিত হয় না। সংখ্যাতত্ত্বের পক্ষে একটা উদ্বেগের বিষয় এই যে ম্যাক্ আল্পিন ১৮৫৬ থেকে কৃষি উৎপাদন ইত্যাদির যে হিসেব দিয়েছেন সেটা নাকি সরকারি হিসেবের উপর "সংশোধন" (পৃঃ ২৬৫) করে, কিন্তু সংশোধন প্রণালী কোথাও লেখা নেই। তাছাড়া, দুর্ভিক্ষ কমিশনের মৃত্যুসংখ্যার হিসেব অগ্রাহ্য করে, রেজিস্ট্রিকৃত মৃত্যুর হিসেব দেখেছেন, যেটা জানা কথা প্রকৃত মৃত্যুর হারের নীচে। সমালোচকেরা আর একটা গোলমাল দেখিয়েছেন : তার হিসেব অনুসারে ১৮৫০-এর আগে ভূমিরাজস্ব মোট উৎপাদনের ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ ছিল এবং ১৯০০ নাগাদ ১০ থেকে ২০ শতাংশে নেমে আসে। ১৮৫০-এর আগে অত উঁচু হারে রাজস্বের সম্ভাব্যতা সন্দেহজনক ; সমালোচকদের মতে সম্ভাবনা প্রবল যে অনেক আবাদি জমি জরীপ ব্যবস্থা ও রাজস্ব বন্দোবস্তের বাইরে থেকে গিয়েছিল, অথবা আবাদের একর প্রতি উৎপাদন ১৮৫০-এর পূর্বে বেশী ছিল। দুটোই সম্ভাব্য এবং দুটোই ম্যাক আল্পিনের বিরুদ্ধে যায়। প্রথম সম্ভাবনা যদি সত্য হয় তবে আবাদের প্রসার হয়নি ১৮৫০-এরপরে—কেবল আবাদি জমি জরিপ হয়ে হিসেবের মধ্যে এল ; কিন্তু ম্যাক আল্পিনের বক্তব্য ১৮৬০-১৯২০ সালে আবাদ বেড়েছিল এবং সেটাই কৃষির উন্নতির প্রমাণ। দ্বিতীয় সম্ভাবনা যদি সত্য হয় তবে প্রতি একর উৎপাদন ১৮৬০-১৯২০ সালে কমেছে ; অর্থাৎ আবাদের প্রসার যদি হয়েও থাকে, প্রতি একর উৎপাদনের ক্রমাবনতির একটা অজানা বিভাজক কৃষিজ আয় কমিয়ে আনছে। অর্থাৎ ম্যাক আল্পিনের অনুমান ভুল যে আবাদি জমির বৃদ্ধি মানেই কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি।

আরও বড় সমস্যা হল যে ম্যাক আল্পিনের সিদ্ধান্তে যুক্তির ফাঁক আছে যখন তিনি বলেন যে বিংশ শতাব্দীতে কৃষির উন্নতি বিরাট গোছের হয়েছিল এবং আকালের যুগ শেষ হল "পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরীর দরুণ, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সুযোগের বিকাশের দরুণ, এবং ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার প্রচেষ্টার দরুণ।" পরিবহণের উন্নতি হলেই কি কৃষকের আয় বাড়ল ? ম্যাক আল্পিনের মতে রেলপথ মহারাষ্ট্রে আসায় কৃষকের 'অতিরিক্ত' শস্য বাজারজাত করার সুযোগ হল এবং "যদিও যথেষ্ট তথ্য নেই কৃষকদের কত দাম দেওয়া হ'ত, এটা ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত যে পরিবহণের খরচ কমার সঙ্গে কৃষকদেরও বেশী দাম দেওয়া হবে" (পৃঃ ১৪৯)। এখানে যা ধরে নেওয়া হল সেটা ঘটেছিল কিনা সন্দেহ আছে। কেননা কোন যুক্তিতেই বাজারজাত করার প্রক্রিয়ায় বণিকদের উড়িয়ে দেওয়া যায় না এবং বিশেষতঃ তাদের মধ্যে যারা চাষীকে দাদন বা ধার দিয়েছে শস্যের ক্রয়মূল্য তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। আমরা আগেই দেখেছি (অধ্যায় ৪), কাঁচা

তুলোর বাজারে এই নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও বিভিন্ন স্তরে মধ্যস্থ বণিকদের সংখ্যা ও খাঁই যথেষ্ট। নতুন তথ্য দাখিল না করাতে সাধারণ ভাবে কৃষকদের শ্রীবৃদ্ধির উপপাদ্য প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।

যদি বা তর্কের খাতিরে জমির মালিক কৃষকদের শ্রীবৃদ্ধি পরিবহণ, বাজার ইত্যাদির কারণে মেনে নিই আমরা, ম্যাক আল্পিনের পাঁচ নম্বর উপপাদ্য প্রমাণ হয় না। জমির মালিকানা সম্পন্ন কৃষকের শ্রীবৃদ্ধিতে কৃষি শ্রমিক শরীক হয়েছে তার প্রমাণ কি? ম্যাক আল্পিন শ্রমিকদের বেতনের কোনও তথ্য উপস্থিত করেননি। তার অনুমান যে নতুন ধরনের ফসলের দরুণ "সম্ভবতঃ মজুরদের শ্রমের চাহিদা বেড়েছিল, তাই তারাও কৃষিজ আয়ের বৃদ্ধির অংশ পেয়েছিল" (পৃঃ ১৫৮)। কিন্তু এটা অবশ্যম্ভাবী নয়। মনে রাখতে হবে যে ভূমিহীন শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ছে, সুতরাং যদি বা তাদের শ্রমের চাহিদা বাড়ে, যোগানও বাড়ছে, সুতরাং বেতন বাড়ার প্রবণতা কমবে বা নিবারণ হবে। তাছাড়া, যদি জমির মালিক কৃষকদের অবস্থা এতই উন্নতিশীল, তবে ভূমিচ্যুত হয়ে চাষীরা ভূমিহীন শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে কি কারণে?

এই সব সমস্যা হয়ত ম্যাক আল্পিনের চোখে পড়েনি কেননা তিনি ভূমিহীন শ্রমিকদের দিকে প্রায় তাকাননি, যদিও এরাই দুর্ভিক্ষের শিকার। ভূমিহীনদের বাদ দিয়ে তিনি আবাদের প্রসার ও নতুন কৃষিপণ্যের ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু খাজনা (রায়তওয়ারি এলাকাতেও উপসত্ব-ভোগী চাষী জমির মালিককে যে খাজনা দিত) এবং সুদ (যা ঋণগ্রস্ত চাষীর কাছ থেকে মহাজন কিংবা বর্ধিষ্ণু চাষী দাবী করে) নামক ব্যাপারগুলি যে কৃষকের আয়ের অংশ দাবী করছে সেটাকে বিশেষ আমল দেননি। ভূমিহীন চাষীকে মোটেও আমল দেননি। কেননা তার অনুমান এরা বড়লোক চাষীর সাচ্ছল্যের শরীক। নিঃসন্দেহে বর্ধিষ্ণু চাষী শ্রেণী তৈরী হচ্ছিল, কিন্তু তাই থেকে কৃষিজীবী সকলের অবস্থা সম্বন্ধে সামান্যীকরণ করা চলে না। এই পর্যন্ত ম্যাক আল্পিনের সঙ্গে একমত হওয়া চলে যে বর্ধিষ্ণু চাষীর আয়ের সঙ্গে তার ঋণ সংগ্রহ করার ক্ষমতা বাড়ে, সুতরাং সকলের ক্ষেত্রেই ঋণ মানেই আর্থিক দুর্গতি নয়। গরীব চাষীদের মধ্যে ঋণ জনপ্রতি পরিমাণে কম কেননা তার আয় ও সম্পত্তি কম, বন্ধক রাখার জমি কম, ধার শোধ করার ক্ষমতা সীমিত, সুতরাং মহাজন ধার বেশী দেবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল চাষীর ঋণভার তার আয় ও সম্পদের তুলনায় কত, এবং যে টাকা ধার করছে সেটা উৎপাদনে বিনিয়োজিত হয়ে ফিরে আসছে অথবা কেবল প্রাণধারণের জন্য খরচ হয়ে যাচ্ছে? বিভিন্ন শ্রেণীর চাষীর পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে বিভিন্ন ম্যাক আল্পিন সেদিকে নজর না দিয়ে রমেশ দত্ত ইত্যাদি যা বলেছেন তা উড়িয়ে দিতে পারেন না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ম্যাক আল্পিনের প্রতিপাদ্য বেশীর ভাগই ধোপে টেঁকে না, কেবল এক ও দুই নম্বর প্রতিপাদ্য স্বীকার করা চলে। রমেশ দত্ত ও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা অনেকেই ভূমিরাজস্বের ভার যে কালক্রমে আবাদের বিস্তার এবং উৎপাদনের মূল্যের তুলনায় কমতে পারে এই

সম্ভাবনাটাকে তেমন আমল দেননি। ম্যাক আল্পিন দেখিয়েছেন মহারাষ্ট্রে এটা ঘটেছিল বিংশ শতকের গোড়ায়। কিন্তু সেই প্রশ্নটা তিনি তোলেননি যেটা গুরুত্বপূর্ণ : রাজস্বের অনুপাত কমার ফলে কৃষকের হাতে পয়সা কতটা এল আর লাভের গুড় বেনে পিঁপড়েরা কতটা খেয়ে গেল—মহাজন, পাইকার, ফড়িয়া, তুলোর পাইকারি দালাল, ইত্যাদি। অপর প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ অনাবৃষ্টি যে দুর্ভিক্ষের একটা কারণ তা সকলেই, রমেশ দত্ত তো বটেই, স্বীকার করেন। সেটা তর্কের বিষয় নয়।

অধ্যায় ৬

ঔপনিবেশিক অবশিল্পায়ন ও কুটীর শিল্পের হাল

অবশিল্পায়ন বলতে বোঝায় শিল্পায়নের বিপরীত, শিল্পের অধোগতি। শিল্পায়নের লক্ষণ হল কৃষিকার্য থেকে উৎপন্ন জাতীয় আয়ের অংশের তুলনায় অনুপাতে শিল্পকর্ম থেকে উৎপন্ন অংশ বাড়ে, শিল্পকর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যা কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীত যদি হয়, অর্থাৎ যদি দেশের মানুষ শিল্পকর্ম ছেড়ে চাষ আবাদে জীবিকা অর্জন শুরু করে, অথবা জাতীয় আয়ে কৃষিজ অংশ বাড়তে আর শিল্পজ অংশ কমতে থাকে তাকে অবশিল্পায়ন (de-industrialisation) বলা চলে।

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিজ্ঞরা ইংরেজ আমলে এই অবশিল্পায়নের ধারার ওপর জোর দিয়েছিলেন, যথা রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, মদনমোহন মালব্য ইত্যাদি এবং রাজনীতিকদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বিলিতি কাপড় ছেড়ে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' পরা এবং গান্ধীর গ্রামীণ ও হস্তশিল্পের সম্বন্ধে উদ্যোগ ইত্যাদির পেছনে ছিল এই চিন্তা। অপরদিকে অনেক অর্থনীতিজ্ঞ; বিশেষতঃ বিদেশী যারা, অবশিল্পায়ন ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখেন ; একদল বলেন যে অবশিল্পায়ন আদৌ হয়নি, আরেক দল বলেন হয়েছিল কিন্তু তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি কেননা ভারত কৃষিপ্রধান দেশ আর শিল্পের প্রতিযোগিতায় পরাজয় অবধারিত ছিল।

১

প্রথমে দেখা যাক্ জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিজ্ঞদের যুক্তি। তারা তৎকালীন ইংরেজ আমলাদের প্রতিবেদন, বিদেশীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সরকারি অর্থনৈতিক তদন্ত ইত্যাদির ভিত্তিতে আঠেরো শতক অবধি কুটীর শিল্পের অবস্থা যা ছিল উনিশ শতকের শুরু থেকে তার ক্রমাবনতি দেখিয়েছেন। এই ধারার আলোচনা এত পরিচিত—যথা রোম সাম্রাজ্যের থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্য অবধি বাংলার উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্রের চাহিদা ইত্যাদি—পুনরাবৃত্তি বাহুল্য মনে করি। এই জাতীয় বর্ণনা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যাবর্জিত অর্থাৎ এর থেকে ঠিক হিসেব

করা যায় না অবনতি কতটা বিশেষ করে ভারতব্যাপী পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু সংখ্যাতাত্ত্বিক ভিত্তিতেও রমেশ দত্ত বা মদনমোহন মালব্য তাঁদের বক্তব্য দাঁড় করিয়েছেন। উনিশ শতাব্দীর শুরু থেকে আমদানি রপ্তানির হিসেবে দেখা যায় যে কুটীর শিল্পজাত শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি একদিকে কমেছে, অপরদিকে ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্যের আমদানি বেড়েছে। বিশেষতঃ সুতীর কাপড়ের আমদানির বাড় লক্ষ্যণীয় : ১৮৬০ সাল (মূল্য ৯৬ লক্ষ পাউণ্ড স্টরলিং) থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে (১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড) এবং ১৯০০ সাল নাগাদ (২৭ কোটি পাউণ্ড)। রমেশ দত্ত ইত্যাদি বলেন যে রপ্তানি কমা মানে দিশি শিল্প বিদেশী বাজার হারালো উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, এবং আমদানি বাড়ার অর্থ দেশের বাজার থেকেও দিশি শিল্পদ্রব্য উৎখাত হল।

এই অবশিল্পায়নে আমাদের বাবু আর কালা সাহেবদের অবদানও কম নয় ; ধনঞ্জয় রামচন্দ্র গাডগিল তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে উনিশ শতকে এঁরা কিভাবে সাহেবদের অনুকরণে বিলিতি কাপড় ও আমদানি শহুরে বিলাস দ্রব্যের দিকে ঝুঁকলেন যার ফলে দেশের উঁচুদরের ও শহুরে শিল্পগুলি বাজার হারালো ; বরঞ্চ গ্রামীণ শিল্পী শ্রেণী তাদের গরীব গ্রাম্য খদ্দেরদের কল্যাণে আরও বেশী টিঁকে ছিল। মোটামুটি ব্যাপার হল এই যে ভারত স্বকীয় শিল্পকর্ম হারিয়ে ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্যের বাজারে পরিণত হল, এবং কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে ইংলণ্ডের খামারের মত হয়ে টিঁকে রইল।

উনিশ শতকের এই ধারার পেছনের ইতিহাসটাও এক ঝলক দেখে নেওয়া ভাল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তো বটেই, অন্যান্য ফরাসী, ওলন্দাজ ইত্যাদি কোম্পানিগুলি প্রচুর ভারতীয় শিল্পদ্রব্য—যথা কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র, রঞ্জক নীল, নানা কুটিরশিল্পজ বিলাসদ্রব্য ভারত থেকে রপ্তানি করতো তাদের নিজ নিজ দেশে চাহিদা মেটাতে। এমন কি কোনো কোনো ভারতীয় শিল্পদ্রব্য এতই উঁচুদরের ছিল, যথা কিছু সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, যে ইউরোপের শিল্প প্রতিযোগিতায় না পেরে আইন করে ভারত থেকে সেসব জিনিস আনা বন্ধ করে দেয়। কিছু ঐতিহাসিক এমনও লিখেছেন যে ইংরেজ ভারতের শিল্প ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল—যথা বাংলার তাঁতীদের আঙুল কেটে তাদের বয়নে অপারগ করে দেওয়া। এটা বোধহয় সত্য নয় কেননা ইংরেজ কোম্পানির লাভের উৎস ছিল কারিগরদের উৎপাদন। ভারতের আসল বিপদ সেটা নয়। বিপদ হল এই যে সস্তায় ভারতে কিনে ইউরোপে বিক্রী করার লোভে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগুলি ক্রমাগত ভারতীয় কারিগরদের ওপর চাপ দিতে লাগলো—সস্তায় কাপড় দাও, কোম্পানির তাঁবে এসে থাকো, কোম্পানিকে ছাড়া আর কারোকে বিক্রী কোরো না, যদি এসব না কর তবে কোম্পানির লাঠিয়াল আর গোমস্তা আর সাহেবের গুঁতো খাও। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ দেখিয়েছেন যে মুক্ত বাণিজ্যের হোতা ইংলণ্ডের প্রতিভূ হওয়া সত্ত্বেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে গায়ের জোরে একচেটিয়া ব্যবসার ফাঁদে বাংলার তাঁতীদের আটকেছিল। এই অত্যধিক শোষণের ফলে তাঁতীদের অবস্থা

সংকটাপন্ন এবং তাঁত ব্যবসায় দিশি পুঁজির পাট সারা হল প্রায়। এর ফলে শিল্পের যে দুরবস্থা তার চেহারা হালে অনেক গবেষক দেখিয়েছেন—মাদ্রাজে (শরদা রাজু), অন্ধ্র প্রদেশে (রমন রাও), গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে (আর. ভি. চোকসি) এবং বাংলা বিহারে (হরিরঞ্জন ঘোষাল)। এমন সময় দ্বিতীয় আঘাত, ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের ধাক্কা এসে পড়ল। এখানে মনে রাখা দরকার যে ইংলণ্ডে আঠেরো শতকের শেষে শিল্পায়নে অগ্রগামী অংশ (leading sector) ইংরেজের কার্পাস বস্ত্রশিল্প ; কলের তৈরী সুতো আর কাপড় হস্তশিল্পের তুলনায় ততটা সূক্ষ্ম না হলেও প্রভূত উৎপাদিত হয়ে অনেক সস্তা, আর ইংরেজ এইসময় তার উপনিবেশগুলি থেকে সস্তায় কাঁচা তুলো আমদানি করতে পারতো। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক স্বার্থ আর ভারত থেকে সুতী ও রেশমী কাপড় ইত্যাদি আমদানি নয়, বরং ভারত থেকে কাঁচা মাল আমদানি ও সেখানে শিল্পদ্রব্য রপ্তানি। উনিশ শতকের মাঝখান থেকে, যে সময়ের কথা আমরা বলছি, তখনকার মূল ধারা এটাই।

২

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিজ্ঞ ও হালের ভারতীয় ঐতিহাসিকদের হাতে ভারতে অবশিল্পায়নের এই যে ছবিটা বেরিয়েছে তার বিরুদ্ধে নানা মত ইদানীং গবেষক মহলে পেশ হয়েছে পত্র-পত্রিকায়। বিরুদ্ধ মতগুলি মোটামুটি তিন ধরনের (১) অবশিল্পায়ন হয়ত হয়েছিল উনিশ শতকের গোড়ায় কিন্তু তারপর ভারতে কলকারখানা গড়ে উঠেছে এবং শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় অবশিল্পায়নের কোন প্রমাণ নেই ; (২) অবশিল্পায়ন মোটেও ঘটেনি ; (৩) অবশিল্পায়ন হয়েছিল বটে কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ (division of labour) কৃষি প্রধান ভারত ও শিল্প প্রধান ইংলণ্ডের মধ্যে হওয়াটা স্বাভাবিক ও উভয়ের পক্ষেই লাভজনক। আমরা এই মতগুলি গ্রাহ্য কিনা সংক্ষেপে দেখব।

প্রথম মতের প্রবক্তা ডেনিয়েল থর্নার। বক্তব্য এই যে ১৮৮১ থেকে ১৯৩১ অবধি ভারতীয় জনগণনার হিসেবে কৃষি ও শিল্পকর্মে নিয়োজিত মানুষের হিসেব থেকে প্রমাণ হয় না যে অবশিল্পায়ন চলেছিল। আপাত দৃষ্টিতে এমন মনে হতে পারে যে অবশিল্পায়নের প্রমাণ এই যে ১৮৮১ থেকে ১৯৩১ সালে কৃষিজ কর্মে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা বেড়েছিল (৭·১৭ কোটি থেকে ১০·০২ কোটি) এবং শিল্পে কমেছিল (২·১১ কোটি থেকে ১·২৯ কোটি)। আনুপাতিক ভাবে কর্মসংস্থানের হিসেবটা এই তিনটে বছরে দেখা যাক (মোট সংখ্যার শতাংশ হিসেবে) :—

এতে মনে হয় যে শতাংশের হিসেবে কৃষিকর্মে লোক বেড়েছে, শিল্পকর্মে কমেছে। বলে রাখা ভাল যে এসব হিসেবেও শিল্পকর্মের মধ্যে খনি ও নির্মাণ (construction) ধরা হয়ে থাকে, আর কৃষির মধ্যে ধরা হয়ে থাকে মৎস্যজীবী ও বনজ উৎপাদনে নির্ভর মানুষদের।

সারণি ৬·১ : কর্মসংস্থান (%), জনগণনার হিসেব

	১৮৮১		১৯০১		১৯৩১	
	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
কৃষিকর্ম	৬৫	৬৭	৬৮	৬৮	৭২	৭০
সাধারণ মজুরি	৯	১৫	৬	৯	৪	৮
শিল্পকর্ম	১৬	২৪	১১	১২	৯	৯
ব্যবসা	২	১	৫	৫	৬	৫
পরিবহণ	৮	৩	১০	৬	৯	৮

(আকর : ডেনিয়েল থর্নার 'ল্যাণ্ড এণ্ড লেবর ইন ইণ্ডিয়া')

প্রকৃতপক্ষে হিসেবটা থর্নারের মতে, অত সহজ নয়। এই মোটামুটি হিসেবটাকে তলিয়ে দেখে থর্নার দেখেন যে : (১) এই নারী কর্মীদের সংখ্যার হিসেব সমান নির্ভরযোগ্য নয় ; আদমসুমারি বা জনগণনার আমলাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে নারী কর্মীরা অনেকেই নামে মাত্র কামার কি কুমোর কি মুচি—জাত এবং নিজ নিজ স্বামীর পেশার অনুসরণে। সুতরাং নারী কর্মীর হিসেবটা অগ্রাহ্য করা চলে।(২) আদমসুমারিতে 'কৃষি মজুরি' এবং 'সাধারণ মজুরি' (general labour) পেশা হিসেবে ধরে যে ভাবে মানুষ গোণা হত সেটা কাজের নয় কেননা এই 'সাধারণ মজুরি' ব্যাপারটা অস্পষ্ট, মনে হয় মূলতঃ এটা কৃষিতে নিয়োজিত মানুষেরই আরেক নাম। জনগণনার সময়ে একেক সময় একেক ভাবে 'সাধারণ মজুরির' সংজ্ঞা ধরে বর্গীকরণ (classification) করা হয়েছে, যদিও প্রায় সব সাধারণ মজুরই কৃষিতেই নিয়োজিত। সুতরাং সাধারণ মজুর আর কৃষিজীবী নামক আদমসুমারির দুইটি বর্গকে যোগ করে এক ধরা যেতে পারে। (৩) থর্নার আদমসুমারির বর্গীকরণ সম্বন্ধে এটাও প্রস্তাব করেছেন যে 'শিল্পকর্মী' ও 'ব্যবসায়ী' বলে যে বর্গ বিভেদ করা হয়েছে সেটা কোন কাজের নয় এতটা সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ (division of labour) ভারতে ছিল না, বহু শিল্পকর্মী নিজেরাই বিক্রী করতো পথে হাটে বাজারে নিজেদের জিনিস। সুতরাং এই দুটি বর্গ যোগ করে এক ধরা যেতে পারে।

থর্নারের এই তিন দফা বর্গীকরণ বিষয়ক প্রস্তাব যদি মেনে নিই, ওপরের সারণির চেহারাটা বিলকুল বদলে যায়।

মজাটা লক্ষ্য করার মত : জনগণনার হিসেবে প্রথম সারণিতে দেখাচ্ছে ১৮৮১-১৯৩১ সালে কৃষিকর্মে ৬% (পুং) ও ১৩% (স্ত্রী) বৃদ্ধি, ও শিল্পকর্মে ৯% (পুং) ও ১৫% (স্ত্রী) হ্রাস। একই তথ্য ঢেলে সাজিয়ে দ্বিতীয় সারণিতে দেখাচ্ছে কৃষি ও সাধারণ মজুরির্তে ১৮৮১-১৯৩১ সালে মাত্র ২% (পুং) বৃদ্ধি এবং শিল্পকর্মে ও ব্যবসায়ে মাত্র ৩% হ্রাস। এই মজাটার জন্য থর্নারের বক্তব্য একটু

সারণি ৬-২
কর্মসংস্থান (পুরুষ) : শতকরা হিসেবে

	১৮৮১	১৯০১	১৯৩১
	পুং	পুং	পুং
কৃষিকর্ম ও সাধারণ মজুরি	৬৫+৯=৭৪	৬৮+৬=৭৪	৭২+৪=৭৬
শিল্পকর্ম ও ব্যবসা	১৬+২=১৮	১১+৫=১৬	৯+৬=১৫
পরিবহণ	৮	১০	৯

(আকর : ডেনিয়েল থর্নার, উল্লিখিত)

বিশদ লিখলাম। মোট কথা তাঁর মতে ১৮৮১ থেকে খুবই সামান্য অবশিল্পায়ন ঘটেছে।

এই মতের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে (ক) নারীকর্মীদের হিসেব অগ্রাহ্য করার নয়। এটা ঠিক যে জনগণনার কর্তারা ঐ হিসেবে ভুলের সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভুলের সীমা হিসেব করে সঠিক হিসেব বার করার চেষ্টা না করে থর্নার সমস্ত নারী সংক্রান্ত সংখ্যা অগ্রাহ্য করে আরও বড় ভুল করেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজে যদি শিল্প জাতীয় শ্রমের চাহিদা কমে তবে মেয়েরা প্রথমে কাজ হারিয়ে কেবল গৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত হয়; অর্থাৎ শিল্পে নারী কর্মীর সংখ্যা হ্রাস মোটেও অগ্রাহ্য করার নয়। (খ) কেবল শিল্প বা কৃষিকর্মে ক'জন জীবিকা অর্জন করছে এই আদমসুমারি অবশিল্পায়নের তর্কের শেষ কথা নয়। জন প্রতি উৎপাদন বাড়ে কমে কারিগরী (technological) পরিবর্তন অনুযায়ী এবং এই ভাবে কৃষি বা শিল্পের উৎপাদন বাড়তে বা কমতে পারে কর্মী সংখ্যার হিসেব যেমনই হোক্ না; এই উৎপাদনের হিসেবটা অর্থাৎ জাতীয় আয়ে শিল্পজ বা কৃষিজ আয়ের অংশ না জানলে পরে অবশিল্পায়ন সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। (গ) অবশিল্পায়ন ঘটেছিল মূলতঃ ১৮০০-১৮৬৫ নাগাদ, আর থর্নারের তথ্য ১৮৮০ সালের পরের যুগের সম্বন্ধে। এ কথা অবশ্য থর্নার নিজেও স্বীকার করেছেন।

৩

কিছু ঐতিহাসিক মরিস ডেভিড মরিসের অনুসরণে মনে করেন যে অবশিল্পায়ন আদৌ কখনও ঘটেনি, উনিশ শতকেও নয়। মরিসের যুক্তি : জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা শিল্পদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি মানেই অবশিল্পায়ন এই ভেবে ভুল করেছেন। যদি জনসংখ্যা আর জাতীয় আয় বাড়ে তবে দিশি শিল্প অক্ষুণ্ণ রইল আমদানিও বাড়লো—এমন হতে পারে। দ্বিতীয়ত, মরিস

দেখিয়েছেন যে শিল্পদ্রব্যের আমদানিতে যেমন এক দিশি শিল্পের ক্ষতি হতে পারে তেমন অন্য শিল্পের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। যেমন লোহার বাঁট (pig iron) আমদানি হওয়ায় খনিজ আকর থেকে লোহা তৈরী করবার শিল্পটা মারা গেল কিন্তু লোহার যন্ত্রপাতি ও তৈজস সামগ্রী ইত্যাদি তৈরীর কাজ কামারদের হাতে অনেক এল কারণ সস্তা আর প্রচুর লোহা বাজারে চললো ; অথবা উনিশ শতকের গোড়ায় সুতো আমদানিতে সুতো কাটুনিরা ঘা খেল কিন্তু তাঁতীরা সস্তায় সুতো পেয়ে সস্তা কাপড় বানাতে পারলো বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। এটাকে শিল্প আমদানির ক্ষতিপূরক প্রভাব (compensatory effect) বলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ মরিসের মতে অনেকগুলি প্রাচীন কুটীর শিল্প ম্যানচেসটর, বর্মিংহাম, শেফিল্ডের উৎপাদন আমদানি সত্ত্বেও বহাল তবিয়তে ছিল কেন না কুটীর শিল্পের বিশেষ নিজস্ব বাজার ছিল যেখানে বিদেশী প্রতিযোগিতা ছিল না। যেমন ধরা যাক দামী শাড়ী যেগুলি কলে তৈরী হয় না, অথবা পট্টবস্ত্র যেটা শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত হয়, অথবা মোটা কাপড় যেটা ম্যানচেসটর থেকে আমদানি করাটা পড়তায় পোষাতো না। এই সব ক্ষেত্রে কুটীর শিল্প টিকে গেছিল। তা না হলেও এতগুলি দশকের অবশিল্পায়নের পরও কুটীর শিল্পীরা বেঁচে ছিল কি করে ?

মরিসের যুক্তির গোড়ায় গলদ হ'ল, প্রমাণ কোথায় যে জনসংখ্যা ও মাথাপ্রতি গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে উনিশ শতকে বাজারের আয়তন বাড়ায়, আমদানি ও দিশি শিল্পদ্রব্য দুটোরই জায়গা ছিল, দিশি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ? তবে এই মূল যুক্তি অগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও মরিস একটা ছোটখাট প্রশ্নের আংশিক সমাধান দিয়েছেন, যেটা খুব নতুন নয় : প্রশ্নটা হ'ল কুটীর শিল্পগুলি কারিগরী অনগ্রসরতা, রাষ্ট্রের প্রতিকূলতা এবং আমদানি কলের তৈরী জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও টিঁকে ছিল কি করে ?

এই প্রশ্নের মরিসের উত্তর আমরা ওপরে দেখেছি। কিন্তু বোধ হয় উত্তরটা আংশিক। আসল ব্যাপার এই যে কুটীর শিল্পীর টিকে থাকার ক্ষমতার উৎস তার আর্থিক ক্রমাবনতি মেনে নিয়ে জাত ব্যবসায় লেগে থাকার ঝোঁক। এটার একটা কারণ জাতব্যবসার প্রতি আনুগত্য, আরেকটা হল জীবিকার্জনের অন্য রাস্তার অভাব, আর সবার ওপরে দেনাদায়ে জড়িত কুটীর শিল্পীর মহাজনের পদতলে পরাধীনতা। এই শেষের ব্যাপারটা শ্রেণীশোষণের সমস্যা, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদিদের চোখে তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বদ্ধ জলে কীটের মতন মহাজনি পুঁজি গজিয়ে উঠেছিল : উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিনিয়োগ না করে কেবল মহাজনি ও কেনা-বেচার ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারী এই পুঁজির লাভের একটা বড় উৎস কুটীর শিল্পীদের দাদন বা আগাম দিয়ে সুদের জালে আটকে রাখা আর তাদের উৎপন্নগুলিকে বিপণনের (marketing) রাস্তায় মধ্যবর্তী হয়ে লাভ উশুল করা। এই জাতীয় অনগ্রসর পুঁজিবাদের জালে আবদ্ধ কুটীর শিল্পী শ্রেণী দেনার সুদ মেটাতে সর্বদা ব্যস্ত, বিপণনের ব্যাপারে মহাজনের মুখাপেক্ষী বলে কম দামে

উৎপন্ন জিনিষ ছাড়তে বাধ্য, লভ্যাংশ সবই প্রায় মহাজনের হাতে যায় বলে পুঁজি জমাতে (Capital accumulation) অসমর্থ, এবং পুঁজির অভাবে চিরস্থায়ী ভাবে মহাজনের অধীনতায় থাকতে বাধ্য। কুটীর শিল্প কেন টিকে থাকে তার নানা উত্তরের মধ্যে এটাই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মরিস এ বিষয়ে নীরব।

৪

সবশেষে দেখা যাক আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গী, যেটা উনিশ শতকের গোড়ায় রিচার্ড কবডেন, জন ব্রাইট প্রমুখ চিন্তানেতা থেকে আধুনিক যুগে স্যার থিয়ডর মরিসন এমনকি লর্ড জন মেইনর্ড কেইনস্ অবধি সমর্থন করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়ার কথা হ'ল, অর্থনৈতিক অগ্রগমনের রাস্তা শ্রম-বিভাজন (division of labour)। যেমন নানা লোক একেক কাজে লাভজনক বিশেষজ্ঞতা অর্জন করে শ্রম বিভাজনের ফলে, যেমন ইংলণ্ডের দক্ষিণে চাষ ও পশুপালন আর উত্তরে কলকারখানা বানিয়ে যদি স্থানীয় শ্রমবিভাজন লাভজনক হয়, তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ শ্রমবিভাগ লাভজনক হতে বাধ্য। যে যে দেশের বা প্রদেশের যেই জাতীয় উৎপাদনে (কৃষি বা শিল্প) স্বাভাবিক সুযোগ আছে সেই জাতীয় উৎপাদনে নিয়োজিত হলে পরে, নিয়োজিত পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি সবচেয়ে বেশী লাভ বাণিজ্যবিনিময়ের দ্বারা উশুল করতে পারে। তাই যদি হয় তবে ইংলণ্ড শিল্পপ্রধান ও ভারত জাতীয় উপনিবেশ কৃষিপ্রধান হ'লে শ্রম বিভাগের নীতি অনুসারে উভয় পক্ষের লাভ। এক কথায় একে বলে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) যার মূলে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ (international division of labour)।

ব্যাপারটা কি এত সহজ? অ্যাডাম স্মিথের ১৭৭৬ সালের বিখ্যাত বই 'ওয়েল্‌থ্ অফ নেশনস্' এর সময় থেকে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে শ্রমবিভাগ অর্থনৈতিক অগ্রসরে অপরিহার্য। প্রশ্ন হচ্ছে পরাধীন ও প্রভুত্বকারী দেশের মধ্যে শ্রমবিভাগ আর কামার এবং চাষী, কিংবা ল্যাংকাশয়ের এবং এসেক্স প্রদেশের মধ্যে শ্রমবিভাজন কি একই ব্যাপার? যদি অনেক দেশের অনেক লোক কৃষিপণ্য বেচে বিশ্বের বাজারে, আর একটা কি মাত্র কয়েকটা দেশের কারখানার মালিকরা সেগুলি কেনে, তবে ন্যায্য দাম পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ থাকতে পারে কি? যেখানে কারখানা মালিকের রং সাদা আর কৃষিপ্রধান দেশের সরকারি কর্তারাও সাদা, তখন সরকারি চাপে বাণিজ্যের খেলায় কালা আদমিদের ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা কি নেই? সবচেয়ে বড় কথা, যদিই বা আমরা ধরে নিই যে কৃষিপণ্য বেচে কৃষিপ্রধান উপনিবেশ যা শিল্পদ্রব্য দরকার সব আমদানি করার রেস্ত পাচ্ছে তবু উপনিবেশের মানুষ পাবে না শিল্পায়নের সুদুর প্রসারী বিকাশমুখীন প্রভাব—কারিগরী কুশলতা জনন, নবোন্মেষশালী ব্যবসায়ী উদ্যম, প্রত্যেক শিল্পজ দ্রব্যের উৎপাদনের চারিদিকে অন্য উৎপাদন ও উদ্যোগের সূচনা (linkage effect), সর্বোপরি উৎপাদনে দেশীয় স্বনির্ভরতা।

এই সব যুক্তি জাতীয়তাবাদী নেতারা বার বার দিয়েছেন। কিন্তু ঐ আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগবাদ কৃষিনির্ভর উপনিবেশ ও শিল্পসমৃদ্ধ ইংলণ্ডের মধ্যে শ্রম বিভাগ—ইংরেজ শাসকদের বইয়ের পাতায় ছাড়াও স্বার্থের শিকড়ে জড়িয়ে ছিল এমন ভাবে যে এই নীতি অবাধ-নীতি (laissez faire) নামে রাষ্ট্রনীতির সর্বস্তরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা শেষ পরিচ্ছেদে করা যাবে।

নানা ভাবে ভারতের প্রাচীন কুটীর শিল্পের অবনতির প্রশ্নটা বারে বারে ফিরে আসে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে এই অবশিল্পায়ন ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উদঘাটন করেছিল। প্রবল শিল্পোন্নতির ক্ষুধা উঠতি মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়ী মহলে বিশ শতকের গোড়ায়—তাই সাবেক কালের উন্নত শিল্পের অবস্থা, তার দেশে বিদেশে চাহিদা, তার থেকে বহির্বাণিজ্যে প্রভূত সোনা রূপা আয়—এই ছবিটা ক্ষুধিতের মনে অন্নের স্বপ্নের মত বার বার ফিরে আসতো। এর মধ্যে কিছুটা অবাস্তবতা ছিল—প্রাচীন শিল্প উদ্যোগ কারিগরি কৌশল ইত্যাদির মধ্যে, প্রাক্ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের চারা দেখতে পাওয়া যায় না একথা ইরফান হবিব প্রমুখ বেশীর ভাগ বিশেষজ্ঞ মেনে নেন। কিন্তু, অবশিল্পায়নের ইতিহাস, শিল্পায়নে উন্মুখ দিশি পুঁজির প্রবক্তা জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিজ্ঞদের চিন্তায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর মধ্যে আবার গান্ধীবাদে শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামীণ শিল্পের পুনর্জীবন, স্বরাজ আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে চরকা আর খাদি কাপড়কে মূল্য দেওয়ার ঐতিহ্য—এই সব কারণে কুটীর শিল্প একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। অপরদিকে মার্কসীয় চিন্তাধারাতেও অবশিল্পায়নের ব্যাপারটা বেশ বড় জায়গা নিয়েছিল—মার্কসের ১৮৫৭ বিদ্রোহের সময়ের প্রবন্ধাবলী থেকে শুরু করে ১৯৪৭-এর রজনী পাম দত্তের বইতে এবং তার পরে তাঁর উত্তরসূরী লেখকদের চিন্তায়। প্রাক্-ঔপনিবেশিক গ্রামের স্বনির্ভরতা, গ্রামীণ অর্থনীতিতে শিল্প ও কৃষির মিলন পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক আমলে শিল্পদ্রব্য ও রেলপথের আমদানির ফলে এই মিলনের অবসান, ইত্যাদি ধারণাগুলি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে নেহরু ইত্যাদিকে প্রভাবিত করেছিল। অর্থাৎ অবশিল্পায়নের ধারণাটি বাম ও দক্ষিণ দুই জাতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারাতেই গুরুত্ব পেয়েছে। অপরপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে অবশিল্পায়ন ধারণাটি ও তার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান। তাই বিষয়টি বহু বিতর্কিত।

অধ্যায় ৭

এ দেশে বিদেশী পুঁজি

ভারতে ঔপনিবেশিকতার স্বরূপ বুঝতে গেলে এ দেশে বিদেশী পুঁজি কত এলো গেলো তার গাণিতিক হিসেব কেবল দরকার নয়, সেই পুঁজির অর্থনৈতিক চরিত্র কেমন সেটার গুণগত মূল্যায়ন করা দরকার। ইংলণ্ডের পুঁজিপতিদের স্বার্থ ও সাম্রাজ্য নিয়ে আলোচনা বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ছড়িয়ে আছে। আর সরকারী নীতি সম্বন্ধে আলোচনা পরের এক পরিচ্ছেদে, কেননা এটা ঔপনিবেশিকতার মৌলিক উপাদান যেটা নানা চেহারায় সমগ্র অর্থনীতিতে ছড়িয়ে আছে। অবশিল্পায়নের দ্বারা ভারতে শিল্পদ্রব্যের বাজার দখল করতে, কৃষিপণ্যের বাণিজ্যে কাঁচামালের যোগান বজায় রাখতে, বাণিজ্যশুল্ক ও অন্যান্য সরকারী নীতি ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের স্বার্থ-প্রভাবিত রাখতে, ইত্যাদি ব্যাপারে ইংরেজ পুঁজিপতিদের কাণ্ডকারখানা অন্যত্র দেখেছি। এখানে প্রথমে আমরা দেখব এদেশে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের কি হিসেব পাওয়া যায়।

আমরা আগেই দেখেছি যে সবচেয়ে আধুনিক গবেষণা অনুসারে ইংলণ্ডের পুঁজির বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগের মানচিত্রে এশিয়ার স্থান আনুপাতিক হিসেবে ইউরোপ ও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের চেয়ে অনেক কম। সারা পৃথিবীতে বিনিয়োজিত ইংরেজ পুঁজির মাত্র ১৪% এশিয়াতে এসেছিল এবং ৪০% বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে। এটাও দেখেছি যে এর মানে কিন্তু এই নয় যে এশিয়া তথা ভারত ইংলণ্ডের পুঁজির স্বার্থের হিসেবে ওজনে কম ছিল, উনিশ শতকে তো নয়ই। ভারত সম্বন্ধে যে হিসেব পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে লেলান্ড জেংক্স্ অনুমান করেন যে ১৮৫৪-১৮৭০ সালে পনেরো কোটি পাউণ্ড স্টারলিং ভারতে বিনিয়োগ হয়, তার অর্ধেক রেল কোম্পানিতে। এটা খুব সূক্ষ্ম হিসেব নয়। ১৯০৯-১৯১০ সালে ভারতে (বর্তমান বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, বর্মা সমেত) ইংরেজ পুঁজির একটা হিসেব স্যর জর্জ পেইশ করেন।

এই হিসেবের মধ্যে ধরা উচিত ছিল কিন্তু বাদ গেছে এইসব পুঁজি ; ইংরেজদের ভারতে অর্জিত অর্থ যা ভারতে ইংরেজ কোম্পানীতে বিনিয়োজিত, শেয়ার বাজার মারফত নয় ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজ যে টাকা খাটিয়েছে সওদাগরি

সারণি ৭·১

ভারতে বৃটিশ পুঁজির বিনিয়োগ (লক্ষ পাউণ্ড স্টারলিং)

১৯০৯-১৯১০

সরকারি ও মিউনিসপল ঋণ	১৮২৪
রেল কোম্পানি ও অন্য পরিবহণ	১৪১৫
বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল, টেলিফোন কোম্পানি	২৭
খনিজ ও পেট্রোল	৭৪
চা, কফি, রাবার বাগিচা	২৪২
সওদাগরি কোম্পানি এবং কারখানা	২৬
ব্যাঙ্ক	৩৪
বিবিধ কর্জা, জমি ইত্যাদি	১৮
মোট	৩৬৫৩

(আকর : জর্জ পেইশ, গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য)

কিংবা ব্যাঙ্ক কোম্পানিতে, অথবা জাহাজ কোম্পানি, বীমা কোম্পানি ইত্যাদি। কাজেই এই হিসেব কমের দিকে।

পেইশ-এর হিসেবের সুবিধা এই যে বিনিয়োগ কি প্রকৃতির, মানে শিল্প কি সওদাগরি, কি সরকারী ঋণ ইত্যাদি, টের পাওয়া যায়। এই সারণিতে দেখা যায় যে বিদেশী পুঁজির প্রবণতা হচ্ছে এমন সব বিনিয়োগ যেগুলি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক, বিশেষ শিল্পায়ণের বিকাশে তেমন সাহায্য করে না, যেগুলি রপ্তানী এবং বিদেশী চাহিদার মুখাপেক্ষী, এবং অনেকসময় কেবল এই অর্থে বৈদেশিক স্বার্থ নয় সরাসরি ভাবে বৃটিশ ভারত সরকারের আনুকূল্যে। এই উনিশ শতকীয় ধারার পরিণাম ; শিল্পদ্রব্য নির্মাণের কারখানায় বিনিয়োগ নগণ্য। প্রায় অর্ধেক পুঁজি বৃটিশ ভারত সরকারকেই ঋণ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৩৯% পুঁজি গেছে রেল কোম্পানিতে যেগুলি সরকারের সঙ্গে চুক্তির ফলে বাঁধা পাঁচ শতাংশ হিসেবে সুদ পায়, ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও। তারপর চা বাগিচা ইত্যাদিতে ৭% পুঁজি, এবং কয়লা পেট্রোল ইত্যাদি নিষ্কাশনে ২% বিনিয়োগ। এদেশে কয়লাখনি কি চা বাগিচা, কি পাট তুলো রপ্তানি করতে আসা ইংরেজ কোম্পানির লাগে ব্যাঙ্ক, সওদাগরি অফিস, বীমা, শহরের জন্য বিদ্যুৎ কি টেলিফোন—এই সব আনুষঙ্গিক ব্যাপারে সামান্য পুঁজি লাগে।

এর পর ১৯২৯ সালে ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, ফিণ্ডলে শাইরস, এবং ভি কে আর ভি রাও নিজ নিজ পদ্ধতি অনুসারে বিদেশী পুঁজির হিসেব করেন। এরমধ্যে তৃতীয়টাই নির্ভরযোগ্য।

সারণি ৭·২
ভারতে বিনিয়োজিত বিদেশী পুঁজি, ১৯২৯
(লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং)

সরকারি ঋণ ও রেল কোম্পানি	৩৩৯৪
মিউনিসিপলিটি ও পোর্ট ট্রাস্ট	১৩০
ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত কোম্পানি	৪২৫
ভারতে ব্যবসা, কিন্তু বিদেশে রেজিস্ট্রীকৃত কোম্পানি	১৬৭৭
অন্যান্য	৮০৯
মোট	৬৩৭৫

(আকর : ভি. কে. আর. ভি. রাও, গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য)

অন্যান্য বিনিয়োগের মধ্যে এখানে ধরা হয়েছে বিদেশী লগ্নী ভারতীয় সিকিউরিটিতে, জমির মালিকানায়, একক বা যুক্ত মালিকানায় প্রাইভেট কোম্পানিতে এবং সেইসব ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিতে যেগুলিতে ব্যবসার অংশ মাত্র ভারতে (অংশের হিসেব আন্দাজ করা)। অধ্যাপক রাও-এর আর পেইশ সাহেবের হিসেব দুটি তুলনা করা শক্ত। মোট অঙ্ক বিশ বৎসর পরে অনেক বেশী দেখাচ্ছে, কিন্তু এর কারণ বোধহয় হিসেবের পদ্ধতির পার্থক্য, বিশেষভাবে যেহেতু রাও ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানি, বিদেশী বীমা কোম্পানি ইত্যাদির পুঁজি হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে দেখা যায় যে সরকারকে পাউন্ড-স্টার্লিং-এ ঋণদান এবং সরকার সমর্থিত রেল কোম্পানি এবং প্রায়-সরকারী মিউনিসিপাল ঋণ ইত্যাদিতে অর্ধেক পুঁজি। আরেকটা লক্ষ করার জিনিস যে পেইশ যেটা হিসেব থেকে বাদ দিয়েছিলেন, ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানিতে বিদেশী পুঁজি, কম নয় ; আর মোটা পুঁজি বিদেশী কোম্পানি যাদের ব্যবসা ক্ষেত্র ভারত।

এই জাতীয় হিসেব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ হয় না। সরকারের সহযোগিতায় সুষ্ঠু অনুসন্ধান হয় স্বাধীনতার পর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা ১৯৪৮ সালে।

আমাদের প্রথম সারণি থেকে চার দশক পরে কিছুটা বদল দেখা যায়। প্রায় ২৮% শিল্পদ্রব্য নির্মাণে—বেশীর ভাগ তামাক পেট্রল, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, পাটকল, বাদামতেল ইত্যাদি খাদ্যপদার্থ, ঔষধ ইত্যাদি। ২৫% সওদাগরি অথবা বিশুদ্ধ কেনা-বেচা ব্যবসায়ে, ২০% চা কফি ইত্যাদি বাগিচায় যাকে শিল্প বলা শক্ত। বাকী পরিবহণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, খনিজ নিষ্কাশন ইত্যাদিতে বিনিয়োজিত।

যদিও দেখা যায় যে ১৯৪৮ সালে শিল্পে বিনিয়োগ বেড়েছে, উনিশ শতকীয় খাস ঔপনিবেশিক ধারায় পুঁজি বিনিয়োগের প্রবণতা অব্যাহত আছে ; অপর এক

সারণি ৭·৩

১৯৪৮ সালে ভারতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ, ব্যাঙ্ক বাদে, (কোটি টাকায়)

শিল্পদ্রব্য নির্মাণ	৭১৯
সওদাগরি	৬৪৩
পরিবহণ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি	৩১২
খনিজ নিষ্কাশন	১১৫
চা, কফি, রাবার বাগিচা	৫২৩
অন্যান্য	২৪৬
মোট	২৫৫৮

(আকর : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য)

হিসেব অনুসারে ১৯৪৮ সালে বিদেশী পুঁজির ৭৪% বিনিয়োজিত রপ্তানিমুখীন ব্যবসায়ে আর ২৬% মাত্র ভারতীয় বাজারের জন্য। তাছাড়া শিল্প বলতে বিদেশী পুঁজিপতিরা কখনই ভারী শিল্পের ছায়া মাড়ায়নি, বেশীর ভাগ কৃষিজ দ্রব্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে।

২

সুতরাং দেখা গেল যে ভারতে বিদেশী পুঁজি ঔপনিবেশিক ধাঁচের—যেটা অন্য উপনিবেশেও দেখা যায় পূর্ব এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা কি দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক দেশে : (১) রেল কোম্পানী জাতীয় পরিবহণে বিনিয়োগ যাতে দেশের বাজারে শিল্পদ্রব্য আমদানী ও বিদেশে কাঁচামাল রপ্তানির রাস্তা খোলে, (২) প্রকৃতির দান, যথা খনিজ, এবং বিশেষ বাগিচা উৎপাদন, যথা চা রবার কফি, দেশ থেকে রপ্তানি করা, (৩) সওদাগরি কারবার, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ইত্যাদি যা লাগে বহির্মুখীন ব্যবসা চালু রাখতে, (৪) সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থাকে ঋণ দান, এবং (৫) সবশেষে হাল্কা কিছু শিল্প যেগুলি অনেক সময়েই রপ্তানিযোগ্য।

ইংরেজ পুঁজির কাজই হচ্ছে তাদের দেশের জোয়ালে উপনিবেশটাকে লাগানো। এখানে দুটি প্রশ্ন ওঠে। আরো বিদেশী পুঁজি আসে নি কেন ? আর যা এসেছিল তা বোম্বাইয়ের কি আহমেদাবাদের সুতিকল কিম্বা জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানা গোছের কারবারে কেন গেল না ?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর অমর্ত্যকুমার সেন দিয়েছেন এইভাবে : হয়ত গোড়ায় লাভের হিসেব করে সাহেবরা চা কফি কিম্বা কয়লা কিম্বা পাটকলে টাকা ঢেলেছে। কিন্তু কেবল লাভের হিসেব যদি মূল কারণ হতো তবে যখন যথেষ্ট পুঁজি ভারতীয় সুতিকল কিম্বা ইস্পাত কারখানায় টেনে নিচ্ছে তখন ইংরেজদের

পুঁজিও সেখানে বিনিয়োগের যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু তা তেমন হয়নি। কেননা, কেবল লাভের লোভ নয়, সমষ্টিগতভাবে ইংরেজ পুঁজিপতিদের অভিলষিত উদ্দেশ্যের মধ্যে এটাও ছিল যে তাদের স্বদেশী শিল্প যেন মার না খায়—অন্তত তাদের নিজের দেশের শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না ঘটে। ভারতে সুতিকাপড় কল বানানোতে ইংরেজ পুঁজি আসেনি কেননা ম্যানচেস্টারে ইতিমধ্যেই জোরালো বস্ত্রশিল্প তৈরী হয়েছে ; অনুরূপভাবে ভারতে ইস্পাত কারখানা বসাতে ইংরেজ কেন যাবে ? একটা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ঘটেছিল—ডান্ডিতে বৃটেনের পাটকলের কেন্দ্র আর কলকাতার কাছেই বৃটিশ পুঁজিতে তৈরী পাটকল দেখা যায়। তবে এটার কারণ বোধহয় এই যে পাটশিল্প এই দুই জায়গায় একই সময় গজিয়ে ওঠেনি, যখন স্কটল্যান্ডের সাহেবরা হুগলীর ধারে পাটকল তৈরীতে ব্যস্ত তখনও ডাণ্ডিতে পাটশিল্প জাঁকিয়ে বসে নি। সুতরাং বলা চলে যে নিজ দেশের শিল্প বা পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতা এড়ানো ইংরেজ পুঁজির বিনিয়োগ সংস্থানের একটা মূল উপাদান।

বিদেশী পুঁজি আরও বেশী ভারতে আসেনি কেন ? প্রথমেই বলা দরকার যে বিদেশী পুঁজির হিসেবে, বিশেষ করে উনবিংশ শতকে, একটা বড় ভাগ ধরা পড়ে না— যা যেভাবে হোক হাতিয়ে এদেশেই ইংরেজ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছে। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন কি করে উনবিংশ শতকের প্রথমে ইংলন্ড থেকে টাকা না এনে এখানকার টাকায় ব্যবসা চালানো সাধারণ রীতি ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরেদের এবং স্বাধীন (free merchants) ব্যবসাদারদের। ক্লাইভের আমল থেকে কোম্পানীর চাকুরেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লাভ, ঘুষ, লুঠের মাল, এইসব জমা হত ইংরেজ এজেন্সি হাউসের হাতে—পরে এই এজেন্সি হাউসগুলোই কলকাতার বিরাট ম্যানেজিং এজেন্সিতে পরিণত হয়। এটা হল এদেশে সঞ্চিত টাকা বিদেশীর হাতে। যদি মাছের তেলে কতটা মাছ ভাজা হয়ে যায়, তেলের হিসেবে গোলমাল হবেই। তবে এটা সত্য যে দক্ষিণ আফ্রিকা কি কানাডা কি অস্ট্রেলিয়া জাতীয় অন্য বিদেশী উপনিবেশের তুলনায় ভারতে কমই বৃটিশ পুঁজি এসেছে বৃটেন থেকে। তার সবচেয়ে বড় কারণ চাহিদার অভাব : ভারতের অনগ্রসর অবস্থায়, গরীবদেশে কম চাহিদা, পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ কোথায় ? তাছাড়া বিদেশী পুঁজি ভারতে শিল্পে বিনিয়োজিত না হওয়ার বড় কারণ অবাধ বাণিজ্য নীতি। ভারতে আমদানি শুল্কের ছায়ায় শিল্প জন্মাতে, বাড়তে পারার ততটা সুযোগ পায়নি। (অন্তত ১৯৩০-এর দশক অবধি), যখন কমনওয়েলথ্-এর কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি স্বাধীনতা পেয়ে সেদিকে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। এর ফলে শিল্পায়নে পুঁজি গেছে সেইসব দেশে যেখানে আমদানি শুল্কের মাধ্যমে শিল্প সংরক্ষণ নীতি রয়েছে।

অধ্যাপক অমিয় বাগচী প্রমুখ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন যে বিদেশী পুঁজির আধিপত্য ঠিক তার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নয়—এই আধিপত্যের মূল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির গঠন এবং শাসন ব্যবস্থার মধ্যে

রয়েছে। ইংরেজ ব্যবসায়ী শ্রেণী নানাভাবে একচেটিয়াগিরির পত্তন করেছিল, বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত পূর্ব ভারতে। (১) কলকাতার ইংরেজ বণিক সমিতি (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স) এবং কিছু ব্যবসায়ী সমিতি (যথা চটকল মালিকদের ইন্ডিয়ান জুট মিল্‌স্ এসোসিয়েশন, চা বাগিচায় টি প্লান্টার্স এসোসিয়েশন) মালিকদের মধ্যে ষড় করে কাঁচামালের দাম আর বেতনের হার কমিয়ে, কম উৎপাদন করে বাজার দর চড়িয়ে, অর্থাৎ সমষ্টিগত ভাবে একচেটিয়া ব্যবসার সুবিধা করে নিয়েছিল। (২) সমিতিগুলির সভ্যরা উঁচুপদের ইংরেজ সরকারী আমলাদের সঙ্গে তাদের সামাজিক আদান প্রদান, সরকারীনীতিকে প্রভাবিত করতে কাজে লাগিয়েছিল। বিশেষভাবে তারা বহির্বাণিজ্যের শুল্কের ব্যাপারে, সস্তায় চা বাগানের জন্য জমি, শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন আটকানো, চা বাগানের জন্য আদিবাসী কুলি আমদানি সরকারী সহযোগিতায়, এসব ব্যাপারে খুব এলেম দেখিয়েছে। (৩) একচেটিয়াগিরি কায়েম হওয়ার একটা কারণ হল ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থা। এন্ড্রু ইউল, শ ওয়ালেস, ডানকান ব্রাদার্স, অক্‌টেভিয়াস স্টিল, বর্ড কম্পানী ইত্যাদি সাতটা বড় এজেন্সি চা, কয়লা, আর পাটকল কোম্পানীতে যথাক্রমে ৬১%, ৪৬% এবং ৫৫% কোম্পানীকে নিয়ন্ত্রণ করত। বড় ম্যানেজিং এজেন্সির কর্তা কয়েকজন অনেকগুলি কোম্পানীর ডিরেক্টর হিসেবে কাজ চালাতেন; বিশেষ করে ব্যাঙ্কে তাদের ডিরেক্টর হিসেবে থাকাটা নিজ ব্যবসার পক্ষে খুব সুবিধাজনক হত। (৪) ব্যাঙ্কের গোড়াপত্তন থেকেই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে কেবল সাদা আদমীদেরই আধিপত্য ছিল। দিশি ব্যাঙ্কগুলির পুঁজি কম ছিল— ১৯১০ সালে পর্যন্ত দেশের সব ব্যাঙ্কে আমানত মোট টাকার মাত্র এক-পঞ্চমাংশের মতন ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে গচ্ছিত। বিদেশী মুদ্রায় কারবার করার ক্ষমতা একটিও ভারতীয় পরিচালনাধীন ব্যাঙ্কের ছিল না। ফলতঃ বহির্বাণিজ্যে নিয়োজিত দিশি ব্যবসায়ী শ্রেণীর অসুবিধা হত। ১৯৩১ সালে স্বয়ং ঘনশ্যাম দাস বিড়লা সরকারের ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটির কাছে অভিযোগ করছেন দেখা যায় এ বিষয়ে—এবং এটাও যে ইম্‌পিরিয়ল ব্যাঙ্কের এজেন্ট শেঠ বিড়লাকে বসতে কুরসি দেয়নি! অপরপক্ষে সাদা চামড়ার ব্যবসাদারেরা ব্যাঙ্ক লোন, বিদেশী হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ইত্যাদি ব্যাপারে সুবিধা পেত। (৫) বহির্বাণিজ্যে এই কারণে, এবং জাহাজ কোম্পানীগুলি ইংরেজের একচেটিয়া বলে, বিদেশী আধিপত্য কায়েম হয়েছিল। সিন্ধিয়া কোম্পানী জাতীয় ছোট দু-একটা দিশি জাহাজ কোম্পানী বহু কষ্টে কেবল করাচী থেকে রেঙ্গুন উপকূলের মাল বহন ব্যবসায়ে নেমেছিল। বড়গোছের আমদানি রপ্তানি ব্যবসা মূলত ইংরেজ সওদাগরি কোম্পানির হাতে ছিল, অন্তত ১৯৩০-এর দশক অবধি।

পূর্বভারত ও তার কেন্দ্রস্থল কলকাতা এই অবস্থায় থাকলেও ইংরেজ পুঁজির এই আধিপত্য পশ্চিম ভারতের পক্ষে ততটা সত্য নয়। মারাঠাদের বহুদিনের সংগ্রামের ফলে মহারাষ্ট্রের অনেক এলাকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সামিল হয়েছে বাংলার তুলনায় অনেক পরে সুতরাং কম সময় ইংরেজ শোষণ ও শাসন ভোগ

করেছে। চীনে আফিং চালান, ইংলণ্ডে তুলো চালান ইত্যাদি ব্যবসায়ে পার্শি ও গুজরাটি বণিকেরা উনবিংশ শতক থেকেই তালিম পেয়েছে, ১৮৬০-৬৪ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ চলাকালীন তুলোর তেজী বাজারের সুযোগে পুঁজি সঞ্চিত হয়েছে। এসব নানা কারণে দিশি ব্যবসায়ী শ্রেণী সতেজ। বোম্বাই বণিক সমিতিতে তারা ইংরেজদের সমকক্ষ, আইনসভা ইত্যাদিতে তারা প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে ১৯১৯ সাল থেকে, বোম্বাই আমেদাবাদে তারা সুতি কাপড়ের কারখানা খুলে এদেশেই ইংরেজদের টেক্কা দিয়েছে এবং মানচেস্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে এবং তাদেরই একজন জামসেদ নসেরওয়ানজি টাটা ইস্পাত কারখানা তৈরী করে প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে ভারত সরকারকে যোগান দিয়েছে। তবে বোম্বাই একটা ব্যতিক্রম কলকাতা মাদ্রাজ করাচি কানপুরের তুলনায়।

৩

মোটকথা বোম্বাইয়ের ব্যতিক্রম বাদ দিলে সর্বভারতীয় ছবিটা এই যে বিদেশী পুঁজির আধিপত্য অন্ততঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবধি কায়েম ছিল। ওলন্দাজ কোন অর্থনীতিবিদ ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক অবস্থা বর্ণনা করতে বলেছেন যে একটা দোতলা অর্থনীতি তৈরী হয়েছিল। এই ছবিটা ভারতের পক্ষেও উপযোগী। উপরের তলায় জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলি, শেয়ার বাজার ম্যানেজিং এজেন্সি, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি, বিলিতি জাহাজ, আমদানি-রপ্তানির সওদাগরি অফিস, ডবল এন্ট্রি হিসেব, বণিক সমিতি, গভর্ণরের বাড়ি ভোজ, সাদা চামড়াদের ক্লাবে সিফারিস অনুগ্রহের আদান-প্রদান—এই এলাকায় ইংরেজ পুঁজির আধিপত্য। নীচের তলাটা দিশি : ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট ব্যবসা, ব্যাঙ্কের জায়গায় মহাজন ও অন্যান্য কুসীদজীবী, ম্যান্‌চেসটরের কাপড় ও সুতো বিক্রী, কাঁচামালের রপ্তানির খুচরা ও পাইকারি কারবার, পাইকার ফড়ে আড়ৎদারের ভীড়, মোদী অক্ষরে হিসেব আর রোকড় বহি, বেনে পঞ্চায়েত, আর সাহেবদের কাছে পিটিশন।

অনেকসময় এই দোতলা – একতলার পার্থক্যটা অর্থনীতির ব্যবস্থাবদ্ধ ও অব্যবস্থ অঙ্গ (unorganised Sector) নাম দেওয়া হয়। এটা এই ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে ব্যবস্থার অভাবটাই দিশি ব্যবসার ধরন। মোটেও নয়, কেবল ধরনটা অন্যরকম . যেই রকমটা বিদেশী পুঁজির আধিপত্যে সম্ভব এবং উপযোগী। এই একতলার বাসিন্দাদের দরকার দোতলায় কারবার চালু রাখতে, সুতরাং একতলায় লাভের অংশ গড়িয়ে যাবে, পুঁজি সঞ্চয় ঘটবে, কোন কোন দিশি বেনে দেখে আর ঠেকে শিখে দোতলার ব্যবস্থাপনার তালিম পাবে, এবং শেষে বিদেশী প্রতিযোগিতা আর সরকারের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দোতলায় নিজেদের জায়গা কেড়ে নেবে। ১৯২১-৩৫-এর সময়েই এইচ. ভেঙ্কট সুব্বাইয়ার হিসেব অনুসারে ভারতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে দিশি পুঁজি

মোটামুটি ৫৫ শতক দাঁড়িয়েছিল, অর্থাৎ বিদেশী পুঁজি কমবেশী ৪৫ শতক। অবশ্য হিসেবটা খুব মোটামুটি গোছের। অন্য একটি হিসেব অনুসারে ১৯৪৩ সালে বড় (একহাজারের বেশী শ্রমিক নিযুক্ত এমন) কারখানার মালিকানায় দিশি পুঁজি এগিয়ে ছিল। এই সব কারখানায় শ্রমিকদের ৫৮ শতাংশ ছিল দিশি পুঁজিপতিদের কারখানায় বেতনভুক। বলা বাহুল্য ছোট কারখানায় দিশি পুঁজির ভূমিকা আরও বড় ছিল।

অবশ্য দিশি-বিলিতি পুঁজির অংশ আলাদা করা শক্ত, কেননা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই দিশি পুঁজি খাটানো শুরু হয় সাহেব চালিত কোম্পানিতে। শেয়ার বাজারের লেনদেন হিসেব করা শক্ত তবে টুকরো নানা খবর দেখা যায় দিশি শেয়ার মালিকদের বিলিতি কোম্পানিতে প্রবেশ সম্বন্ধে। অধ্যাপক অমিয় বাগচী ও অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবধি ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্টরা তাদের কোম্পানিগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রেখেছিল। (বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসেবে বিদেশী পুঁজি ১৯২১ থেকে ১৯৩৮ সালে বেড়েছিল : ৭০৮ কোটি টাকা থেকে ৮৮৫ কোটি টাকা দাঁড়ায়।) কেবল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দিশি শেয়ার মালিকেরা ঐসব কোম্পানিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অবশ্য নতুন শিল্প যা গড়ে উঠছিল, যথা জলবিদ্যুৎ কিংবা সিমেন্ট এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পে, যথা চিনি বা কাগজ, নতুন কোম্পানি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই দিশি হাতের তৈরি।

দিশি পুঁজির একতলা থেকে দোতলায় ওঠার ইতিহাসটা অন্য এক পরিচ্ছেদে। এখানে এটুকু বলা দরকার যে ১৯৩৯-১৯৪৭-এর সময়টায় বড় রকমের পরিবর্তন হয় বিদেশী পুঁজি মহলে। (১) অধ্যাপক আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাংক-এর একটা তত্ত্ব অনেকে মানেন : ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সংকটকালে (যথা ১৯২৯-এর মন্দা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) ঔপনিবেশিক দেশগুলি বিকাশের সুযোগ পেয়ে থাকে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্কট মানেই পরাধীন দেশের পুঁজির উত্থান। অবশ্য এ হ'ল এক হিসেবে ব্যাখ্যার নামে পুনরুক্তি (tautology) তবে দুর্বল হলেও বর্ণনা হিসেবে তত্ত্বটা বেশ মাপে মিলে যায় ১৯২৯-এর মন্দা ও ১৯৩৯ থেকে মহাযুদ্ধের ফলে দিশি-বিদেশি পুঁজি সম্বন্ধে। ১৯২৯-এর মন্দার ধাক্কা সত্ত্বেও ইংরেজ বণিক প্রাধান্য বজায় ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অন্য ধরনের সঙ্কট আনল। যুদ্ধের বাজারে ইংলণ্ডের সঙ্গে অর্থের লেনদেনের খাতায় ভারতের বড় রকমের উদ্বৃত্ত গড়ে ওঠে—বৃটিশ সরকারের এদেশে যুদ্ধকালীন অর্থব্যয়, বেশ চড়া দামে রপ্তানি থেকে ভারতের মোটারকম আয়, এই সব নানা কারণে। এর ফলে ইংলণ্ডে ভারতের পাউণ্ড স্টারলিং-এ ঋণ পরিশোধ (রেল কোম্পানি ঋণপত্র সমেত) সম্ভব হয়। কেবল তাই নয়, যুদ্ধের পর ভারতের স্টারলিং উদ্বৃত্ত বিরাট অঙ্কে দাঁড়ায় (১৯৪৫-৪৬ সালে ১৭৩৩ কোটি টাকা মূল্যের)। এটা একটা বিরাট কাণ্ড—বিশেষ ভাগ্যের ব্যাপারও, কেননা ১৯৪৭-এর পর টানাটানির দিনে এই পুঁজি ভেঙে খেতে হয়েছিল। যা হোক, ব্যক্তিগত পুঁজির ক্ষেত্রে এই ১৯৩৯-৪৭ সময়টায় ইংরেজ কোম্পানিগুলি ঝিমিয়ে রয়েছে আর

ভারতীয়গুলি সতেজে বিস্তার লাভ করছে। অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার লেভ্‌কভ্‌সকি'র হিসেব অনুসারে বড় ৩২টি বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির সংখ্যা ছিল ৭০১। ১৯৪৮ সালে ৭১২। ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সিদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৪টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির সংখ্যা একই সময় বেড়েছিল ২৩৯ থেকে ৬২৬ পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রায় আড়াই-গুণ। অবশ্য পুঁজির হিসেব না থাকলে পরে এই জাতীয় অঙ্কের পুরো গুরুত্ব বোঝা যায় না। তবু সন্দেহ নেই যে ইংরেজদের ব্যবসা তেমন বাড়ছে না। আর এটা মনে করার কারণ আছে যে তাদের হাতে পুঁজি বাড়ছে বটে কিন্তু সেই পুঁজির মালিক বেশীরভাগ ভারতীয় ব্যবসাদার। এইসময় চটকল চা ও রবার বাগিচার প্রচুর শেয়ার সাহেবদের থেকে কালা আদমীদের হাতে এসে পড়ে। কিছু বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত হয়ে পড়ে এইসময় এবং কলকাতায় অবধি তাদের ডিরেক্টরদের মধ্যে কিছু মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালী নাম দেখা দিতে শুরু করে। মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত ঘটনার পেছনে কেবল মহাযুদ্ধের চাপ ও সংকট নয়, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কি ফল হয়, মিত্র শক্তিদের যুদ্ধোত্তর ভারত সম্বন্ধে কি মতামত, বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে কি মীমাংসা করেন—এইসব প্রশ্নের সম্বন্ধে সংশয় ও উদ্বেগ।

অনেকে মনে করেন এবং জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের চোখে ১৯৩১-এর ধাক্কা, ১৯৩৯-৪৭-এর পশ্চাদপসরণ বৃটিশ পুঁজির বিরুদ্ধে জয়লাভ সূচনা করে। মোটা হিসেবে তা বটে যেহেতু অনেক ভারতীয় পুঁজি বিদেশী পুঁজির জায়গা নিল। কিন্তু ইংরেজের এই পর্যায়ের ইতিহাস কি কেবল পশ্চাদ্‌পসরণের অথবা একটা নতুন পরিকল্পনায় ইংরেজ পুঁজি তাদের ব্যবসা ঢেলে সাজাচ্ছিল? যেসব পুরানো ব্যবসা থেকে ইংরেজ পিছু হঠে শেঠজীদের জায়গা ছেড়ে দিল—যথা, চটকল কি চা বাগিচা কি কয়লাখনি—এইসব ব্যবসার তুলনায় আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অন্য জায়গায়, যথা সিগারেট, বাদামতেল, ঔষধ ইত্যাদি যেখানে নতুন ইংরেজ কোম্পানি এবং বহুজাতিক (Multinational) কোম্পানি আসছে এই সময়ে। পুরানো ম্যানেজিং এজেন্সি পড়তির মুখে, কিন্তু ইংলণ্ডের বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি 'ইণ্ডিয়া লিমিটেড' শাখা কোম্পানি খুলছে এই দেশে। আরও দেখা যায় যে ইংলণ্ডের পুঁজিপতিরা ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে যৌথ কারবার খুলছে; ১৯৪৪ সালে দোরাবজি টাটা, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, কস্তুরভাই লালভাই এবং শেঠ সিংঘানিয়া ইংলণ্ডে আমন্ত্রিত হন এবং ১৯৪৫ থেকে কিছু যৌথ কারবার শুরু হয়। বড় উদাহরণ হল বিড়লা এবং মরিস গাড়ির নির্মাতা লর্ড মরিসের, এবং আই. সি. আই (ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইণ্ডাস্ট্রিস্) ও টাটার যৌথ উদ্যোগ। এইভাবে পুরানো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর ইংরেজ পুঁজির নতুন ধাঁচে উদ্যোগের গোড়াপত্তন হচ্ছিল। এই হল ইংরেজ পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রস্তুতি ১৯৪৭-এর পর নতুন পরিবেশের জন্য। যে খেলার যে নিয়ম।

অধ্যায় ৮

দিশি ব্যবসায়ী শ্রেণীর উত্থান ও উত্থান

ভারতের ঔপনিবেশিক পটভূমিকায় দেশীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর ভূমিকা সাধারণতঃ একটু নায়কোচিত চেহারা পায়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতায় সংগ্রামশীল এবং শেষ অঙ্কে বিজয়ী। আধুনিক ভারতীয় পুঁজিপতিদের জন্মের আগেই ১৮৬০-এর দশক থেকে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (economic nationalism) এই চরিত্রটি বুদ্ধিজীবীর মনোভূমিতে ছকে রেখেছিল—কারণ ঐ জাতীয়তাবাদের একটা দিক যেমন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধতা, অপর দিক ভারতীয় ধনিকতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে ওকালতি। তাছাড়া উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মী লাভের কিংবদন্তির প্রভাবে জনমানসে দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিংবা জম্‌সেদ্‌জি টাটা, কিংবা স্বদেশী শিল্পের জনকেরা, একটা ন্যায্য জায়গা পেয়েছেন। আবার, প্রাক্‌-আধুনিক যুগের সম্বন্ধেও কিংবদন্তি—এটা আমাদের মানসিক চাহিদার ফল, অধুনা বাস্তবে দীনহীন অবস্থার মধ্যে প্রাক্‌-আধুনিক কালে বণিক সমৃদ্ধির কল্পনা। বাংলা দেশে এটা লক্ষ করা যায়। এই সব নানা কারণে ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর ইতিহাস তথ্য থেকে ভেজাল আলাদা করার অপেক্ষায় আছে। এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের কাজ বিশেষ এগোয়নি। তবে মোটামুটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে আজকে অবধি দিশি বণিকদের উত্থানের ইতিহাস জানা যায়।

আঠেরো শতকের মানচিত্রে কতকগুলি জায়গায় সাবেক আমলের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখা যায়, বাণিজ্য যাদের জাত-ব্যবসা। বাংলায় গন্ধবণিক ও সুবর্ণবণিকদের বহুদিনের ব্যবসার ঐতিহ্য। মাদ্রাজ উপকূলে চেট্টী সম্প্রদায় প্রধান (সংস্কৃত 'শ্রেষ্ঠী'র রূপভেদ 'চেট্টি'); এদের নাড়ুকোট্টাইরা অন্তত ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে ধনবান এবং মাটির (নাড়ু) কেল্লার (কোট্টাই) ভেতরে নিজেদের সম্পদ রক্ষা করত। মাদ্রাজের অভ্যন্তরে, বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশে, ছিল কোমতি চেট্টির দল। কোরমণ্ডলের দক্ষিণে ব্যবসা চালু রেখেছিল তামিল মুসলমান ব্যবসায়ীরা। তারপর আসা যাক্‌ আরও দক্ষিণে, বর্তমান কেরালায়: যেখানে প্রধান ব্যবসায়ী হল মপিল্লা বা মোপ্‌লা (আরব বণিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মিশ্রণে উদ্ভূত সম্প্রদায়, ধর্মে মুসলমান), সিরিয়-পন্থী খৃষ্টান

(স্থানীয় বাসিন্দা, বেশীর ভাগ তথাকথিত উচ্চ বর্ণের, খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত), ইহুদি (বহিরাগত, কোচিনে স্মরণাতীত কাল থেকে বাস করছে স্বকীয়তা বজায় রেখে) এবং এই সঙ্গে কোঙ্কনের ব্রাহ্মণ—এদের সকলেরই বহু শতাব্দীর বিদেশী বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা। উপকূল ধরে আরও এগোলে এসে পড়ি বর্তমান মহারাষ্ট্রে : এখানে বহির্বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র বোম্বাই উনিশ শতক থেকে, হিন্দু ও জৈন গুজরাটি বেনে, পার্সি ইত্যাদি বহিরাগতদের হাতে। মহারাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত জাত বেনে ছিল না বললেও চলে, মারাঠিদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা অনেকে মহাজনবৃত্তি করতেন এবং কিছু রাজস্থান থেকে আগত বেনে ছিল। পশ্চিম উপকূলে বহির্বাণিজ্যের দৌলতে গুজরাটি জৈন ও হিন্দু বণিক, বোহ্‌রা মুসলমান বণিক, কোঙ্কনি সওদাগর ইত্যাদি খুব জাঁকিয়ে বসেছিল কয়েক শতক ধরে। প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র সুরাট থেকে যে পথ মোগলদের শাসনকেন্দ্র আগ্রা-দিল্লীর দিকে গেছে সেটা রাজস্থানের মধ্য দিয়ে ; সেখানকার বণিকেরা, বিশেষভাবে যারা মারোয়াড় প্রদেশের এবং শেখাওয়তি অঞ্চলের, অন্তর্বাণিজ্য এবং মহাজনি কারবারে সাফল্য পেয়েছিল এবং ছড়িয়ে পড়েছিল দুই দিকে—বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ও বিহার হয়ে বাংলা দেশে, এবং অপরদিকে মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র অঞ্চলে। আরও উত্তরে পঞ্জাবে ও সিন্ধুপারে স্থলপথে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের রাস্তায় ছিল ক্ষত্রি, লোহ্‌না ইত্যাদি সম্প্রদায়।

এই চট্‌জলদি মানচিত্রে ফাঁক কিছু থেকে গেল, কিন্তু মোটামুটি এইভাবে সাবেকি জাতব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলি ছড়ানো ছিল। মনে রাখতে হবে যে একমাত্র এরাই যে ব্যবসাবাণিজ্যে ছিল তা নয়, তবে এদেরই ছিল প্রাধান্য। আঠেরো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের গোড়ায় অন্য অনেক জাতের লোকে বিদেশী কোম্পানির বা সাহেবদের ব্যক্তিগত ব্যবসার লেজুড় হয়ে সাবেকি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলিকেও ছাড়িয়ে যায়। বাংলায় এর উদাহরণ যথেষ্ট, তবে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল পার্সি সম্প্রদায়। পারস্য ইস্‌লামে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সেখান থেকে পুরানো-পন্থী অগ্নি-উপাসকেরা শরণার্থী হয়ে এসে গুজরাটে বাস করেছে কয়েক শতাব্দী চাষী, কারিগর আর সওদাগর হিসেবে ; বোম্বাইতে ইংরেজদের বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠার সুযোগে এরাই ব্যবসায়ে খুব উন্নতি করে। এদের কথা পরে।

আঠেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে সাবেকি সওদাগরির ওপর ইংরেজদের ধাক্কাটা জোরদার হয়ে উঠল। ক্রমান্বয়ে দিশি বণিকদের যে অবস্থা দাঁড়াল সেটা দু-এক কথায় বলা দরকার। ঐ সময় থেকে বোধহয় বহির্বাণিজ্যে এবং সংশ্লিষ্ট কারবারে প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক ব্যবসা থেকে একচেটিয়া ব্যবসার দিকে যাওয়াটাই মৌল প্রবণতা। পলাশী যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে কি ঘটল তা থেকে আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে ধারাটা কোন দিকে। কোম্পানির আমলটা যদিও এই বইটার চৌহদ্দির বাইরে তবুও এই ধারাটা জানা আমাদের পক্ষে জরুরি।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে সওদাগরি পুঁজির লাভ ও বৃদ্ধির রাস্তা হ'ল সস্তায় কেনা ও বেশী দামে বেচা, এবং একচেটিয়া ক্রেতা কম দামে কিনতে পারে ও বেশী দামে বিক্রী করতে পারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগুলির এই স্বাভাবিক প্রবণতা আঠেরো শতক অবধি নিয়ন্ত্রিত ছিল ভারতে রপ্তানির পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে : ওলন্দাজ ইংরেজ ফরাসি কোম্পানিরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী তো বটেই ; তাছাড়া দিশি বণিকদের মাধ্যমে কারিগরদের দাদন দেওয়া হত বলে তাদের একটা বড় ভূমিকা ছিল ; এবং দিশি বণিকদের পুঁজির জোর ও কখনও কখনও রাজনৈতিক খুঁটির জোর কম ছিল না। একথা হালের গবেষণায় জানা যায়, যদিও গোড়ার দিকে বহির্বাণিজ্যের বিষয়ে গবেষণা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগুলির ওপর একান্তভাবে নজর দিয়েছিল বলে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিপরীত একটা ধারণার চলন ছিল।

আঠেরো শতকে ক্রমান্বয়ে প্রতিযোগিতার পরিবেশ—যেটা দিশি বণিক ও তাঁতীদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল—পাল্টাতে লাগল। ওলন্দাজ ও ফরাসিদের কোণঠাসা করে ইংরেজরা যে ব্যবসায়িক সুবিধা পেল সেটা জোরদার হল দেশীয় রাজন্যবর্গের দুর্বলতায়। এর একটা নমুনা বাংলা সুবার নবাবের অবস্থা, অব্যবস্থিতচিত্ততা, কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিরোধে অক্ষমতা (প্রাসঙ্গিক একটা ছোট খবর : পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে মৃতের সংখ্যা মাত্র ২৯, তার মধ্যে আবার ১৬ জন দিশি সিপাই)। সবচেয়ে বড় কথা, ইংরেজ কোম্পানি ক্রমে রপ্তানি-যোগ্য পণ্য ক্রয়ের যে যন্ত্র তৈরী করল, সেটা দিশি বণিকদের মাত্র দুটি পথ বাকী রাখল—হয় দিশি বণিককে অন্তর্বাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে নিজেকে, অথবা বহির্বাণিজ্যে একমাত্র বড় কারবারি ইংরেজদের আওতায় থাকতে হবে।

১৭৫৩ নাগাদ ইংরেজ কোম্পানি চেষ্টা শুরু করে গোমস্তা ব্যবস্থা বা এজেন্সি ব্যবস্থা দ্বারা তাদের ক্রেতব্য দ্রব্য, প্রধানতঃ সুতি কাপড়, সংগ্রহ করার। আগেকার স্বাধীন দিশি দাদনি বণিকের জায়গায় এল ইংরেজদের তদারকির অধীন কমিশন-ভোগী গোমস্তা ; তাঁতীরা কাকে তাদের কাপড় বেচবে সেই স্বাধীনতাও খর্ব হল, এবং কাপড় কেনার ব্যাপারে অবাধে শুরু হল নানা কারচুপি (সূক্ষ্ম ভাল কাপড়কে মোটা কাপড়ের দামে কেনা, জোর করে আগাম দিয়ে কাপড় আদায় করা ইত্যাদি)। এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে—উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের বহু পরিশ্রম সঞ্জাত বইয়ে প্রায় হুবহু দলিলের ভাষ্য। তিনি দেখিয়েছেন যে ১৭৫৭ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তাঁতিদের ওপর ইংরেজদের গোমস্তার অত্যাচার বাড়ল। আর কোম্পানির পক্ষে কাপড় কিনবার এজেন্সি পেতে লাগল কেবল ইংরেজরা বা তাদের বেনামিতে তাদের অনুগত কিছু দিশি বেনে। মোটমাট, ইংরেজ এবং কারিগরদের মধ্যে মধ্যবর্তী হয়ে দিশি বণিকদের লাভ করার সুযোগ সঙ্কুচিত হতে লাগল।

১৭৭১ সালে কোম্পানির উচ্চতম নীতি নির্ধারক, কোর্ট অফ ডিরেক্টরস, ঘোষণা করলেন যে বাংলায় কন্ট্রাক্ট ব্যবস্থা আনতে হবে। বৎসর দু-একের মধ্যে হেস্টিংস এই মর্মে বিধি প্রণয়ন করলেন। কেন? এর মানে কি সওদাগরি কোম্পানি স্বেচ্ছায় একচেটিয়াগিরি ছেড়ে দিচ্ছিল? উত্তর সম্ভবতঃ এই যে, তা নয়। ১৭৭০ সালের মন্বন্তর—বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস যার পশ্চাৎপট—বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে মারল, চাষী আর তাঁতী মিলিয়ে; তার ফলে বাজারে কাপড়ের যোগান আসে না; ফলে কোম্পানির এই আকস্মিক উদারতা। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই উদার নীতি মহাফেজখানায় ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয় হয়ে রইল, একচেটিয়াগিরি ফিরে এল। ১৭৭৪-১৭৭৮ সাল থেকে এর নাম কন্ট্রাক্ট ব্যবস্থা। কর্নওয়ালিস ১৭৮৮ সালে এজেন্সি ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু দিশি বণিকেরা আর ফিরে পেল না তাদের জায়গা বহির্বাণিজ্যের সংশ্লিষ্ট ব্যবসাতে।

ইংরেজ কোম্পানির এই একচেটিয়াগিরির মানে অবশ্য এই নয় যে অর্থবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকে একচেটিয়ার সংজ্ঞার সঙ্গে হুবহু এটা মেলে। এই ক্ষেত্রে বলা চলে: কোম্পানি কাপড়ের কিংবা রেশমের বাজারে বৃহত্তম ক্রেতা হওয়ার সুযোগ নেয়। কিন্তু বাজারে অন্য ক্রেতাও আছে—যথা, কোম্পানির নিজের চাকুরেরা ব্যক্তিগত ব্যবসা করে, কোম্পানির ছত্রছায়ার বাইরে কিছু শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিগত ব্যবসা করে (যা থেকে পরবর্তী ম্যানেজিং এজেন্সির সূত্রপাত), এবং অন্তর্বাণিজ্যের খাতিরে দিশি বণিকও ব্যবসা চালায় (যথা উত্তর ভারতে দিশি রেশম চালানের কারবার)। তবে অনেক ক্ষেত্রেই আপাতদৃষ্টিতে প্রতিযোগিতার অবস্থা সত্ত্বেও, দিশি কারিগরদের কাছে জিনিস কেনবার কারবারে ক্রেতাদের মধ্যে যোগসাজসের ফলে একচেটিয়া গোষ্ঠীর (Collective monopoly) উদ্ভব হয়। এবং কোম্পানি ও তার চাকুরেদের হাতে ১৭৫৭-এর পর যে ক্ষমতা একত্রীভূত হয় সেটা ব্যবসা একত্রীভূত করতেও ব্যবহৃত হয়।

মোদ্দা কথা, বহির্বাণিজ্যে দিশি বণিকদের ভূমিকা ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে প্রায় বিলুপ্ত হল ক্লাইভ থেকে কর্নওয়ালিসের আমলে। ইংরেজ বাণিজ্যের আওতার মধ্যে যে জায়গা তাদের জন্য বাকী রইল উনিশ শতকের গোড়ায় তা হ'ল বেনিয়নগিরি, নুনের দিওয়ানি, ইংরেজ বণিকের কাঁচা টাকা দরকার হলে উঁচু সুদে বা কোন অর্থকরী অনুগ্রহের বিনিময়ে ধার দেওয়া, 'কোম্পানির কাগজে' অলস পুঁজির বিনিয়োগ। তখন উঠতি ব্যবসা হল ইস্ট কোম্পানির নয়, তথাকথিত অনধিকারী (interloper) ব্যবসায়ীদের হাতে: এরা স্বাধীন ইংরেজ ব্যবসায়ী আর তাদের হাতের পুঁজির অনেকটা কোম্পানির প্রাক্তন ও বর্তমান চাকুরেদের অর্জিত বা লুঠ করা পয়সা। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন কিভাবে এই শ্রেণীর ইংরেজ বণিক অবাধ বাণিজ্যের (Free Trade) ধ্বজা উড়িয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজদত্ত একচেটিয়া অধিকার খতম করল ১৮১৩ সালে। মজা এই যে, এই অবাধ বাণিজ্যের ধ্বজাধারী ইংরেজ ব্যবসায়ী দল পূর্বকথিত শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর একচেটিয়াগিরি কায়েম রাখল এবং এটা এদেশে বিদেশী পুঁজির

প্রাথমিক সঞ্চয়ের উৎসস্থল।

বহির্বাণিজ্যে দিশি বণিক অংশভাগী ছিল না এমন নয়, তবে তাদের জায়গাটা নিতান্ত গৌণ। বিশেষতঃ রামদুলাল দে ও মতিলাল শীল (গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কিশোরীলাল মিত্র কৃত জীবনী প্রকাশের পর থেকে) বাঙালীর শহুরে কিংবদন্তির মধ্যে। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের অংশীদার ও জাহাজের মালিক হিসেবে এই জাতীয় বাঙালী ব্যবসায়ীকুলের কতটা গুরুত্ব ছিল সন্দেহের ব্যাপার। কলকাতা পোতাশ্রয়ের রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজের হিসেবে জানা যায় যে সমস্ত ভারতীয় বণিকদের ভাগ যোগ করলে তাদের অংশ দাঁড়ায় মোট জাহাজের টনেজের (tonnage) ৫ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে (১৮০৫-১৮২৬ সাল)। তার ওপর ভারতীয় বণিকদের এই সামান্য অংশের মধ্যে বাঙালি হিন্দু বণিকদের অংশ কখনই ৪০ শতাংশ পৌঁছয়নি। অপর পক্ষে কয়েকটি ইংরেজ এজেন্সি হাউস বেশীর ভাগ জাহাজ হস্তগত করে; ১৮৩০ নাগাদ সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে মাত্র ছয়টি ইংরেজ এজেন্সি হাউস কলকাতা পোতাশ্রয়ে রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজের ৬৫ শতাংশের মালিক। এখানেও ইংরেজ একচেটিয়াগিরি তৈরী হচ্ছে।

অধুনা প্রকাশিত অমিয় বাগ্‌চী-কৃত স্টেইট্ ব্যাঙ্ক-এর ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় দিশি বণিকদের ভূমিকা ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল-এর প্রতিষ্ঠাকাল (১৮০৮) থেকে ক্রমক্ষীয়মান। ব্যাঙ্কের থেকে যারা ঋণ পায় তাদের মধ্যে ভারতীয় নাম বিরল হয়ে দাঁড়ায়, ত্রিশের দশকে এজেন্সি হাউসগুলির ব্যবসার মন্দাতে বাংলার বণিকেরা অনেক খেসারৎ দেয়, এবং তারা ইংরেজ-চালিত ব্যবসা থেকে সরে যেতে থাকে। আরেকজন গবেষকের মতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বাইরে টাকার বাজারেও দিশি পুঁজির হাল খারাপের দিকে—এবং এর জন্য দায়ী ইংরেজ পুঁজির স্বার্থের খাতিরে কোম্পানির সরকারের হস্তক্ষেপ। বহুবার রাজস্ব থেকে টাকা সরকার কম সুদে ধার দিয়েছে ইংরেজ বণিকদের—এবং এটা ঘটেছে যখনই টাকার বাজারে টানাটানির দরুণ উঁচু হারে সুদ আদায় করার সুযোগ দিশি বণিকেরা পেয়েছিল, অর্থাৎ যখন ইংরেজ এজেন্সি হাউসগুলোর অসুবিধা ঘটে। ইংরেজ পুঁজির এবং ইংরেজ সরকারের একাত্মতার আর একটা উদাহরণ।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে কলকাতায় দিশি, বিশেষ ভাবে বাঙালী ব্যবসায়ী শ্রেণীর অধোগতি পরবর্তীকালে পূর্বভারতে বিদেশী পুঁজির আধিপত্যের ভিত্তি তৈরী করল। কিন্তু কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলার বাণিজ্যে দিশি বণিক যেমন কোণঠাসা হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বোম্বাইতে তেমনি হয়নি। একটা পার্থক্য বাংলার সাথে এই যে পশ্চিম উপকূলে সাগরের ওপারে জাহাজে যাতায়াত ও ব্যবসার অভ্যাসটা বেঁচে ছিল, যেটা বাংলায় ছিল না। তাছাড়া পশ্চিম ভারতে মারাঠাদের দাপটের ফলে ইংরেজ শাসন কায়েম হল পরে, কয়েক কিস্তিতে। কিছু দেশীয় রাজ্য রয়ে গেল বোম্বাইয়ের পেছনে তুলো আফিং জাতীয় পণ্যের উৎসস্থলে। যেমন ধরা যাক্ দেশীয় রাজ্যে আফিং উৎপন্ন হলে দিশি বণিকদের একটা সুবিধা থাকে, অন্ততঃ অন্তর্বাণিজ্যে; কিছু দিশি বণিক

কেবল মালওয়া অঞ্চল থেকে বোম্বাইতে চালান নয়, সরাসরি চীনে রপ্তানিও শুরু করে। তাছাড়া বাংলাদেশ যেভাবে ১৭৫৭-১৮৫৭ অবধি ধননির্গমের (drain of wealth) শিকার হয়েছিল, মহারাষ্ট্র অঞ্চল তেমন দীর্ঘকাল ঐভাবে নিঃশেষিত হয়নি।

ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্বে সুতি কাপড় তৈরী প্রধান শিল্প বলে সেখানে তুলোর খুব চাহিদা। দাক্ষিণাত্যের কালো মাটিতে তুলোর ফলন ভাল হয়। ১৮৬০-৬৪ সালে যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিগ্রো বা কালো আমেরিকানদের দাসত্ব অবসানের ব্যাপারে অন্তর্বিগ্রহের দরুণ বিপর্যস্ত, তখন পৃথিবীর বাজারে আমেরিকার তুলো না পৌঁছনোর ফলে তুলোর দাম চড়ল আর এই সময়ে বোম্বাইয়ের দিশি বণিকদের খুব লাভ হয়। সম্ভবতঃ এই সময়টা বোম্বাইতে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। দিশি বণিকদের মধ্যে পারসিদের নতুন ধরনের উদ্যোগ করার প্রবণতা সাবেকি বেনেদের চেয়ে বেশী দেখা যায়। হয়ত অগ্নি-উপাসক বিধর্মী এই সম্প্রদায়ের পক্ষে সমাজে উন্নতির অন্য রাস্তা বন্ধ থাকায় তারা নতুন রাস্তার দিকে এগোয় যা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মহলকে আকর্ষণ করে না। ব্যবসায় ঐতিহাসিক এভরেট হেগেন-এর এই মত ; তার মতে তুলনীয় উদাহরণ হল, ফরাসি প্রটেস্টন্ট বা মধ্য ইউরোপে ইহুদী বা উত্তর ইংলণ্ডের নন্-কন্‌ফরমিস্ট ধর্মসম্প্রদায়গুলি যাদের মধ্যে অনুরূপ নবোন্মেষশালী উদ্যোগ (innovative entrepreneurship) দেখা যায়। পারসিদের ব্যবসায়িক সাফল্যের কারণ সন্ধানে কেনেডি জরথুস্ত্রের আদি গ্রন্থ অবধি টেনে নিয়ে গিয়ে প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে জাতি বর্ণভেদের অভাব, সাবেকি বণিক সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য-প্রসূত বাধানিষেধের অভাব, হিন্দু সমাজের অভ্যাসের বিপরীত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ইত্যাদি পারশিদের মধ্যে নতুন ব্যবসায়ে সাফল্যের মূলে। এসব হল ম্যাক্স ওয়েবর-এর তত্ত্বের অবদান। প্রমাণ করা শক্ত, অপ্রমাণ করাও শক্ত। যাই হোক্, পারসিদের অনায়াস নিপুণতা পাশ্চাত্যভাব আত্মীকরণে, নতুন ব্যবসার সুযোগ কাজে লাগানোতে, নতুন পরিবেশে ইংরেজ শাসিত বোম্বাইতে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দেখা যায়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্বের ফল দ্বিতীয় ভাগে শিল্পায়নের পর্বে তাদের দ্রুত সাফল্য।

উনিশ শতকের শুরু থেকে বাঙালী ব্যবসায়ী অসাফল্যের নানা কারণ নির্দেশ করা হয়। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মত হল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে যারা অর্থশালী তারা জমিদারি কিনেছে, ফলত পুঁজি ব্যবসায়ের থেকে সরে এসেছে। তিনি কলকাতার আদালতের উনিশ শতকীয় দলিল থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে সাধারণতঃ অর্থশালী পরিবারগুলিতে সম্পত্তির বাঁটোয়ারা নিয়ে কলহ ও আদালতের খরচে অর্থহানি তাদের সর্বনাশের একটা কারণ। তৃতীয় একটা মত প্রচলিত যে বাংলার দায়ভাগ আইন এমন যে কর্তার কর্তৃত্ব ও সম্পত্তির ওপর অধিকার প্রশ্নাতীত ; ভারতে অন্যত্র, যেখানে মিতাক্ষরা আইন চালু, জন্মমাত্রেই পুরুষ সন্তান পারিবারিক সম্পত্তির আংশিক

অধিকারী। এর ফলে নাকি দায়ভাগের আওতায় যারা মানুষ তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নতুন কিছু করার, লাভের জন্য ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা তৈরী হয় না, কর্তার ছায়ায় গতানুগতিকতার ধারায় তারা উদ্যম হারিয়ে ফেলে।

শেষ তত্ত্বটি ম্যাক্স ওয়েবর-এর চিন্তা ধারার অনুসারী ; আগেই বলেছি এ প্রমাণ করাও শক্ত, অপ্রমাণ করাও শক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার পক্ষে অনেক দলিল আছে বটে, কিন্তু কার্যকারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট নয়। অর্থশালী পরিবারের পতন ঘটেই থাকে, তাতে অপরের উত্থান রোধ হয় না, আর একটা সম্প্রদায় বা শ্রেণীর সমষ্টিগত ভাগ্য নির্ধারিত হয় না। প্রথম মতটি খুব প্রচলিত। কিন্তু যেমন প্রমাণ দরকার তার অভাব আছে ; বরঞ্চ সিরাজুল ইস্‌লাম দেখিয়েছেন যে ১৭৯০ সাল থেকে ১৮১৯ সালে জমিদারি ক্রেতাদের মধ্যে ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম, বেশী কিনেছে অপর জমিদারেরা বা নায়েব আমলা জাতীয় লোকেরা। পরবর্তীকালে যদি ব্যবসায়ী পুঁজি আরও বেশী পরিমাণে জমিদারি ক্রয়ে ঝুঁকি ছিল, এটা হতে পারে যে তার কারণ ব্যবসায়িক অসাফল্য বা বিনিয়োগের সুযোগের অভাব—অর্থাৎ কিনা কার্যকারণ সম্বন্ধটা উল্লিখিত তত্ত্বের ঠিক বিপরীত হতে পারে। বোধহয় এই সব ব্যাখ্যার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যেটা সেটা হল সহজ : বোম্বাইয়ের তুলনায় কলকাতা তথা পূর্ব ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রাধান্য প্রবল।

এই অবস্থার চাপে অনেক পুরানো ব্যবসায়ী পরিবারের অলস বাবুতে পরিণতি। একটা ছবি দেওয়া গেল, বহুপরিচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' বাদ দিয়ে, 'কলকাতার নুকোচুরি' (১৮৬৯) থেকে :

> পামরলাল মিত্র বাবু বড় বনিয়াদি ঘরের দৌহিত্র সন্তান। তিনি আমাদের চারইয়ারির দলের কাপ্তেন। বাবুর বৈঠকখানা সদাসর্বদা গুলজার থাকিত, উলসনের খানা ও পেইন কোম্পানির মদে পরিপূর্ণ।...বাবু পাঁচুহরি কোম্পানির মুৎসুদ্দি হইলেন এবং আমি সদর মেট হইলাম, কর্মের মধ্যে আফিসে গিয়া "বাতাস দেরে" বোলে চোদ্দ পো হতেম। আমদানি রপ্তানি ক্রমে বেড়ে উঠ্‌লো, এবং সাহেবকে প্রচুর টাকা এডভেন্স কোত্তে হইল। সাহেব অতি ভদ্র, কিন্তু বিলাতে মহা অকাল হওয়াতে তুলায় অতিশয় ক্ষতি হইল। সাহেব ইনসলভেন্ট নিলেন, এবং আমরাও পটোল তুল্‌লাম। যে ব্যক্তি কোন বিষয় না জানে তাহার সে কর্ম্ম করা কোন মতে বিধি নয়।

৩

এমন নয় যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে দিশি বণিকদের কোন জায়গা নেই। অসমকক্ষ একটা ভূমিকা বিদেশী পুঁজির পাশে রয়েছে। আমরা আগের এক পরিচ্ছেদে দেখেছি যে কৃষির বাজার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড় বেনে মহাজন শেঠদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা—নগদা ফসল বাজার জাত করবার জন্য মধ্যবর্তিতা, স্থানীয় বিশেষীকরণের (regional specialization) ফলে অন্তর্বাণিজ্যে নগদা ফসল (Commercial crop) ছাড়াও অন্য কৃষি পণ্যে মধ্যবর্তিতা, খাজনা দেওয়ার জন্য ধার, চাষার খাওয়া পরার জন্য ধার, ফসলের জন্য দাদন বা আগাম, ইত্যাদি ক্ষেত্রে। অনুরূপ ভাবে কুটির শিল্পে অবশিল্পায়নের পর যা ছোট শিল্প বাকী রইল তাতেও সওদাগরি ও মহাজনি পুঁজির একটা বড় ভূমিকা রয়ে গেল। এই দুই ক্ষেত্রেই পুঁজির সঞ্চয় মধ্য ও নিম্নবর্গীয় কৃষক ও কারিগরের হাতে না হয়ে, হতে লাগল উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মহাজনি ও সওদাগরি কারবারিদের হাতে। ফলে উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ ও উৎপাদনের বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিনষ্ট হল অথবা ব্যহত হল। একথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

বিদেশী বণিক-স্বার্থ চাইবে দিশি বণিক কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও রপ্তানি-যোগ্য করে দেবে, আমদানি শিল্পদ্রব্য বাজারজাত করবে, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বাইরের মহলে টাকার যোগানদার হিসেবে রইবে, কৃষিজ উৎপাদন ও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য যে বিরাট পরিমাণ টাকার মরশুমি জোয়ার-ভাঁটা দেশময় চলে তার ব্যবস্থাপনা করবে, ইত্যাদি। আগেই বলেছি ঔপনিবেশিক দোতলা অর্থব্যবস্থার (dual economy) কথা, সেটারই নীচের তলার কারবার এই সব। কিন্তু দিশি বণিক চিরকাল সেখানেই নীচের তলায় থাকবে কেন? বোম্বাইতে যা ঘটল ১৮৫০-এর দশক থেকে সেটা অন্যত্র ঘটেছে কিস্তিতে কিস্তিতে। তাই বোম্বাইতে দিশি বেনেদের দোতলায় ওঠার ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক্।

উনিশ শতকের গোড়ায় আফিং কিংবা তুলো রপ্তানির ব্যবসায়ে তারা, বিশেষ করে পারসিরা, শুরু করে ইংরেজদের লেজুড় হয়ে (অনেক সময় comprador বলা হয়, চীনে পর্তুগীজদের ব্যবহৃত শব্দটা ধার করে)। কিন্তু এই দিশি বণিকেরা সেখানেই থেমে থাকেনি। তুলো রপ্তানিতে যারা পয়সা করল, বিশেষ করে ১৮৬০-৬৪ সালে, তারা জানতে পেল ম্যানচেস্টরের চাহিদা কি জাতীয় তুলোর জন্য, কারখানাগুলির হাল হকিকৎ, শিল্পের জগতের কারবার। এদের অনেকে, যথা নাসেরওয়ানজি টাটার ছেলে জমসেদ্‌জি, রপ্তানি ব্যবসার খাতিরে ইংলণ্ড ঘুরে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা পেল। দাক্ষিণাত্য থেকে বিদেশে রপ্তানির জন্য ইংরেজ রেল ও রাস্তার ব্যবস্থা তৈরী হল, কিন্তু এর ফল বোম্বাইতে কাঁচামালের যোগান সুতি কারখানার পক্ষে সুবিধাজনক। কাঁচামালের উৎস নিতান্ত কাছে। আবার বন্দর থাকায় বোম্বাই থেকে সুতি কারখানায় তৈরী মাল চালান করতেও সুবিধা (প্রকৃতপক্ষে গোড়ার দিকে বোম্বাই সুতিকলগুলির প্রধান বাজার ছিল বিদেশে,

পূর্ব এশিয়াতে)। বোম্বাইয়ের আর একটা সুবিধা ছিল তার আবহাওয়া : ভিজে আবহাওয়া সুতো তৈরীর উপযোগী, আর্দ্রতার অভাবে সুতো ছিঁড়ে যেত (বর্তমানে হিউমিডিফায়ব বা আর্দ্রকরণ যন্ত্র চালু)। একমাত্র প্রযুক্তি সংক্রান্ত অসুবিধা ছিল এই যে কল চালানোর জন্য কয়লার উৎস অনেক দূরে বাংলা-বিহার অঞ্চলে ; কিন্তু প্রথমে কয়লা বিদেশ থেকে আমদানি করে এবং পরে জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে এই সমস্যারও সমাধান হয়। এটাও মনে রাখতে হবে যে বোম্বাই শহরে সুতি কারখানা তৈরীর এসব স্থানীয় সুবিধাগুলি ছাড়াও, সাধারণভাবে কার্পাস বস্ত্রশিল্পের পক্ষে অনেকগুলি উপাদান ছিল ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশে। সুতোর খদ্দের বিদেশে কিংবা দিশি তাঁতী, আর কাপড়ের খদ্দের সাধারণ লোক, শিল্পায়ন-বিমুখ ইংরেজ সরকার নয় (লোহা ইস্পাত শিল্পে ঠিক বিপরীত অবস্থা, তাই বিলম্বিত বিকাশ)। দ্বিতীয়তঃ, সুতি কারখানা গড়তে পুঁজি কম লাগে, হাল্কা শিল্প বলে এবং উঁচুদরের তক্‌নিকি বা প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়তঃ, যেখানে বেশীর ভাগ শিল্পদ্রব্যের চাহিদা দেশের অল্প গড় আয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতি কাপড়ের দাম এমন বেশী নয় যে সেটা বড় একটা বাধা হতে পারে।

এই সমস্ত কারণে সুতি বস্ত্র শিল্পের গোড়াপত্তন করা বোম্বাইয়ের দিশি বণিকদের পক্ষে সহজ হয়েছিল এবং সেখানকার কারখানা মালিকেরা দিশি শিল্প উদ্যোগের অগ্রদূত। ১৮৫৩ সালে কাওয়াসজি নানাজি দাভার নামে এক পারসি যে পথ দেখাল তার অনুসরণে বিরাট পরিমাণ দিশি পুঁজি শিল্পে নিয়োজিত হল। সেই ইতিহাস পরের পরিচ্ছেদে। ছবিটা অন্যরকম একেবারে পূর্বভারতে। চা বাগিচায় সরকারি আনুকূল্যে আসাম চা কোম্পানি সরকারি পয়সায় তৈরী বাগিচা হস্তগত করে (দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য সম্ভাব্য ক্রেতাদের আবেদন নাকচ করে) ; তারপর অনেক ইংরেজ কোম্পানি বিনা খাজনায় বিরাট জমি পেল সরকার থেকে। চটকল অর্থাৎ পাট শিল্পে গোড়া থেকে স্কট্‌স্‌ম্যান-দের আধিপত্য। একমাত্র কয়লা খনিগুলিতে জমির মালিকানা ইত্যাদি কারণে দিশি পুঁজি বেশ পরিমাণে ছিল, যদিও তাদের উৎপাদন তাদের সংখ্যার তুলনায় সাহেব কোম্পানিগুলির চেয়ে অনেক কম। সুতি কারখানা গড়তে ইংরেজদের উৎসাহ ছিল না (বিংশ শতকে কিছু দেখা যায়)—কেন না ম্যানচেসটর-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা ইংরেজদের বা সরকারের কাম্য নয়। সুতরাং বস্ত্রশিল্পে দিশি পুঁজির ওপর বিদেশী পুঁজির ধাক্কা পড়েনি। ধাক্কা পড়েছিল ভারত সরকারের হাত থেকে, ম্যানচেসটর-এর চাপে তৈরী শুল্কনীতির দিক থেকে (দ্রঃ পরিচ্ছেদ ১০)।

দিশি বণিকেরা শিল্পায়ন ও বড় গোছের কারবারের রাস্তায় এসে পড়ল তথাকথিত সুব্যবস্থিত অর্থনীতির (organised sector) আওতায়, ব্যাঙ্ক শেয়র মার্কেট জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জগতে। আজকে সীমাবদ্ধ দায় কোম্পানি (limited liability) আমাদের অভ্যস্ত, কিন্তু ইংলণ্ডে পর্যন্ত এটা আইনসিদ্ধ হয় মাত্র উনিশ শতকের মাঝামাঝি এবং বৃটিশ ভারতে ১৮৫৭ সালে। সকলেই জানে যে এই ব্যবস্থার সুবিধা হল যে অংশীদার বা শেয়ার

মালিকেরা কেবল তাদের অংশের অনুপাতে কোম্পানির ঋণের জন্য দায়ী থাকে অথবা লাভের অংশ দাবী করে। এই আইন হওয়ার আগে ব্যবসার ঝুঁকি ভয়ানক ছিল, বিশেষ দিশি বণিক যারা ইংরেজের সঙ্গে যুক্ত তাদের পক্ষে, কেননা যুক্ত ব্যবসার ঋণ দিশি লেজুড়ের ওপর বর্তায় আর সাহেব ইংলণ্ডে আশ্রয় নিতে পারে। তাছাড়া রাধেশ্যাম রুংটা দেখিয়েছেন কি ভাবে সীমাবদ্ধ কোম্পানি চালু হওয়ার আগে কয়েকজন অংশীদার বাকীদের ঠকাতে পারত (যথা ১৮৪৯ সালে ব্যাংক অফ বেনারস দেউলিয়া হওয়ার ঘটনা); সবচেয়ে বড় কথা, সীমাবদ্ধ দায়ের আইন না থাকলে একজন ব্যবসাদারের পক্ষে বিভিন্ন উদ্যোগে টাকা খাটানো কঠিন ব্যাপার। কারণ প্রতি কোম্পানিতে তার দায় সীমাবদ্ধ নয়। ১৮৫৭ থেকে এখনকার পরিচিত সীমাবদ্ধ দায় জয়েন্ট স্টক কোম্পানি শুরু হল, প্রথমে ইংরেজ এবং পরে বিস্তর দিশি ব্যবসাদারের দ্বারা। ১৮৮০-৮১ সালে এরকম কোম্পানির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭৫ (সংগৃহীত পুঁজি ১৪.৯ কোটি টাকা), ১৮৯৯-১৯০০ সালে ১৩৪০ (পুঁজি ৩৫.৪ কোটি), ১৯১৩-১৪ সালে ২৭৪৪ (পুঁজি ৭৬.৬ কোটি)। এর মধ্যে দিশি পুঁজির অনুপাত কত ঠিক জানা যায় না, কিন্তু ভেংকটসুব্বাইয়া'র হিসেব অনুসারে ১৯৩০ সালে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলিতে ভারতীয় পুঁজি মোটের ৫৩.৩ শতাংশ।

ইংরেজদের আইনে ও পদ্ধতিতে সৃষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে দিশি বণিকেরা নিজস্ব এক ধরনের ছাপ দিতে লাগল। যথা, ম্যানেজিং এজেন্সি। এটা ইংরেজদের সৃষ্টি (যদিও রুংটা ও ব্লেয়র ক্লিং-এর মধ্যে এবিষয়ে মতভেদ আছে)—উনিশ শতকের প্রথম দশকে বীমা কোম্পানিতে ও তারপর কয়লা আর জাহাজ কোম্পানিতে; যখন চটকল ও চা-বাগিচা শুরু হল তখন শেয়ার ক্রেতাদের মনে আস্থা সঞ্চারের জন্য নামজাদা ম্যানেজিং এজেন্সি দরকার হত। তাছাড়া একই এজেন্সি নানা জাতীয় ব্যবসায় নানা কোম্পানি নিয়ন্ত্রণে রেখে তাদের মধ্যে লাভজনক সংযুক্তি (combination) আনতে পারত—যথা এন্ড্রু ইউল ম্যানেজিং এজেন্সির কয়লা কোম্পানির কয়লা, তাদেরই স্টিমার কোম্পানির জাহাজ, তাদেরই চা কিংবা পাট জাহাজের মাল, তাদেরই রপ্তানি কোম্পানির পণ্য ঐ মাল, ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ এজেন্টদের একটা বড় ভূমিকা ছিল ব্যবসা চালানোর জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ সংগ্রহ করার ব্যাপারে—নামজাদা এজেন্টের গ্যারান্টি এতে অপরিহার্য, আর বড় এজেন্টরা অনেকে আবার ব্যাংকের ডিরেক্টর পারস্পরিক সমঝোতা দ্বারা একে অপরের সুবিধা করে দিতে পারত।

দিশি পুঁজিপতিদের হাতে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থা একটু অন্যরকম হল। প্রথমতঃ বেশীর ভাগ দিশি ম্যানেজিং এজেন্ট ছোট, কলকাতার ইংরেজ এজেন্টদের মতন নানান কোম্পানির পরিচালক নয়। বোম্বাই সুতি শিল্পে একেকটি এজেন্ট একটি কি দুটি কারখানা চালাত বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত; এর পর অবশ্য কিছুটা কেন্দ্রীকরণ ঘটেছিল এবং ১৯২৭ সালে শুল্ক কমিশনের হিসেবে দুইটি বড় এজেন্ট ২৩ কারখানার পরিচালক, বাকী ৬০ খানার পরিচালক ছোট এজেন্টরা। দ্বিতীয়তঃ দিশি ম্যানেজিং এজেন্সিতে পুরুষানুক্রমে

উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হত, বিশেষ কোন কুশলতার অপেক্ষা না রেখে। তৃতীয়তঃ এস. ডি. মেহ্‌তা দেখিয়েছেন কি ভাবে ম্যানেজিং এজেন্টরা অন্যায্য রকমের বেশী দস্তুরি ও পারিশ্রমিক নিত কারখানার শেয়ার মালিকদের বঞ্চিত করে ; এটা অবশ্য ইংরেজ এজেন্টরাও করে থাকত। ১৯১৩ সালে কোম্পানি আইন পাশ হয় শেয়ার মালিকের স্বার্থ রক্ষা করতে, কিন্তু এজেন্টদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। ১৯৩৬ সালে এই আইনের সংশোধন করা হয় যাতে এজেন্টরা নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলিকে ডিরেক্টরদের মনোনয়নে এবং দস্তুরি ইত্যাদির ব্যাপারে অযথা শোষণ না করতে পারে ; কিন্তু এই আইন দেশী-বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সির চাপ ও সরকারের অবহেলার কারণে প্রায় নিষ্ফল হয়। ১৯৫৬ সালে নতুন কোম্পানি আইন এই এজেন্সি ব্যবস্থার কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও ক্রম-অবসান সূচনা করে।

৪

দিশি বণিকেরা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, ম্যানেজিং এজেন্সি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আয়ত্ত করে বটে ; অপর পক্ষে তাদের অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, আঞ্চলিক বিশেষত্ব তাদের উদ্যোগের গঠন ও চালচলনের ওপর ছাপ এঁকে দেয়। যেমন ধরা যাক্ বণিক সভা (chamber of commerce) : প্রথমে এই দিশি বণিকসভাগুলি তৈরী হয় একত্রে ইংরেজ বণিকসভার একচেটিয়া প্রতিপত্তি নিবারণ করতে। এই প্রতিপত্তির দরুণ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স জাতীয় ইংরেজ ব্যবসাদার গোষ্ঠী আইনসভায় নিজেদের স্বার্থ অনুসারে শুল্ক নীতি, কাঁচামালের বাজারে নিজেদের সুবিধা মতন দর বেঁধে দেওয়া, পরিবহণ ব্যাপারে সরকারকে ইংরেজ উদ্যোগের অনুকূল পথে প্রণোদিত করা, ইত্যাদি ব্যাপারে স্বার্থগোষ্ঠী (interest group) হিসেবে সফল হয়েছিল। এই ধারার চাপ আটকাতে বেঙ্গল নেশনল চেম্বার অফ কমার্স-এর প্রতিষ্ঠা (১৮৮৭), জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় সমসাময়িক। অনুরূপ ভাবে ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস্ চেম্বার বোম্বাইতে (১৯০৭) এবং সাদার্ন ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স মাদ্রাজে (১৯০৯)। কিন্তু শীঘ্রই এর পাশাপাশি কেন গড়ে উঠল আলাদা মারওয়াড়ি, মুসলমান, চেট্টি, ভাটিয়া ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বণিক সভা ? অথবা, নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর পোষকতা কেন ? অথবা, আধুনিক উদ্যোগের সঙ্গে যুগপৎ সাবেকি মনোবৃত্তি ও পরিবার ব্যবস্থা এবং ব্যবসায় চালচলন কি ভাবে মিলল ? অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার সঙ্গে দিশি বণিককুলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিও দেখতে হয়।

মারোয়াড়ি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা বেশ ধরা পড়েছে টম্ টিম্‌বার্গের গবেষণায়। আঠেরো শতকের আগেই মারওয়াড়ের বেনেরা বেশ পয়সা করেছিল সুরাট-আগ্রা-দিল্লী বাণিজ্য পথের দৌলতে, এবং রাজপুত সামন্ত রাজাদের মহাজন হিসেবে কিংবা সৈন্যবাহিনীর মোদি বা সরবরাহকার হিসেবে কিংবা রাজকোষের ও রাজস্ব সংগ্রহের ভার নিয়ে। আগ্রা-দিল্লীর রাজপাট শেষ হল, সুরাট বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র আর রইল না, রাজস্থানের সামন্তরা হল ইংরেজদের

পদানত—সাবেকি ব্যবসার সুযোগ উষর রাজস্থানে বিশেষ রইল না। ফলত মারওয়াড়ের বেনেরা, বিশেষ করে শেখাওয়াটি অঞ্চলের আগরওয়াল ওসওয়াল ইত্যাদিরা, নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করল—দাক্ষিণাত্যে এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায়। উনিশ শতকের আগের আগন্তুক মারোয়াড়িরা ছোট বড় মহাজনি ও হুণ্ডির কারবারে প্রতিষ্ঠিত, উনিশ শতকে যারা এল তারা বর্ধমান রপ্তানি ব্যবসায়ের অন্তর্দেশীয় বিভাগটায় জায়গা করে নিল পাইকারি, দালালি ইত্যাদি ভূমিকায়। উদাহরণতঃ বিড়লা পরিবার। ১৮৫৭ সালে পিলানি থেকে উটের পিঠে আমেদাবাদ পৌঁছে রেলপথে বোম্বাই পৌঁছলেন শিব নারায়ণ বিড়লা (১৮৩৮-১৯০১)। ১৮৬৩-৬৪ সালে তুলোর বাজার যখন তেজী আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের ফলে, শিব নারায়ণ প্রচুর লাভ করলেন তুলো ও আফিং-এর দালালিতে। ১৮৯৮-১৯০১ সময়ে বোম্বাইতে প্লেগের ভয়ে অনেকে সরে পড়ল, সেই সময় বিড়লারাও পারিবারিক বন্ধু তারাচাঁদ ঘনশ্যামদাস শেঠের আনুকূল্যে কলকাতায় এসে কাঁচা পাট আর আফিং ব্যবসায় ঢুকে পড়ল। শিবনারায়ণের ছেলে বলদেওদাস (১৮৬৪-১৯৫৬) ও পৌত্র যুগল কিশোর এবং ঘনশ্যামদাস প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পাটের চাহিদা বাড়ায় তাদের পুঁজি প্রায় চারগুণ বাড়াতে পারলেন। ইতিমধ্যে তারা এন্ড্রু ইউল ম্যানেজিং এজেন্সির দালাল হিসেবে ঐ কোম্পানির কলকারখানার বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। ১৯১৮ সালে প্রথম একটা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বিড়লা ব্রাদার্স প্রতিষ্ঠিত হল, ১৯১৯ সালে বিড়লা জুট কোম্পানি, ১৯২০ সালে গোয়ালিয়রে জিয়াজিরাও সুতি কারখানা। এই ভাবে পাইকারি দালালি কাঁচামালের যোগানদার থেকে শিল্পে প্রবেশ মহাযুদ্ধের পরে। ঘনশ্যামদাস বিড়লা (১৮৯৪-১৯৮৩) ইংরেজ কোম্পানির কাছ থেকে অনেক চালু কারখানা ক্রয় করে ব্যবসা বাড়ালেন, যথা এন্ড্রু ইউলের থেকে কেশোরাম কটন এবং মর্টন থেকে চিনি ইত্যাদির কারখানা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তারও আগে ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে চিনি, বীমা, কাগজ কল এল বিড়লাদের হাতে। একই সময়ে ঘনশ্যামদাসের নেতৃত্বে ভারত চেম্বার অফ কমার্স ও তারপর ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অফ কমার্স বিড়লাদের প্রতিষ্ঠা বাড়াল এবং তাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হল। স্বাধীনতার পরে ভারী শিল্পে তাদের বিনিয়োগ বাড়তে থাকে এবং নতুন দিকেও যায়। ১৯৪৮ সালে বিড়লাদের হাতে ১২ খানা কোম্পানি, সংগৃহীত পুঁজি (paid up capital) ২০.৬ কোটি টাকা।

বিড়লা পরিবারের অনুরূপ ধাঁচে মারওয়াড়ি উদ্যোগ এগিয়েছিল খুব ধীরে ও বিলম্বে শিল্পায়নের দিকে। বিপরীত দৃষ্টান্ত বোম্বাইতে পারসিদের উদ্যোগ। তারা চালু কারখানা কিনে শুরু করেনি, নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছিল ১৮৫০-এর দশক থেকে। এবং এতেই তাদের দম ফুরায়নি। যথা, টাটা পরিবার। নসেরওয়নজি টাটা এবং কল্যাণদাসের অংশীদারী ব্যবসা ছিল দালালি এবং ১৮৬০-৬৪ সালে বোম্বাইতে তুলো রপ্তানি করে যে অর্থাগম হয় তা ১৮৬৪ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে আকস্মিক মন্দায় নষ্ট হল।

ইতিমধ্যে নাসেরওয়নজি নিজে জাপান ঘুরে এসেছেন, হংকং এবং সাংঘাইতে দপ্তর খুলে বসেছেন, ছেলে জামসেদজিকে পাঠিয়েছেন ইংলণ্ডে হাতেকলমে কাজ শিখতে। ১৮৬৭-৬৮ সালে ইথিওপিয়ার যুদ্ধে কন্ট্রাকটরি করে সদ্য দেউলিয়া নসেরওয়নজি আবার হাতে টাকা পেলেন। দু বৎসর পর তার ছেলে জামসেদজি (১৮৩৯-১৯০৪) সেই টাকায় সুতি কারখানা আলেক্‌জান্দ্রা মিল স্থাপন করে। ১৮৭৭ সালে সর্বাধুনিক কারিগরি নিয়ে এম্‌প্রেস মিল শুরু হয় নাগপুরে। তার পর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, আধুনিক হোটেল ব্যবসায়, এবং সর্বোপরি ইস্পাত ও এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে টাটা পরিবার সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগের পত্তন করে।

কিছু ব্যবসায় ঐতিহাসিকদের মতে সাবেকি জাত বেনে যারা তাদের নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি করার মনোবৃত্তি ছিল না, শিল্পায়নের দিকে ঝোঁক ছিল না, তারা সওদাগরি আর অর্থের লেনদেন করে লাভের অংকটা স্ফীত করানোর ধান্দায় ছিল কেবল, যেমন ছিল প্রাক্‌-শিল্প-বিপ্লব মানসিকতা। বিপরীত ধরনের ব্যবসা মনোবৃত্তির উদাহরণ ধরা হয় পারসিদের। সাবেকি বণিকদের অনুরূপ মনোবৃত্তি জাপানেও দেখা যায়; হার্শসায়ার-এর মতে মেইজি প্রত্যানয়নের (**Meiji Restoration**) পর্বে উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ শোনিন বা বণিক সম্প্রদায়ের, ৪৫ শতাংশ অভিজাত সামুরাই, এবং বাকীরা অন্যান্য অ-বণিক সম্প্রদায়ের।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাবেকি বেনেরা চিরকাল নতুন উদ্যোগ আর শিল্পায়নের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। বোম্বাইতে পারসিদের দেখাদেখি গুজরাটি বেনেদের সুতি কারখানা খুলতে দেখা যায়। আমেদাবাদে গোড়ায় অবশ্য রণছোড়লাল ছোটালাল শিল্প উদ্যোগ আরম্ভ করেন—তিনি নাগর ব্রাহ্মণ এবং ব্যবসার জগতের নয়, ছিলেন সরকারি চাকুরে—কিন্তু শীঘ্রই বেনেরা তাঁর ব্যবসায়িক সাফল্য অনুকরণ করে এবং ১৮৯১ সালে ৯ খানা কারখানার মধ্যে ৫ খানা সাবেকি বেনেদের, ১৯২০ সালে ৫১ খানার মধ্যে ৩০ খানা। মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও, একটু বিলম্বে, হাল্কা শিল্পে প্রবেশ করে পূর্বভারতে—এবং এই বিলম্বের একটা কারণ বোধহয় সেখানে ইংরেজ পুঁজির একচেটিয়া আধিপত্য।

মোট কথা সাবেকি বেনে সম্প্রদায়ের অভ্যস্ত ব্যবসা থেকে নতুন পথে যেতে দীর্ঘকালীন মানসিক প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় না, কেবল কিছু হেরফের বিভিন্ন অঞ্চলে যার জন্য আঞ্চলিক সুযোগ-সুবিধা কিছুটা দায়ী। সুতরাং অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সম্ভব বণিকদের প্রবণতার, তারই মধ্যে সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহ্য নানা ভাবে ফুটে ওঠে। যথা, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বণিক সভা গঠন। যথা, মহারাষ্ট্রে মারোয়াড়িদের নিজেদের মধ্যে বাজারের সুদের হারের চেয়ে নীচু হারে ঋণের আদান-প্রদান। যথা, যৌথ পরিবারের কাঠামোটাকে আধুনিক কোম্পানির গড়নের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। সব শেষে এটাও বলা দরকার যে এই রকম প্রবণতা আধুনিক পুঁজিপতি উদ্যোগের পরিপন্থী হবে তার কোন মানে

নেই। জাপানী অর্থনৈতিক শোজি ইটো দেখিয়েছেন যে মাদ্রাজের চেট্টিদের যৌথ পরিবার প্রকৃতপক্ষে নতুন উদ্যোগে সাহায্য করেছিল কেননা ইংরেজ ব্যাংকের সাহায্য বিনা, শিল্প ব্যাংকের (industrial bank) সাহায্য বিনা, দুর্বল শেয়ার বাজারের সাহায্য বিনা, যৌথ পরিবারের পুঁজি একত্র করে উদ্যোগ এক মাত্র পথ ছিল। জাপানেও বড় জাইবাট্‌সুর (অর্থাৎ বিরাট ব্যবসায়পুঞ্জ, যেমন মিট্‌সুই, মিট্‌সুবিশি, ইত্যাদি) ইতিহাসেও দেখা যায় পারিবারিক কাঠামোর রচনাত্মক ভূমিকা।

এই পরিচ্ছেদে খুব সংক্ষেপে আমরা সাবেকি সওদাগরি আর মহাজনি থেকে শিল্পপতির ভূমিকায় দিশি পুঁজির প্রবেশ ব্যাপারটা দেখলাম। অবশ্যই অন্যান্য পরিচ্ছেদে ছড়িয়ে থাকবে এই ইতিহাসের নানা টুকরো, কেননা হালের ইতিহাসের একটা মূল উপাদান হল দিশি পুঁজিপতি শ্রেণীর উত্থান ও উত্থান।

অধ্যায় : ৯

শিল্পায়ন, কারখানা, শহর

আমরা দেখেছি যে ঔপনিবেশিকতার আওতায় প্রথমে ঘটেছিল শিল্প বিনষ্টি বা অবশিল্পায়ন উনিশ শতকের প্রথম দিকে। এর পর একটা নবশিল্পায়ন গোছের শুরু হল নতুন কলকারখানায় বিদেশী যন্ত্রবিদ্যার দৌলতে। প্রথম পর্যায়ে শিল্প পিছু হটেছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ে চলল খুঁড়িয়ে। শিল্পায়নের এই শম্বুকগতি আন্দাজ করা যায় জাতীয় আয়ের প্রাকরণিক ক্ষেত্র (sectoral) হিসেবে অনুপাত থেকে : ১৯০০-০৪ সালেও জাতীয় আয়ের প্রতি টাকার একশ পয়সার মধ্যে শিল্পসংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ আয় ১৩ পয়সারও কম, ১৯২৫-২৯ সালে ১৬ পয়সার নিচে, আর ১৯৪০-৪৪ সাল পর্যন্ত ১৭ পয়সার নিচে। যেখানে ভারতে ১৯০০-০৪ সালে জাতীয় আয়ের ১৩ শতাংশ দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ, ইংলণ্ডে একশ বছর আগে ১৮০১ সালে এই অনুপাত ২৩ শতাংশ। এই হিসেবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রের মধ্যে কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্প এবং আধুনিক কল-কারখানা, দুটোই ধরা হয়েছে—এ দুটি আলাদা করলে ভারতের আধুনিক শিল্পজ উৎপাদন আরও অনেক নিচে তলিয়ে যায়।

সারণি ৯·১

কারখানা ও ক্ষুদ্র শিল্পজনিত জাতীয় আয়,
দশ বৎসর অন্তর (কোটি টাকার হিসেবে)

বৎসর	কারখানা	ক্ষুদ্র শিল্প
১৯০০/০১	২৯·৮	১২৫·১
১৯১০/১১	৫৭·০	১৫৬·৫
১৯২০/২১	৭২·৯	১৩৩·৭
১৯৩০/৩১	৯৭·৯	২২৩·৩
১৯৪০/৪১	১৭৭·৯	১৯৬·৩
১৯৪৫/৪৬	২৭৪·৯	১৮৪·০

(আকর : শিবসুব্রহ্মণিয়ন, 'ইন্ডিয়ন ইকনমিক এন্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি রিভিউ, খণ্ড ১৪, সংখ্যা ৪ ; এই হিসেব ১৯৩৮-৩৯ মূল্যমানে ধ্রুবিত)

১৯৪১-৪২ সাল থেকে প্রথম কারখানা শিল্প জনিত আয় ক্ষুদ্র শিল্পকে ছাড়িয়ে যায়। তার আগে সর্বদাই ক্ষুদ্র শিল্পের হিস্যা বেশি। অবশ্য ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে ছোট মাপের কল ব্যবহার করে এমন শিল্প বাড়ছে, সমস্তটাই প্রাচীন কুটির শিল্প নয়। তবু এই হিসেব থেকে নবশিল্পায়ন কতটা সীমিত বোঝাই যাচ্ছে।

সমগ্র অর্থনীতির তুলনায় শিল্পজ উৎপাদন কম, তারমধ্যে বড় কারখানায় উৎপাদন আরও কম ; তবু শিল্পায়নের গতি ক্রমে কেমন বাড়ছে এই শতাব্দীতে তার আন্দাজ দেয় ৯·২ নম্বর সারণি। মোটামুটি ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার (কম্পাউণ্ড) ১·৮২ শতাংশ।

সারণি ৯·২
কারখানা শিল্পে কর্মী সংখ্যা ও নিট্ উৎপাদন
(পাঁচ বৎসর অন্তর)

বৎসর	কর্মী সংখ্যা (লক্ষের হিসেবে)	উৎপাদন (কোটি টাকার হিসেবে)
১৯০০/০১	৫·৪	২৯·৮
১৯০৫/০৬	৭·৫	৬১·৬
১৯১০/১১	৮·৭	৫৭·০
১৯১৫/১৬	৯·৭	৭০·৫
১৯২০/২১	১২·৫	৭২·৯
১৯২৫/২৬	১৪·৩	৮৪·৫
১৯৩০/৩১	১৫·১	৯৭·৯
১৯৩৫/৩৬	১৫·৭	১২৮·৮
১৯৪০/৪১	১৯·৬	১৭৭·৯
১৯৪৫/৪৬	২৯·৫	২৭৪·৯

(আকর : শিব সুব্রহ্মণিয়নের হিসেব, উল্লিখিত সারণি ৯·১ ; উৎপাদনের হিসেব ১৯৩৮-৩৯ মূল্যমানে ধ্রুবিত ; কর্মী সংখ্যার হিসেব যে সব কারখানা সারা বৎসর চলে না তাদের দরুন হেরফের সংশোধন করে করা হয়েছে)

সারণি ৯·৩ থেকে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে জাতীয় অর্থনীতিতে কোন শিল্পের কি ওজন। দেখা যায় যে কার্পাস তন্তু ও বস্ত্রশিল্প আগাগোড়া প্রাধান্য বজায় রেখেছে, প্রথম দিকে এর হিস্যা সমগ্র শিল্পজ উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ এবং তারপরেও বেশ বড় অংশ। সূতীকলের পরেই পাটকল আর চিনিকলের জায়গা। লোহা-ইস্পাত দেরি করে এসে লাফিয়ে এগিয়েছে। বাকি যা রইলো, কাগজ, সিমেন্ট, পশম, দেশলাই শিল্প, তারা সব নিট শিল্পজ উৎপন্নের ছোট ছোট অংশীদার।

সারণি ৯·৩

প্রধান কারখানা শিল্পের নিট্ উৎপাদন

(কোটি টাকার হিসেবে)

শিল্প	১৯০০/০১	১৯২৫/২৬	১৯৪৫/৪৬
কার্পাস তন্তু ও বস্ত্র	১০·২	২৬·৫	৫৮·৩
পাট	৫·২	১১·৬	১০·৭
চিনি	০·৭	২·২	৮·২
কাগজ	০·২	০·৪	১·৬
সিমেণ্ট	- ন -	০·৪	২·৮
পশম	০·১	০·৭	১·৫
লোহা ও ইস্পাত	- ন -	৩·৪	৭·৮
দেশলাই	- ন -	১·১	২·৩

([illegible] “ন”
নগণ্য বা শূন্য)

২

আমরা এখন শিল্পক্ষেত্রের বড় তরফটাকে নিয়েই আলোচনা করব, বিশেষভাবে এইজন্য যে কার্পাস বস্ত্রশিল্পের বিরাট ইতিহাস উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। পুরানো ক্ষুদ্রশিল্পের সঙ্গে সুতিকল শিল্পের টানাপোড়েন অনুধাবনযোগ্য। দিশি পুঁজি এই শিল্পের প্রধান উদ্যোক্তা, এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এই শিল্পের একটা গভীর যোগাযোগের ফলে এই ইতিহাসের একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। এই সব কারণে যদি প্রতিনিধিস্বরূপ শিল্প আলোচনার জন্য বেছে নিতে হয়, বৃহৎ শিল্পে কার্পাস তন্তু ও বস্ত্র শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁত শিল্প।

দিশি বণিকদের সম্বন্ধে পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি কিভাবে বোম্বাইতে পারসি, গুজরাটি ও বোহ্‌রা মুসলমান ইত্যাদি সম্প্রদায় কার্পাস তন্তু ও বস্ত্র তৈরির আধুনিক কারখানার ব্যবসায়ে ঢুকে পড়ে। পারসি কাওয়াসজি নানাজি দাভার কর্তৃক ১৮৫৪ সালে প্রথম কারখানার গোড়াপত্তন থেকে এই শিল্পের ইতিহাস কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। ১৮৫৪ থেকে ১৮৮০ সালের প্রথম পর্যায়ে তিরিশটি কারখানা গড়ে ওঠে, যার মধ্যে তেরখানাই পারসিদের। এই সময়ে ১৮৬০-৬৪ সালের মার্কিন গৃহযুদ্ধের ফলে তুলোর বাজার গরম হওয়ায় অনেক তুলোর ব্যবসায়ীর হাতে প্রচুর পয়সা আসে, চীনের বাজার ভারতের বহির্বাণিজ্যের জন্য খুলে যেতে থাকে, রেলপথ দক্ষিণাত্যে বিস্তারিত হওয়ায় কাঁচামালের যোগান সুব্যবস্থিত হয়। অপর দিকে, ১৮৬০-৬৪ সময়টায় কাঁচামালের দাম বাড়ায় কারখানা মালিকদের অসুবিধা হয়েছিল; এর পর

১৮৬৪ সালের মন্দাতে অনেক ঝুঁকিদার ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যায় ; ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল চালু হওয়ার পর বোম্বাইয়ের বন্দরে ইংলণ্ডের সুতী বস্ত্র আমদানি বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের ভাবী প্রতিযোগী আমেদাবাদ-শিল্পের গোড়াপত্তন করেন ১৮৬১ সালে রণছোড়লাল ছোটালাল।

১৮৮০ থেকে ১৮৯৫ একটা নতুন পর্যায় যেখানে আগের চেয়ে অনেক দ্রুত বৃদ্ধি দেখা যায় কার্পাস শিল্পে। ১৮৮০-র দশকে নির্মিত কারখানার সংখ্যা ৩৯ এবং অনেকের মতে ব্যবসা তখন এত লাভ আনছে যে পুরো বিনিয়োজিত পুঁজি উঠে আসে চার বৎসরের মধ্যে। এর একটা বড় কারণ : চীন দেশে ভারতীয় কার্পাস তন্তুর বাজার বিরাটভাবে বাড়তে থাকে (১৮৮০-৮৪ সালে সমস্ত রপ্তানি তন্তুর ওজন ৩·৪ কোটি পাউণ্ড, তার মধ্যে চীনে রপ্তানি হল ৩ কোটি পাউণ্ড)। নতুন আধুনিক কল বিদেশ থেকে আমদানি হতে থাকে সুতিকলের জন্য। তন্তু ছাড়াও বস্ত্র উৎপাদনের দিকে ঝোঁক দেওয়া হয়। এই শ্রীবৃদ্ধি ম্যান্‌চেসটরকে চিন্তিত করে তোলে, তারা ইংরেজ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে, ফলে ভারত সরকার ১৮৭৮-৭৯ সালে ম্যান্‌চেসটরে উৎপন্ন আমদানির ওপর বৃটিশ ভারতে শুল্ক হ্রাস করে, এবং ১৮৮২ সালে আমদানি শুল্ক একেবারে লুপ্ত করা হয়। শুরু হয় ভারতীয় মিল মালিকদের সঙ্গে ম্যান্‌চেসটর স্বার্থগোষ্ঠীর লড়াই যার বিবরণ রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে কিছু আছে। ম্যান্‌চেসটরের উদ্বেগ এই সময় বিশেষ প্রবল, কারণ ১৮৭৩-১৮৯৬ অবধি একটা বিরাট মন্দা তাদের ইউরোপীয় বাজারকে সঙ্কুচিত করে তুলেছিল। এই মন্দার একটা ফল, কার্পাস বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতির দর পড়ে যাওয়া, এটা ভারতীয় মিল মালিকদের পক্ষে বিরাট সুযোগ, সস্তায় যন্ত্রপাতি আমদানি করে মিলের সংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধি।

তৃতীয় পর্যায়, ১৮৯৬-১৯১৪ সাল, আগের পর্যায়ের তুলনায় সুতিকলের পক্ষে প্রতিকূল। জাপান ইতিমধ্যে শক্ত প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়িয়ে পূর্ব এশিয়ার বাজার থেকে বোম্বাইয়ের সুতী হঠিয়ে দিচ্ছে। ভারতীয় কার্পাস তন্তুর রপ্তানি চীনের দিকে : ১৯০৪-০৮ সালে ছিল ২২ কোটি পাউণ্ড ওজনের, ১৯০৯-১৩ সালে দাঁড়াল ১৭ কোটি পাউণ্ড, এবং ১৯২৫ নাগাদ ২ কোটি পাউণ্ড। তার ওপর ১৮৯৬ সাল থেকে সমতুল্য করনীতি (Countervailing excise duty) অর্থাৎ ভারতীয় সুতিকলের উৎপন্নের ওপর বিশেষ শুল্ক বা কর জারী হল', ম্যান্‌চেসটরের সুবিধার্থে। ভারতীয় টাকার মূল্য ১৬ পেন্সে বেঁধে দেওয়া হল। তাছাড়া ১৮৯৬ সালে প্লেগ মহামারীর ফলে বোম্বাইতে সাময়িকভাবে শ্রমিকদের পলায়ন, ১৮৯৬-৯৯ সালে মহারাষ্ট্র এবং অন্যত্র দুর্ভিক্ষের ফলে কাপড়ের চাহিদার পতন। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দুটি আশাব্যঞ্জক ধারা দেখা যায়। প্রথমতঃ, ১৯০৫ থেকে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে বিদেশী কাপড় বয়কট আন্দোলন : এর প্রভাব বাজারে দীর্ঘস্থায়ী এবং ভারতব্যাপী না হলেও, পরে এই ধাঁচের বয়কট গান্ধীর নেতৃত্বে বিরাট প্রভাবশালী হয়ে ওঠে জানা কথা। দ্বিতীয়তঃ, ক্রমশঃ জাপানের প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের সুতোর বাজার পূর্ব এশিয়ায় নষ্ট হওয়ায় বোম্বাই বাধ্য হয়ে কাপড় বানানোর দিকে

জোর দিল। বোম্বাইয়ের তাঁত ও টাকু (loom and spindle) কি অনুপাতে ছিল তার হিসেব থেকে এটা স্পষ্ট। ১৯০১ সালে ৪৯ লক্ষ টাকু আর ৪১ হাজার তাঁত যন্ত্র, ১৯০৯ সালে ৬০ লক্ষ টাকু আর ৭৬ হাজার তাঁত—অর্থাৎ টাকু বাড়ল বাইশ শতাংশ আর তাঁত যন্ত্র বাড়ল পঁচাশি শতাংশের হারে। সুতো তৈরি আর রপ্তানি থেকে বোম্বাই ক্রমে কাপড় তৈরি ও দিশি বাজার দখলের চেষ্টায় লাগল। ১৯০০-১৪ সালের মধ্যে মিলের কাপড় উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি বাড়ল, আর ম্যান্‌চেসটরের আমদানি কাপড়ের পরিমাণ বাড়ল সামান্যই।

এই শেষোক্ত দুই ধারা জোরদার হল চতুর্থ পর্যায়ে, ১৯১৪-২২ সালে। ১৯০৯-১৪ সালে আমদানি সুতী কাপড়ের পরিমাণ গড়ে ২৬২ কোটি গজ, ১৯১৪-১৯ সালে ১৮১ কোটি গজ, ১৯১৯-২৪ সালে ১৩৩ কোটি গজ। টাকু ও তাঁত যন্ত্রের অনুপাত ১৯১৬ সালে ৫৯ : ১, ১৯২৯ সালে ৫০ : ১। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিদেশী আমদানি কমায় দিশি কাপড় বাজার দখল করার সুযোগ পায়। তাছাড়া ১৯২১ সাল থেকে অসহযোগ আন্দোলনে বিদেশী কাপড় বর্জন একটা বড় ভূমিকা পায় ; যদিও মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ হস্তশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে, মনে হয় যে প্রকৃত লাভ করে বোম্বাই ও আমেদাবাদের দিশি সুতী কারখানাগুলি।

১৯২২ থেকে ১৯৩৯ বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবধি : পর্যায়ের শুরুতে প্রতিকূল অবস্থা থেকে সমৃদ্ধিতে উত্তরণের কাহিনী। বিশের দশকে অবস্থা প্রতিকূল নানা কারণে : একদিকে মহাযুদ্ধকালীন ব্যবসাবৃদ্ধি মন্দায়িত হয়, অপরদিকে জাপানী প্রতিযোগিতা প্রবল হয়ে ওঠে ; ফলতঃ মিল মালিকেরা শ্রমিকদের মজুরি কমাতে চেষ্টা করে এবং কর্মীর সংখ্যা কমাতে চেষ্টা করে যার ফল বার বার বিরাট আকারের ধর্মঘট। একটা হিসেব অনুসারে ১৯২৩ সালে বোম্বাই মিলগুলির নিট লাভ ১৯২২ সালের লাভের তুলনায় মাত্র এক-দশমাংশ এবং এই ধারার পরিণতি ১৯২৫ সালে নিট লোকসানে। তবে মিল মালিকদের দ্বারা উপস্থাপিত এই ধরণের হিসেব খুব নির্ভরযোগ্য নয়। নির্ভরযোগ্য হল কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত তুলোর হিসেবটা : ১৯২১/২২-এর তুঙ্গ ২২০৩ হাজার গাঁট তুলো, ১৯২৩/২৪ সালে নিম্নতম ১৯১৮ হাজার গাঁট এবং পরবৎসর সামান্য উন্নতির পর আবার ১৯২৫/২৬ সালে ২১১৩ হাজার গাঁট। ১৯২৬ থেকে ধীরে উন্নতি, ১৯২৭-২৯ বৎসরগুলিতে শ্রমিক ধর্মঘট জনিত সমস্যা ছাড়া, প্রায় মহাযুদ্ধ অবধি অব্যাহত থাকে। এই উন্নতি ঠিক বস্ত্র শিল্পপতিদের ব্যবসায়িক কুশলতার দরুণ বা শিল্পের তক্‌নিকি বা কারিগরি উন্নতির জন্য নয়, বৃটিশ সরকারের নীতির পরিবর্তনের জন্য। জাপানী শিল্পের কারিগরী উন্নতি ও ব্যবসায়িক কর্মকুশলতার দরুণ জাপানের ভারতীয় বাজারে এবং এশিয়ার বাজারে প্রতিপত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ম্যান্‌চেসটরের শিল্পপতিদের আমদানি শুল্ক সম্বন্ধে আপত্তি নরম হয়ে আসে। কারণ অবাধ বাণিজ্যের লাভ যদি জাপানী পিঁপড়েতে খেয়ে যায়, ম্যান্‌চেসটরের আপত্তি নেই অবাধ বাণিজ্য থেকে সরে এসে আমদানি শুল্কের দ্বারা জাপানী আমদানি ঠেকাতে। এদিকে দিশি শিল্পপতিরাও নানা

আবেদন নিবেদন দ্বারা এবং শ্রমিক আন্দোলন ধর্মঘটের দ্বারা ভারত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে বস্ত্রশিল্পের অবস্থার উন্নতিকল্পে সরকারি সাহায্যের জন্য। অবস্থার এই পরিবর্তনের প্রথম ফল এই যে ১৯২৫ সালে সমতুল্য করনীতি (countervailing excise) বাতিল হয়, অর্থাৎ দিশি কারখানার উৎপাদনের ওপর বিশেষ কর রদ করা হয়। ১৯২৭ সালে শুল্ক পর্ষৎ (ট্যারিফ বোর্ড) নিযুক্ত হয় এবং নতুন করনীতি প্রস্তাব করে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৯ সাল অবধি পর্যায়ক্রমে অনেকগুলি শুল্ক আইন দ্বারা ক্রমান্বয়ে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে শিল্পসংরক্ষক আমদানি শুল্কের (protective tariff) আশ্রয় দেওয়া হয়। বৃটিশ আমদানি ও অ-বৃটিশ আমদানির মধ্যে শুল্কের পার্থক্য এনে জাপানকে শায়েস্তা করার চেষ্টা হয়। এমনকি ১৯৩৩ সালে জাপানী আমদানির ওপর শতকরা পঁচাত্তর হারে শুল্ক বসানো হয়। অপরদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে চুক্তির দ্বারা প্রতিযোগিতার চাপ কমানোর চেষ্টা চলে, যথা ১৯৩৪ সালে ভারত-জাপান চুক্তি ও ১৯৩৬ সালে বোম্বাই-ম্যানচেসটর বা লিস্-মোদি চুক্তি। মোদ্দা কথা নানা কৃত্রিম উপায়ে প্রতিযোগিতা কমিয়ে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পপতিদের বাড়বার সুযোগ দেওয়া হয়। ফলতঃ ১৯২৪/২৫ থেকে ১৯৩৯/৪০ সালের মধ্যে মোট কার্পাস কারখানার সংখ্যা বাড়ে ২৫৮ থেকে ৩৮৯, তাঁতকলের সংখ্যা ১·২ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ, এবং উৎপাদনের বৃদ্ধির অনুপাত দাঁড়ায় কার্পাস তন্তুর ক্ষেত্রে ৫৩ শতাংশ ও বস্ত্রের ক্ষেত্রে ৯৩ শতাংশ। তবে অধ্যাপক অমিয় বাগচী দেখিয়েছেন যে আমদানি শুল্কের কৃত্রিম আশ্রয়ের কল্যাণে কর্মদক্ষতা ও কারিগরী উন্নতি ব্যাহত হয়েছে বোধহয়।

১৯৩৯ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তার পরবর্তী বৎসরগুলিতে বৃদ্ধি আরও দ্রুত দেখা যায়। মালিকদের লাভ ফেঁপে ওঠে অভূতপূর্ব ভাবে : ভাল হারে, অর্থাৎ শতকরা ১৫ থেকে ২০ টাকা হারে, ডিভিডেণ্ড দেয় এমন কোম্পানির সংখ্যা ১৯৪১ সালে দাঁড়ায় মোটের ৪৪ শতাংশ, ১৯৪২ সালে ৬৯ শতাংশ। জাপান মহাযুদ্ধে শত্রুপক্ষে, সুতরাং জাপানী প্রতিযোগিতা বাজারে নেই ১৯৪১ থেকে, আর ইংলণ্ড থেকে আমদানি প্রায় বন্ধ। তার ওপর সামরিক সরবরাহের জন্য প্রচুর সওদা করতে থাকে মিত্রশক্তি ভারতীয় বস্ত্র কারখানা থেকে, সেটাও লাভের ব্যাপার। কাপড়ের টানাটানি শুরু হয় বাজারে, মার্চ ১৯৪৩ নাগাদ কাপড়ের গড় দাম প্রাক্-মহাযুদ্ধ দামের পাঁচগুণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং অন্যান্য শিল্পের মতন কাপড়কল মালিকদের পক্ষেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একটা লাভের সময়।

সুতিকারখানার উন্নতির ইতিহাসের সঙ্গে কাপড়ের কুটির শিল্পের কি সম্পর্ক? দেশের তাঁতীদের হাল কেমন হয়েছিল অবশিল্পায়নের ওপর পরিচ্ছেদে কিছু বলা হয়েছে।

তাদের সামগ্রিক উৎপাদন বিশ শতকের গোড়ায় কম ছিল না কারখানা উৎপাদনের তুলনায়। বিশ শতকে তাদের কি অবস্থা দাঁড়াল তার বিবরণ জনগণনা (সেনসস), ১৯৩২ সালের শুল্ক আয়োগ (ট্যারিফ বোর্ড), ১৯৪১ সালের তথ্য অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনগুলি থেকে সংগ্রহ করা যায়।

১৯০১-০৫ সময়ে গড়ে বাৎসরিক উৎপাদন হস্তশিল্পে ৯১ কোটি গজের মতন, কারখানায় ৫৯ কোটি গজ। মহাযুদ্ধের সময়ে এই পার্থক্য কমে প্রায় সমান হয়ে আসে এবং ১৯২১-২২ সালে দেখা যায় কারখানার কাপড় উৎপাদন (১৮০ কোটি গজ) ছাড়িয়ে গেছে হস্তশিল্পের উৎপাদনকে (১১৪ কোটি গজ)। ১৯৪৪-৪৫ সাল নাগাদ এই ধারার পরিণতি দেখা যায় : তখন কারখানার উৎপাদন হস্তশিল্পের প্রায় তিনগুণ। গোড়ার দিকে কারখানা আর কুটির শিল্পের একটা পারস্পরিক পরিপূরক সম্পর্ক ছিল : অর্থাৎ কারখানাগুলি যেহেতু ২০ শতকের প্রথম দিক অবধি সুতো তৈরির দিকে জোর দিয়েছিল, তাঁতীদের সুতো যোগান দেওয়াতে উভয়েরই সুবিধা। কিন্তু কাপড় তৈরির দিকে কারখানাগুলি ঝুঁকতে শুরু করলে পরে হস্তশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একটা মজার ব্যাপার এই যে যদিও সমতামূলক করনীতি (countervailing excise) ইংরেজ সুতিকলের স্বার্থে সরকার চালু রেখেছিল ১৮৯৬-১৯২৫ সালে, পরোক্ষ ভাবে ভারতীয় কারখানায় উৎপন্নের ওপর এই বিশেষ শুল্ক হস্তশিল্পকে সাহায্য করে, কেননা তাঁতীর কাপড়ের ওপর কোন শুল্ক ছিল না। ১৯০৫ ও বিশেষ করে ১৯২১ সাল থেকে হস্তশিল্পের পেছনে জাতীয়তাবাদী নেতাদের সমর্থনও একটা বড় ব্যাপার। কিন্তু বিদেশী বর্জন আন্দোলনের আসল লাভটা দুর্বলতর তাঁতীদের হাত থেকে কারখানা মালিকেরা কেড়ে নিল। মহাত্মা গান্ধী হাতে তৈরি সুতোয় বোনা খাদি কাপড়কে জাতীয়তাবাদী পোষাক করলেন বটে, কিন্তু বোম্বাই-আমেদাবাদের কারখানাগুলি স্বদেশিয়ানার জোয়ারে অনেক বেশি এগিয়ে গেল কেননা তাদের কারিগরী সামর্থ্য বেশি। বিশেষ ধরনের শাড়ি, ধুতি ইত্যাদিতে বিশেষীকৃত (specialised) তাঁতীদের বাজার অবশ্য বজায় রইল। কিন্তু সাধারণভাবে বাজারে তাঁতীদের সঙ্গে কারখানার অসম প্রতিযোগিতায় বাঁচা তাঁতীদের পক্ষে সম্ভব হল অন্যায্য কম মূল্যে উৎপন্ন অথবা শ্রম বিক্রয় করে। এই সুযোগে হস্তশিল্পে মহাজন আর পাইকার-ফড়েদের প্রভুত্ব জোরদার হল। সমবায় আন্দোলন অবশ্য এই ধারার বিরুদ্ধে সচেষ্ট।

৩

আমরা উদাহরণত বয়ন শিল্পের সম্বন্ধে আলোচনা করে যে ধারা ও গতি দেখেছি সেটা মোটামুটি শিল্পায়নের সম্বন্ধে একটা ধারণা দেয়। দেখা যায় যে এই শতাব্দীতে শিল্পপতিদের লাভ, ডিভিডেণ্ড ইত্যাদি বাড়ে দুই মহাযুদ্ধের সময়ে ; ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়টা প্রাথমিক ধাক্কার পর শিল্পের অনুকূল। এই জন্য আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাঙ্ক-এর মত হল যে পাশ্চাত্য পুঁজিপতিদের সঙ্কটের কাল ভারতীয় পুঁজিপতিদের শ্রীবৃদ্ধির কাল, কেননা যে বিশ্বব্যাপী পুঁজি ব্যবস্থা উপনিবেশিত দেশের পুঁজিকে পদানত রেখেছে সেটা বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পশ্চিমী পুঁজির সর্বনাশ ভারতীয় পুঁজির পৌষমাস। গুণ্ডের ফ্রাঙ্ক তার বইতে সাধারণ ভাবে এবং ১৯৬৮ সালে একটা প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে ভারত

সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশে কোন কোন ঐতিহাসিক এই মতের অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু কথাটার মধ্যে সত্য এইটুকু যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একজনের হার মানে অপরের জিত। এটা না বললেও চলে, এটাকে ঠিক ব্যাখ্যা বলা চলে না, তার বদলে পুনরুক্তি (tautology যাকে বলে)। আর সত্যটিও আংশিক। এটা ঠিক যে সাধারণভাবে ভারতীয় ব্যবসায় ও লাভ স্ফীত হয়েছে মহাযুদ্ধগুলি ও ১৯২৯-এর মন্দার সময়ে, কিন্তু শিল্পায়ন মোটেও হয়নি। বরঞ্চ অধ্যাপক অমিয় বাগচীর কারখানা যন্ত্রপাতির আমদানির হিসেব থেকে মনে হয় যে ঐ সব সময়ে শিল্পায়নে পুঁজির বিনিয়োগ ও কারখানা গড়া মন্দীভূত হয়েছে। যেমন ১৯১৪-১৮ যুদ্ধের কালে যন্ত্রের গড় আমদানি ৩·৪ কোটি টাকা যেখানে তার আগের ও পরের চার বৎসরের গড় ৪·৮ কোটি এবং ৪·৮ কোটি ; অর্থাৎ মহাযুদ্ধ শিল্পের বিস্তারের পক্ষে অনুকূল ছিল না। আবার বিশ্ব মন্দার সময়টা, ১৯২৯-৩৩, গড় যন্ত্র আমদানি ৬ কোটি টাকা যেখানে তার আগের ও পরের চার বৎসরের গড় আমদানি যথাক্রমে ৬·২ কোটি এবং ৬ কোটি টাকা।

প্রকৃতপক্ষে শিল্পায়নের গতি একপেশে কোন তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। অধ্যাপক হাবার্ড দেখিয়েছেন যে পাশ্চাত্যের মহাযুদ্ধ পুরো এশিয়ায় নানা ধরণের পরিবর্তন আনে। হঠাৎ ইউরোপীয় শিল্পদ্রব্যের আমদানি যুদ্ধকালীন অবস্থায় বন্ধ হওয়ায় ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশে বাজারে যে ফাঁক সৃষ্টি হ'ল দিশি কারখানার পক্ষে সেটা সুবর্ণসুযোগ। তাছাড়া কিছু জিনিস সরকার কিনতে লাগল, যেমন টাটা কোম্পানির লোহা আর ইস্পাত যুদ্ধের প্রয়োজনে। সিমেন্ট এইসময় বিস্তার লাভ করে। ফলতঃ দেশের কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার শুরু হ'ল, দু-তিন পালা বা শিফ্‌ট্ কাজ শুরু হ'ল, ব্যবসার লভ্যাংশ বাড়ল, ডিভিডেণ্ড-এর আকর্ষণীয় বৃদ্ধি আরও পুঁজি কোম্পানিগুলির হাতে এনে দিল। মহাযুদ্ধের পরের কয়েক বৎসর, বিশেষ করে ১৯২১-২২ নাগাদ যুদ্ধকালীন লাভের ফলে শিল্পের পক্ষে যন্ত্র আমদানি ও কারখানার প্রসার সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন এটা অসম্ভব ছিল।

যুদ্ধোত্তর বৎসরগুলি ভারতীয় শিল্পের পক্ষে, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পের পক্ষে, অসহযোগ ও বিদেশী বয়কট আন্দোলনের দরুণ একটা সামাজিক সমর্থন সৃষ্টি করল। সম্ভবতঃ পাইকারি ও খুচরা বিক্রীর মধ্যবর্তী ব্যবসাদারেরা বিদেশী থেকে দিশি জিনিসের দিকে মন দিল ; তাছাড়া বাজারজাত করার পদ্ধতিতে আমেদাবাদ বিশেষভাবে এলেম দেখায়, যথা কোম্পানির নিজস্ব খুচরো দোকান। ১৯২৯-৩৩ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রথম ধাক্কাটার পর শিল্পায়নের গতি মন্দীভূত হয়নি মোটেও বরং চিনি ও রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি এই সময় নতুন চেহারা পায়। কেন ? (১) রপ্তানি বাণিজ্য পশ্চিমের দেশে মন্দার জন্য নিতান্ত কমে যায় (১৯২৯-৩০ সালে ৩১১ কোটি টাকা, ১৯৩২-৩৩ সালে ১৩২ কোটি)। কিন্তু এটার ফল মূলতঃ পড়ে পাট ও চা শিল্পের ওপর যে দুটোই বিদেশী পুঁজির হাতে ছিল ; দেশের বাজারের জন্য শিল্পগুলি, যথা চিনি, সিমেন্ট, দেশলাই, রাসায়নিক

দ্রব্য, ইস্পাত, সেগুলি কম মন্দায়িত হয় এবং এগুলিতে যথেষ্ট দিশি পুঁজি ছিল। (২) রপ্তানি কমে যাওয়ায় বোধহয় অনেক দিশি পুঁজি যা ঐ ব্যবসায়ে ছিল তা এখন অন্যত্র বিনিয়োগের সুযোগের খোঁজে শিল্পের পথে আসে। (৩) তিরিশের দশকে আবার আমদানি শুল্কনীতির পরিবর্তনের ফলে কিছুটা শিল্প সংরক্ষণ (protection) শুরু হয় (যথা, চিনি, কাপড়, ইস্পাত)। (৪) রপ্তানি কমায় কৃষিপণ্যের দর পড়ে যায় (সূচক ১৯২৯=১০০, ১৯৩৩=৬১·৭)। ফলতঃ চাষীদের ক্ষতি হয় এবং তার ফলে তাদের চাহিদা কমে ; বস্ত্রশিল্পের পক্ষে এটা বড় ব্যাপার ; কিন্তু অপরপক্ষে চাল-ডাল-তেলের দাম কমায় শহরের জনতার ব্যয় কমার ফলে তাদের চাহিদা কাপড় ইত্যাদি শিল্পদ্রব্যের জন্য বেড়ে থাকবে। তার ফলে মন্দা সত্ত্বেও শিল্পের চাহিদা মারাত্মক প্রভাবিত হয়নি। (৫) তাছাড়া কৃষিজপণ্যের দাম কমা মানে শিল্পের কাঁচামালের দাম কমা, অতএব শিল্পের পক্ষে সুবিধাজনক পরিস্থিতি। (৬) কোন কোন শিল্পের পক্ষে মনে হয় ১৯২৯-এর মন্দা আর একটা সুযোগ এনে দিল : পশ্চিমে মন্দার ফলে কারখানা যন্ত্রপাতি ইত্যাদির (Capital goods) দাম পড়ে যায়, যার ফলে বিশ্বের বাজারে কম দামে যন্ত্রপাতি খরিদ করে কারখানা বিস্তার করা সম্ভব হয়। মন্দার সময়ে যন্ত্রপাতির আমদানির গড় তার আগের ও পরের কয়েক বৎসরের গড় আমদানির সমান প্রায়।

১৯৩৩-৩৪ সাল থেকে মন্দার প্রভাব কমতে থাকে, এবং এরপর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবধি সতেজ শিল্পবৃদ্ধি দেখা যায়। আগেই সারণিতে আছে ১৯৩৫-৩৬-এর ১২৯ কোটি টাকার মোট উৎপাদন থেকে ১৯৪০-৪১ সালের উৎপাদন ১৭৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রায় ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব অনেকটা প্রথমটির মতই শিল্পের অনুকূলে, যদিও অনুরূপভাবে যুদ্ধকালীন সময়ে যন্ত্রপাতির আমদানি কঠিন ছিল। যুদ্ধের ঠিক পরেই যন্ত্রপাতির আমদানি বাড়ে এবং পুরানো শিল্পগুলি ছাড়াও বাইসিক্ল্, সেলাই কল, ডিজেল পাম্প ইত্যাদি তৈরির কারখানা বেড়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় মাল সরবরাহ কনট্রাক্ট, এবং সেই সময়ের অনটনজনিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারি ইত্যাদি বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যবসাদারদের হাতে এনে দেয়। শিল্পায়নের পথে না গিয়ে ফাটকা, কেনাবেচার কারবার, কোন বিশেষ চাহিদার জিনিস গুদোমবন্দী রেখে মুনাফা বাড়ানো (যথা ১৯৪৩-এর বাংলার মন্বন্তরের সময়ে), সরকারি কন্ট্রোল ও পারমিট ব্যবস্থা নিয়ে অপকৌশল ইত্যাদি কালো টাকার জগতের বর্তমান ঐতিহ্যের সূত্রপাত এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে।

এখন গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক ; শিল্পায়নের ইতিহাসে মনে রাখতে হয় কত সামান্য তার জায়গা, ১৯০০-০৪ সালে সমগ্র জাতীয় আয়ের ১৩ শতাংশের কম, আর ১৯৪০-৪৪ সালেও ১৭ শতাংশের নিচে। কেন শিল্পের এই মন্থর প্রগতি, তার উত্তর এই বইটার অনেক জায়গায় বার বার বলা হয়েছে। এই উত্তরের কতকগুলির ওপর জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা জোর দিয়েছিলেন : আমদানি শুল্ক নীতিতে অবাধ বাণিজ্যের (free trade) প্রভাবের ফলে

১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত শিল্প সংরক্ষণে সরকারের নিশ্চেষ্টতা, দেশীয় ধন বিদেশে পাচার (drain of wealth) হওয়ার ফলে দেশে বিনিয়োগের যোগ্য পুঁজির অভাব, এবং সাধারণভাবে কৃষিভিত্তিক ভারতীয় অর্থনীতিকে শিল্পপ্রধান ইংলণ্ডের পরিপূরক হিসেবে তৈরি করার ইংরেজ প্রবণতা। অপরদিকে ইংরেজদের মধ্যে একদল বলতে অভ্যস্ত ছিলেন যে অর্থনীতির অমোঘ নিয়মে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ (division of labour) দ্বারা কৃষিতে বিশেষীকরণ (specialisation) অবধারিত এবং কাম্য : যথা লর্ড জন মেনার্ড কেইন্‌স্‌-এর বাণী (১৯১১) :

> বিশ্বাস করা শক্ত যে ভারত অন্য পথে তার পুঁজি ও কৃষক শ্রেণীকে নিয়ে গিয়ে শিল্পদ্রব্য যা উৎপাদন করে যে সাচ্ছল্য অর্জন করবে, তার চেয়ে বেশী সাচ্ছল্য অর্জন করবে না তার কাঁচামাল পাশ্চাত্যের শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে বিনিময়ের দ্বারা।

এই চিন্তার ধাঁচ থেকেই উদ্ভূত তৃতীয় একটি মতধারা হ'ল শিল্পায়নের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপকরণের ফর্দ তৈরি করে দেখানো ভারতে সেগুলোর অভাব প্রমাণ করা। উপকরণ, অর্থাৎ পুঁজিপতিদের উদ্যমের (enterprise) এবং তার ফলে নবোদ্ভাবক উদ্যোগের (innovative entrepreneurship) অভাব, উপযুক্ত শিক্ষিত ও শিল্প-দক্ষ শ্রমিকের অভাব, সাধারণভাবে আধুনিকীকরণের উপযোগী মানসিকতার অভাব পুরাতনপন্থী মূল্যবোধের (value system) দরুণ, ইত্যাদি। এই ধরনটা ১৯৫০-এর দশক থেকে অর্থনৈতিক বিকাশের তত্ত্বে (Growth theory) নিহিত—তত্ত্ব হিসেবে যেটা খুবই ফাঁপা বলে বর্তমানে মনে হয়। বিশেষভাবে অধ্যাপক অমিয় বাগচী দেখিয়েছেন যে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় যোগানের দিকে এইসব অভাবের অভিযোগ প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ, আসল সমস্যা চাহিদার দিকে, অর্থাৎ গরিব দেশে জাতীয় আয়ের নিচু মানের ফলে শিল্পদ্রব্যের চাহিদা সীমিত হওয়ায় শিল্পায়ন সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। আমরা আগের পরিচ্ছেদগুলিতে গড় জতীয় আয় এবং চাষীদের হাল ও ক্রয়ক্ষমতা যা দেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পায়নের মন্থর গতি ও অসম্পূর্ণতার এই ব্যাখ্যার সমর্থনে যুক্তি প্রতীয়মান।

৪

শিল্পায়নের সঙ্গে নগরীকরণ, কারখানা গড়ার সঙ্গে শহরের বিস্তারের মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে। পশ্চিমের দেশগুলির দিকে তাকালেই এটা স্পষ্ট। ঔপনিবেশিক ভারতের নগরগুলি ঠিক শিল্পনগরী নয়। তবু শিল্প ও তথাকথিত আধুনিকতার কেন্দ্র হিসেবে শহরের কথা আসে। আমরা সবশেষে সামাজিক ইতিহাসের এই দিকটা দেখব।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা বড় ব্যাপার নগরীকরণ (urbanization)। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে শহর-টহর ইংরেজ আমলে না

জানি কি বাড়ল ! প্রকৃতপক্ষে জনগণনা দেখায় যে শহরবাসীদের অনুপাত মোট জনসংখ্যার তুলনায় ১৯২১ পর্যন্ত মোটেও বাড়েনি এবং তার পরেও বেড়েছে শম্বুকগতিতে। এই হিসেব ছাড়াও নগরীকরণ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ যে এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। প্রচুর গবেষক উনিশ ও বিশ শতকে ভারতীয় বিভিন্ন নগরের ইতিহাস লিখেছেন। অস্ট্রেলিয়াতে যারা কাজ করেছেন এ বিষয়ে বিশেষতঃ ক্যানবেরায় তাঁরা শহরের সমাজের স্বার্থগোষ্ঠী (interest group), সামাজিক গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেছেন (বোম্বাই সম্বন্ধে জিম ম্যাসেলস, গর্ডন, ও ক্রিস্টিন ডবিন, আমেদাবাদ সম্বন্ধে কেনেথ গিলিয়ন) এবং এই জাতীয় কাজ আমাদের দেশেও যথেষ্ট হয়েছে (প্রদীপ সিংহ, সৌমেন মুখার্জি)। বিশ শতকের শহরের অঙ্গসংস্থান (morphology) এবং নগরপত্তন ও শাসন নিয়ে কিছু গবেষণা পাওয়া গেছে (দিল্লী সম্বন্ধে নারায়ণী গুপ্ত এবং লক্ষ্ণৌ সম্বন্ধে বীণা ওল্ডেনবর্গ)। কিন্তু এই সব গবেষণা তথ্যবৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, কিন্তু শহরগুলির আপাতদৃষ্ট বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতা ছাড়িয়ে, আধুনিক নগরপ্রসারণ প্রক্রিয়ার সর্বভারতীয় একটা ছবি আঁকা যেতে পারে এমন কোন তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করেনি। ঔপনিবেশিক আমলের শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাক্-ঔপনিবেশিক শহরের সংস্কৃতির পার্থক্যের তুলনামূলক ভিত্তিতে মিলটন সিংগার ও তাঁর শিকাগোর ছাত্রেরা মাদ্রাজ সম্বন্ধে একমাত্র এমন চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ওটা শহরের সাংস্কৃতিক অবয়বে সীমাবদ্ধ।

তবুও হয়ত ঔপনিবেশিক নগরীকরণের কয়েকটা সামান্যলক্ষণ নির্দেশ করা যায়।

প্রথমতঃ জনগণনা প্রমাণ করে যে ১৮৮১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে ঔপনিবেশিক মহানগর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছোট শহরের প্রসার তেমন হয়নি এবং মোট জনসংখ্যার অনুপাতের হিসেবে শহুরে বাসিন্দার সংখ্যা তেমন বাড়েনি। যদিও সাধারণ ভাবে আমরা বড় বড় শহর ইংরেজ আমলে গড়ে উঠল দেখে একেই নগরীকরণ বলে থাকি, জনগণনাবিদ্ যারা তাদের কাছে নগরীকরণের সংজ্ঞা হ'ল গ্রামীণ জনসংখ্যার তুলনায় শহর বাসিন্দাদের আনুপাতিক বৃদ্ধি। সেই হিসেবে দেখা যায় যে নগরের প্রসার তেমন হয়নি।

জনগণনা শুরু হওয়ার আগে প্রবণতা কোন্ দিকে ছিল বলা শক্ত। আঠেরো শতকের শেষ থেকে পুরানো নগরগুলি বাড়েনি, অনেক শহরে জনসংখ্যা মারাত্মক রকমের কমেছে তার প্রমাণ আছে : যথা, ঢাকা, লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ, আমেদাবাদ, ইত্যাদি। ইরফান হবিবের মতে এটা বিনগরীকরণ (deurbanization)। কিন্তু এমন প্রমাণ নেই যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসেবে বিনগরীকরণ ঘটেছিল। বরঞ্চ দেখা যায় যে পুরানো শাসনতান্ত্রিক বা বাণিজ্যকেন্দ্রের জায়গায় নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠছে অন্য সব শহরে যেখানে জনসংখ্যা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাড়ছে। অর্থাৎ কেবল ঢাকা কিংবা আমেদাবাদ কিংবা লক্ষ্ণৌয়ের অবনতি থেকে বিনগরীকরণ প্রমাণ হয় না।

সারণি ৯·৪
ভারতে নগরীকরণ, ১৮৯১-১৯৪১

বৎসর	নগরবাসীর সংখ্যা (কোটি)	মোট জনসংখ্যার শতাংশের হিসেবে নগরবাসী
১৮৯১	২·৬৭	৯·৪
১৯০১	২·৮২	১০·০
১৯১১	২·৮৬	৯·৪
১৯২১	৩·১১	১০·২
১৯৩১	৩·৭৫	১১·১
১৯৪১	৪·৯৭	১২·৮

(আকর : কিংস্‌লি ডেভিস, 'পপুলেশন অফ্ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান' ; ভারতের হিসেবে এখানে বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)

তাছাড়া এমন মনে করার কারণ আছে যে প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলের শহরবাসী জনসংখ্যা এ পর্যন্ত একটু বাড়িয়ে ধরা হয়েছে (হবিবের হিসেবে অন্ততঃ ১৫ শতাংশ) যার ফলে উনিশ শতকের হিসেব দেখলে মনে হয় বিনগরীকরণ ঘটেছে। তাছাড়া এর পেছনে আর একটা প্রবণতা কার্যকর—নগরীকরণ এবং শিল্পায়নের সমীকরণ করে ধরে নেওয়া যে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যেহেতু ঘটেছে অবশিল্পায়ন (de-industrialization), নিশ্চয় বিনগরীকরণ ঘটছে। যেহেতু সেই সময়কার শিল্পে নিয়োজিত কারিগরদের বেশিরভাগ গ্রামীণ, অবশিল্পায়ন ও বিনগরীকরণের সমীকরণ অগ্রাহ্য। যাই হোক, মোটামুটি মনে হয় যে ১৮৮০ সাল অবধি একদিকে পুরানো শহরের অবনতি ও অপরদিকে ইংরেজদের ব্যবসা ও প্রশাসনের নতুন সব কেন্দ্রে নগরীকরণের ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, পরের ৭০ বৎসরে তার থেকে খুব একটা প্রগতি দেখা যায় না নগর/গ্রাম জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসেবে (যদিও ঐ সময়ে বোম্বাই মাদ্রাজ কলকাতার মহানগরগুলির প্রগতি আমাদের বিভ্রান্ত করে)। মোটের ওপর ছবিটা নগরীকরণের প্রগতির নয়, প্রায় একই জায়গায় থেমে থাকার।

দ্বিতীয়তঃ, ঔপনিবেশিক ধারার নগরীকরণের আরেকটা চিহ্ন হ'ল শিল্পায়ন বিনা নগরীকরণ, যেটা পাশ্চাত্যের ধারার ঠিক বিপরীত। নতুন মহানগরগুলি গড়ে উঠল বাণিজ্য ও প্রশাসন কেন্দ্র হিসেবে, কলকারখানা কোথাও কখনো কতকগুলি মহানগরের মধ্যে বা আশেপাশে গড়ে উঠল। ১৮৫৪ থেকে রেলপথ প্রসারের একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল কতকগুলি উপকূলস্থ পোতাশ্রয় (যথা কলকাতা মাদ্রাজ বোম্বাই করাচি) এবং অভ্যন্তরীণ কৃষি-উৎপাদন ক্রয় ও বিলিতি শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করা। এই বহির্বাণিজ্যের জন্য রেলপথ ছাড়াও প্রয়োজন এই মহানগরগুলিতে বিলিতি সওদাগরি

কোম্পানি, ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, জাহাজ কোম্পানির দপ্তর ইত্যাদি। তাছাড়া এইসব কোন কোন নগরে মোগল আমল থেকে ইংরেজরা আত্মরক্ষার্থে কেল্লা বানিয়েছিল, যথা কলকাতা বা মাদ্রাজ এবং উনিশ শতকে বণিকের মানদণ্ড থেকে রাজদণ্ডের রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় প্রশাসন কেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল। কলকারখানা আনুষঙ্গিক ভাবে তৈরি হয়ে ওঠে কলকাতা ও বোম্বাইতে: আনুষঙ্গিক এই অর্থে যে বিদেশে চালান করার পরিবহন ব্যবস্থা এবং সওদাগরি বন্দোবস্ত থাকার ফলে এই সব নগরে পাট, তুলো ইত্যাদি চালান যখন হচ্ছে, তবে সেখানেই কারখানা বসালে ঐসব কাঁচামাল সস্তায় সহজে পাওয়া যায় ও অন্যান্য স্থানীয় সুবিধা পাওয়া যায়। অর্থাৎ শিল্পনগরী হিসেবে এই সব মহানগর গড়া হয়নি, কিছুটা শিল্পায়িত হয়ে পড়েছে নানা স্থানীয় কারণে যেগুলি আমরা দেখেছি বোম্বাইয়ের প্রসঙ্গে এই পরিচ্ছেদে। কলকাতা মাদ্রাজ বোম্বাই—তিনটি প্রেসিডেন্সীর কেন্দ্রস্থল—বাদ দিলে অপেক্ষাকৃত ছোট জাতীয় নগর, যথা কানপুর বা আমেদাবাদ, অবশ্য মূলতঃ শিল্পনগর হিসেবে গড়ে ওঠে, সেটা উনিশ শতকের অন্তে।

অর্থনীতিবিদেরা কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, বন-উপজ জীবী গোষ্ঠীদের প্রথম প্রকরণ (primary sector), শিল্পোৎপাদন, খনিজ দ্রব্য নিষ্কাশন, বাস্তুনির্মাণ ইত্যাদি কর্মকে দ্বিতীয় প্রকরণ (secondary sector) নাম দেন এবং বাকি সবগুলি—যথা পরিবহন, সওদাগরি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্ম যেগুলি কোন জিনিস তৈরি করে না—সেগুলিকে তৃতীয় প্রকরণের (tertiary sector) কর্ম ধরেন। সেই হিসেবে ঔপনিবেশিক মহানগর মূলতঃ তৃতীয় প্রকরণের কর্মের কেন্দ্র।

তৃতীয়তঃ ঔপনিবেশিক আমলের বড় ছোট প্রায় সব শহরের অবয়ব সংস্থানে (morphology) কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। কলকাতায় গোড়া থেকেই যেটা স্পষ্ট ছিল কালা আদমিদের অংশ (black town) আর শ্বেতাঙ্গদের অংশের মধ্যে ভেদ, সেই জাতিভেদ অন্যান্য সংস্কৃত রূপে ইংরেজ আমলে তৈরি শহরগুলিতে চোখে পড়ে। ধনকৌলীন্যে অবশ্য কিছু ভারতীয়, যেমন বাংলার জমিদার বা বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী, শ্বেতাঙ্গ মহল্লার কাছাকাছি স্থান পেতে পারত। কিন্তু নেটিভ ও সাহেবদের সামাজিক দূরত্ব নিতান্ত প্রকট ছিল। আমরা এখন ভুলে গেছি মাত্র পাঁচ-ছয় দশক আগেও সামাজিক দূরত্বের সঙ্গে স্থানিক (spatial) পৃথক্করণ কতটা স্পষ্টভাবে বিভেদ প্রজার জাতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হত। এর পেছনে ছিল ইংরেজদের ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহজনিত ত্রাস এবং অবশ্যই বিদেশী শাসকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতার একটা সহজবোধ্য অনুবাদ নগরপরিকল্পনায়। নতুন দিল্লীর পরিকল্পনায় লুটিয়েন্স এই উদ্দেশ্যটাকে খুব জোর দিয়েছিলেন—যেন বড়লাটের বাড়ী, কিংস্‌ওয়ে, কুইন্‌স্‌ওয়ে (আজকের রাজপথ, জনপথ), রাইসিনা পাহাড়ে আমলাদের বাড়ী, এবং পুরো পরিকল্পনায় কেবল মোগলদের উত্তরাধিকার কাদের ওপর বর্তালো এই ঘোষণা নয়, সাম্রাজ্যবাদকে স্থাপত্য যেন মূর্ত করে তোলে। প্যাট্রিক রশ্‌ হালে দেখিয়েছেন

যে স্থানিক পরিকল্পনায় ইংরেজ আমলে দিশি মানুষদের মধ্যেও বিভেদ স্পষ্টীকৃত হয়েছিল—যথা মাদ্রাজ শহরে তথাকথিত উঁচু আর নিচু হিন্দু জাতের নাগরিকদের আলাদা করার ব্যবস্থা ; অর্থাৎ মাদ্রাজে ইংরেজ নগর শাসনের মধ্যে সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আধুনিকীকরণের দিকে যায়নি। একই ব্যাপার গরিব-বড়লোক, মজুর-মালিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাকে ঔপনিবেশিক বিশেষত্ব ভাবা চলে না কেননা তা সব অসম সমাজেই দেখা যায়।

শেষতঃ, মনে হয় নগরীকরণ ঔপনিবেশিক আমলে অন্ততঃ খুব সীমাবদ্ধ একটা প্রক্রিয়া। এক তো, বিরাট সংখ্যায় গরিব মানুষেরা নগরের প্রত্যন্তে সাময়িক অধিবাসী। মরিস্ ডেভিড্ মরিস্ দেখিয়েছেন যে বোম্বাইতে সুতাকলে ১৮৯০ সালে ১০ বৎসরের বেশি কাজ করেছে এমন শ্রমিকের সংখ্যা মোটের মাত্র ২৬·৭ শতাংশ, এবং ১৯২৭-২৮ সালে ৩৯·১ শতাংশ। এমনকি ১৯৫৫ সালেও ১৫ বৎসরের বেশি কারখানা মজুরি করা লোকের সংখ্যা মাত্র ৩০·৭ শতাংশ। দশ-পনের বৎসর কাজ করে গ্রামে ফিরে যাওয়াটাই কারখানা মজুরের রেওয়াজ ছিল। তাছাড়া তারা প্রায় প্রতি বৎসর গ্রামের বাড়ীতে ফিরে যেত। কলকাতার পাটকলের শ্রমিকদের এরকম হিসেব ঐতিহাসিকেরা এ পর্যন্ত করেননি, কিন্তু একই ধারা থাকার সম্ভাবনা প্রবল, বিশেষতঃ 'পশ্চিমা' শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। ধীরে ধীরে শ্রমিকদের শহরে পাকাপাকি রকম বসতি করা এবং পরের প্রজন্মটিকে শহরে মানুষ করে মজুরিতে ঢোকানোর প্রবণতা গত পাঁচ-সাত দশকে বেড়েছে সব শহরে। অর্থাৎ নাগরিকত্ব অনেক গরিব মজুরদের ক্ষেত্রেই ছিল সাময়িক, যেটা তুলনীয় সময়ে ইংলণ্ডের নগরীকরণের ধারার বিপরীত। ঔপনিবেশিক মহানগরগুলিতে যারা স্থায়ী বাসিন্দা হচ্ছিল তারা মূলতঃ শিক্ষক বিদ্যাজীবী পেশায় প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত, অথবা ব্যবসার জগতের লোক, অথবা ইংরেজদের প্রশাসনিক যন্ত্রের বিভিন্ন স্তরের চাকুরে। ক্রিস্টিন ডবিন দেখিয়েছেন যে বোম্বাই নগরে আগন্তুক ও স্থায়ী বাসিন্দাদের জাতিবিচার করলে দেখা যায় যে কলমপেষা পেশাদার যারা তারা সেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সাবেকি ব্যবসাদার জাতগুলি নতুন ব্যবসায় প্রাধান্য পাচ্ছে। মিল্টন সিংগর মাদ্রাজের বণিকসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার দেখেছেন, জাতব্যবসা বজায় আছে যদিও পরিবেশ নতুন। কলকাতাতেও এক ধরণের ধারাবাহিকতা দেখা যায়। তবে অবশ্য এর ব্যতিক্রম বোম্বাইতে পারসি সম্প্রদায় এবং কলকাতায় নরেন্দ্র সিংহ দেখেছেন উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে গন্ধবণিক-সুবর্ণবণিক ইত্যাদি ছাড়াও অনেক বামুন-কায়েতের প্রবেশ। তবু মোটামুটি নাগরিকত্ব মানে জাতব্যবসায়ের পুরানো কাঠামোর ওলটপালট যে নয় এটা বোধহয় সত্য। একজন সমাজতাত্ত্বিক, সতীশ সাবেরওয়াল বলেছেন যে উনিশ শতকের আগেকার জাতের শক্ত বাঁধন শহরে আলগা হয়ে একটু হাওয়া খেলেছে মাত্র, নগরীকরণ পুরো জাতি ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনেনি। এককথায় এই নগরীকরণ খুব সীমাবদ্ধ একটা প্রক্রিয়া, সমাজের আধুনিকীকরণের সঙ্গে সমীকরণ করা চলে না। এখানে মনে রাখা দরকার যে আধুনিকীকরণের (modernization) যন্ত্র

বলে ধরা হয় যে রেলপথ, মুদ্রণযন্ত্র আর ডাকব্যবস্থা, সেগুলি আধুনিকীকরণের বিপরীত কাজেও অনেক সময় লাগে। মৈশুর নরসিংহাচার শ্রীনিবাস খুব খাঁটি কথা ধরেছেন যে রেল-ডাক-ছাপাখানা এসব সাম্প্রদায়িক সমিতি ও রাজনীতিকে মদৎ দেয়। এই সব যন্ত্র, পরিবহণ, সঞ্চার ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যের ধারণা বহু লোকের নিকট পৌঁছে দিতে পারে, আবার সাম্প্রদায়িক বা জাতপাতের বা ধর্মীয় মনোবৃত্তিকেও লোকের মনে ঢোকাতে পারে, তাকে রাজনৈতিক চেহারা দিতে পারে। ম্যাক কর্‌ম্যাক দেখিয়েছেন কিভাবে বৈষ্ণবদের সামাজিক সংঘবদ্ধতা সাবেকি তীর্থযাত্রা, কথা পাঠ, মেলা ইত্যাদি ছাড়াও, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা ত্বরান্বিত হয়েছে। শহরের ছাপাখানা, সাম্প্রদায়িক সংস্থা, রেল যোগাযোগ প্রাক্-আধুনিক মানসিকতাকে আরও জোরদার করতে পারে।

অবশ্য আধুনিককালের শহর কোনই সামাজিক পরিবর্তন আনেনি এমন বলাটা সুস্থমস্তিষ্কে সম্ভব নয়। যেটা মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে এটা কতটা সীমাবদ্ধ। প্রাচীন নগরসমাজ ও সংস্কৃতি ও ঔপনিবেশিক নগরীকরণের একটা তুলনামূলক আলোচনা মিল্‌টন সিংগর করেছেন। সাধারণ মানুষের স্থানীয় ঐতিহ্যকে (little tradition) সংস্কৃত করে উচ্চকোটির ধ্রুপদী ঐতিহ্যের (great tradition) সৃষ্টি, তাঁর মতে, প্রাচীন নগরগুলির অবদান। এই জাতীয় নগর, যথা মাদুরা কিংবা কাঞ্চী, সিংগর নাম দিয়েছেন মূলসম্ভূত (orthogenetic) ; তার বিপরীত ঔপনিবেশিক মহানগর যথা মাদ্রাজ কিংবা কলকাতা, যাকে বলা হয়েছে অপরসম্ভূত (heterogenetic)। ঔপনিবেশিক মহানগরে প্রাচীন ঐতিহ্য ও নতুন ও অপর একটি সংস্কৃতির মধ্যে টানাপোড়েন চলছে, যার ফলে প্রাচীনতার ধারাবাহিকতা যেমন অনেক জায়গায় দেখাযায়, তেমন আবার নতুনত্ব। হয়ত এই বক্তব্যটা খুব নতুন শোনায় না ভারতীয় কানে। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমী পণ্ডিতদের অভ্যাস ছিল পাশ্চাত্যের প্রভাবে নগরীকরণ আধুনিকীকরণের সমার্থক মনে করা, তাই সিংগরের তত্ত্ব সেই পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবান।

এসব ব্যাপার যে অর্থনীতির জগৎ থেকে খুব দূরে নয় তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বোম্বাই এবং আমেদাবাদ দুজায়গাতেই সূতি কাপড়ের কারখানা অনেক গড়ে উঠল, কিন্তু কিছু প্রভেদ চোখে পড়ে। আমেদাবাদে শিল্পায়নের পুঁজির একটা বড় অংশ, ৬২ শতাংশ, মালিক শেঠদের বা ম্যানেজিং এজেন্টের কাছে জমা দেওয়া টাকা (deposit),—শেয়ার বাজারের ভূমিকা ছোট ; বোম্বাইতে মাত্র ৪ শতাংশ জমা দেওয়া টাকা, বেশিরভাগ পুঁজি শেয়ার বাজারে তোলা টাকা। কেন এই পার্থক্য ? আমেদাবাদে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্বার্থদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও খুব কমই ধর্মঘট ও প্রকাশ্য শ্রেণীদ্বন্দ্বের রাস্তায় গেছে ; মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব হয়ত কিছুটা দায়ী এজন্য, কিন্তু সেই প্রভাব বোম্বাইতে কার্যকর হল না কেন, বোম্বাইতে ধর্মঘট ও শ্রেণীসংঘাত বহুগুণে বেশি প্রকট কেন ? আমেদাবাদের কারখানাগুলিতে শ্রমিক ইউনিয়ন স্থাপিত হয় কারিগর পঞ্চায়েতের (Craft guild) মতন, কাজ অনুসারে আলাদা কার্পাস পরিষ্কারক,

তাঁতকলের মজুর, সুতাকলের তদারককারী, ইত্যাদিদের সমিতি ; বোম্বাইতে ইউনিয়ন গোড়া থেকেই পুরো একটা কারখানার শ্রমিক এবং পরে বস্ত্রশিল্পের সব শ্রমিকদের নিয়ে, কারিগরির বিশেষীকরণ নির্বিশেষে। কেন এই পার্থক্য ? হয়ত এই সব প্রশ্নের উত্তর প্রাক্-শিল্পায়ন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় পাওয়া যায়। হাওয়ার্ড স্পডেক-এর গবেষণায় দেখা যায় যে আমেদাবাদে কারখানা তৈরির বহু আগে টাকা খাটানোর জন্য শেঠদের কাছে টাকা জমা দিয়ে সুদ সংগ্রহ করা চালু ছিল, কারখানা বসবার পর একই প্রথা চলল, কেবল কুসীদজীবী বা সওদাগর শেঠ এখন কারখানা-মালিক হয়ে দাঁড়াল। 'মহাজন' (guild) অথবা বণিক সমিতি, কারিগর সমিতি ইত্যাদি গুজরাটের পুরনো শহরে কেমন শক্তিশালী ছিল তার অনেক প্রমাণ মধ্যযুগ থেকে পাওয়া যায়, সুতরাং কারিগরিভিত্তিক শ্রমিক সংগঠন স্বাভাবিক। এবং এটাই হয়ত আমেদাবাদে মজুর মহাজন এবং মিলমালিক সংগঠনের মধ্যে বিশেষ এক ধরণের সম্পর্কের মূলে। বোম্বাই নতুন শহর। এই সব ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠান বিনা শিল্পায়ন ও সংগঠন অন্য ধারায় গড়ে উঠেছিল। আর একটা উদাহরণ : যদি আমরা দীপেশ চক্রবর্তীর নির্দেশে কলকাতার দিকে তাকাই, সেখানেও যে শ্রমিক সংগঠন ও শ্রেণীসম্পর্ক চোখে পড়ে সেটাও দেখি শিল্পায়নের পূর্বের "ভদ্রলোক-ছোটলোক" বিভেদের ঐতিহ্যের ছায়ায় গজিয়ে বিশেষ একটা চেহারা পেয়েছিল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থেকে নিস্তার সহজে পাওয়া যায় না।

৫

ঔপনিবেশিক শহরের বাবুদের হালচাল এই বইটার পাঠকের কাছে বলার দরকার নেই। এখানে বাবু বলতে প্রাক্-সিপাহী যুদ্ধের জমিদারি আর বেনিয়ানগিরি করা বনেদি বাবু নয়, সাহেবদের ভাষায় বাবু, অর্থাৎ মূলতঃ করণিকবৃন্দ, যার সঙ্গে আবার নানান অবস্থার বিদ্যোপজীবী রয়েছে, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সরকারি ও সওদাগরি অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' প্রবন্ধে বাবুদের লক্ষণ-নির্দেশ মনে রাখার মতন :

> কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। ...যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করিবেন, উপার্জনের জন্য বিদ্যাধ্যায়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যায়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু। ...বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার—যথা, কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহারা সকল অবতারেই অমিতবলপরাক্রমে অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরানী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী ; মাষ্টার অবতারে বধ্য ছাত্র ; ষ্টেশন মাষ্টার অবতারে বধ্য

> টিকেটহীন পথিক ; ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চালকলাপ্রত্যাশী পুরোহিত ; মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক ইংরাজ ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী ; উকিল অবতারে বধ্য মোয়াক্কেল ; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী ; জমিদার অবতারে বধ্য প্রজা ; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক ; এবং নিষ্কর্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।...বাবুদিগের জয় হউক...।

ঔপনিবেশিক আমলে এই বাবুরা অধিষ্ঠিত হল মূলতঃ ছোট বড় শহরে।

এই বর্গ—আমরা এখানে 'শ্রেণী' শব্দটি ব্যবহার করছিনা যেহেতু সেটা সুপ্রযুক্ত হয় উৎপাদন ব্যবস্থা উদ্ভূত সম্পর্কের ভিত্তিতে, বিত্তের পরিমাণের ভিত্তিতে নয়—এই তথাকথিত 'মধ্যবিত্ত' বর্গ, নিতান্ত পাঁচমিশেলী। এর মধ্যে বিত্তের সাম্যও নেই, চাকুরিজীবীদের মধ্যেও অসাম্য বিরাট, এবং বিভিন্ন পেশার লোকেদের মধ্যেও। বঙ্গদেশে ভদ্রলোক নামে অধুনা পরিচিত এই বর্গের সামান্যলক্ষণ হ'ল, বঙ্কিমের ভাষায়, 'উপার্জনের জন্য বিদ্যাধ্যায়ন'। এদের সংখ্যা একটা গরিব দেশের পক্ষে নিতান্ত অদ্ভুত রকম বড়। জোসেফ বেন-ডেভিড-এর বহুপরিচিত একটা প্রবন্ধে এই বর্গের আন্তর্জাতিক কতকগুলি তুলনা পাওয়া যায়। ১৯২৫-২৭ সালে যখন ভারতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রের সংখ্যা ৯৪ হাজার তখন ফ্রান্সে সংখ্যা ৫৮ হাজার, জার্মানিতে ৮৯ হাজার, ইংলণ্ডে ৪২ হাজার। অবশ্যই এখানে মোট জনসংখ্যার তারতম্যের দরুণ তুলনা শক্ত ; তবে ১৯৫৫-৫৮ সালে তুলনাযোগ্য সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় : বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের সংখ্যা প্রতি দশ হাজারে ভারতে ৬·৮২ জন, যেখানে ফ্রান্সে ৪·৩৭, পশ্চিম জার্মানিতে ৬·২১, ইংলণ্ডে ৫·৬৮। উনিশ শতক থেকেই অর্থনৈতিক প্রগতি যেসব দেশে হয়েছে তার অনেকগুলিতেই, এবং বিশেষ করে ইংলণ্ডে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা না নিয়ে বিশেষ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা শিল্পক্ষেত্রে কাজ পায়। অপর পক্ষে উপার্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ দরকার তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে যেখানে শিল্পক্ষেত্র ততটা বিকাশ পায়নি, তৃতীয় প্রাকরণিক ক্ষেত্র (tertiary sector) স্ফীত হয়ে উঠেছে। 'উপার্জনের জন্য বিদ্যাধ্যায়নের' একটা সীমা অর্থনৈতিক বিকাশের অভাব দ্বারা নির্দিষ্ট বটে, কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ঔপনিবেশিক আমল থেকেই জাতীয় বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কহীন, উপার্জন ও সামাজিক উন্নতির সিঁড়ি।

এই সিঁড়ি আয়তনে বাড়ে মূলতঃ বিংশ শতাব্দীতে। এবিষয়ে ভাল হিসেব পাওয়া যায় না। তবে কিছু মোটামুটি হিসেব পাওয়া যায়। ১৮৬৪-১৮৭৩ সালে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন (অর্থাৎ শেষ মাধ্যমিক পরীক্ষা) পাশের সংখ্যা মোট যথাক্রমে আট হাজার, চার হাজার ও দুই হাজারের মত এবং স্নাতকের সংখ্যা ৮৬০, ২৯৬ এবং ১৬৮ ; তাছাড়া আইন, চিকিৎসা আর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ যথাক্রমে বারশ, একশ এবং দুইশ মতন। তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাপ্রাপ্তদের মোট সংখ্যা কুড়ি হাজার। এর পর থেকে প্রতি বৎসরে পাশের সংখ্যা পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষ দশকে

প্রতি বৎসর মোট ম্যাট্রিকুলেশন পাশের সংখ্যা গড়ে ৭৬৭০, এবং স্নাতকের সংখ্যা গড়ে ৯৪৩ বৃটিশ ভারতে (পাঁচসালা গড় ১৮৮৯/৯০ থেকে ১৮৯৩/৯৪ সালের)। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে এই সংখ্যাগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পায়: ১৯৩১ সালে যারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তাদের সংখ্যা এক লক্ষের মতন এবং স্নাতকের সংখ্যা পনের হাজার। সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা যায় যে কলেজের সংখ্যা বাড়তে থাকে কিন্তু স্কুলের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়ে না, অর্থাৎ একটা মাথাভারি কাঠামো তৈরি হয় যার ভিত্তিটাই খুব সংকীর্ণ।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে শিক্ষিত মধ্যবর্গের মানুষদের কর্মসংস্থান, আয় ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রায় কোন গবেষণা হয়নি প্রাক্-স্বাধীনতা কালে। বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু তথ্য জানা যায়। যেমন লর্ড কার্জন দ্বারা ১৯০৩ সালে একটা অনুসন্ধানে জানা যায় যে ঐ সময়ে মাসিক ৭৫ টাকা বা ততোধিক বেতনের ভারতীয় কর্মচারীর সংখ্যা সরকারি বিভিন্ন বিভাগে মোট ষোল হাজার। বেসরকারি চাকরিতে যারা নিয়োজিত তাদের একটা অংশ সম্বন্ধে ১৯১১ সালে শিল্প সেনসাস থেকে জানা যায়: কেরাণি, সুপারভাইজার ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত ভারতীয়ের সংখ্যা ৬১ হাজার (এই সরকারি হিসেবে ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদেরও বাদ দেওয়া হয়েছিল)। ১৯২১ সালের জনগণনায় ৭৫ টাকার বেশি বেতনের ভারতীয়ের সংখ্যা রেল কোম্পানিতে প্রায় কুড়ি হাজার, সেচ বিভাগে বার হাজার, পুলিশ বিভাগে তের হাজার ইত্যাদি; এছাড়া বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষ নয় হাজার সুপারভাইজার বা কেরাণি পদে, বেতন অজানা। ১৯২১ সালের জনগণনা অধিকর্তার হিসেব অনুসারে সরকারি প্রশাসন সংক্রান্ত কাজ এবং চিকিৎসা, আইন, শিক্ষা, সাংবাদিকতা ইত্যাদি বিদ্যোপজীবীর পেশায় মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১·৪ শতাংশ। এই সব হিসেবগুলি এতই মোটা দাগের এবং যথেষ্ট সময় ব্যাপী তুলনাযোগ্য হিসেব নেই বলে, খুব একটা কাজের নয়। ফলতঃ আমরা এখনও গবেষকদের জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্য।

আপাততঃ, ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারের সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনার পুনরুক্তি না করে, কেবল একটা বিষয়ের তলায় দাগ দেব। আমরা আগেই জাতীয় আয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে ঔপনিবেশিক আমলে অর্থনৈতিক ধারা হল এই যে গ্রামের মানুষের ট্যাঁক খালি করে শহুরে লোকেদের পকেট ভারি হচ্ছে। এই অনুমানের একটা ভিত্তি হ'ল তৃতীয় প্রাকরণিক ক্ষেত্রের আয় সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে (১৯০০-১৯০৪ সালে মোট জাতীয় আয়ের ২৩·৭ শতাংশ থেকে ১৯৪০-৪৪ সালে ৩৫·৭ শতাংশ), যেখানে প্রথম ক্ষেত্রজ আয় কমছে (একই সময়ের ব্যবধানে ৬৩·৬ থেকে ৪৭·৬ শতাংশ) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সামান্য বাড়ছে (১২·৭ থেকে ১৬·৭ শতাংশ)। অপর একটা হিসেবে ওঙ্কার গোস্বামী দেখিয়েছেন যে জনপ্রতি বাস্তবিক আয় (অর্থাৎ টাকার হিসেবে নয়, ক্রেতব্য ভোগ্যদ্রব্যের হিসেবে) ১৯০০-০১ সালে শহুরে মানুষের যা ছিল সেটা গ্রামের মানুষের তুলনায় সাড়ে-তিনগুণ, ১৯৪৬-৪৭ সালে শহুরে আয় বেড়ে

দাঁড়াল গ্রামীণ আয়ের প্রায় ছয়গুণ। কোনও ক্ষেত্রের আয়ের বাস্তবিক মূল্য অপর ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যে যাচাই করে এরকম হিসেব করা চলে। এই হিসেবটাকে আরও সূক্ষ্ম করা বোধহয় সম্ভব কিন্তু গ্রাম-শহরের অসমতা যে বাড়ছে এতে সন্দেহ নেই এবং কৃষিপণ্যের মূল্যে মন্দা বিশের দশকের শেষ থেকে শহরের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াচ্ছে, অর্থাৎ গ্রামীণ ক্ষেত্রের উৎপন্ন সস্তায় বিকোচ্ছে। এক কথায় জাতীয় আয়ের এমন একটা পুনর্বন্টন ঘটে যাচ্ছে অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে যাতে শহুরে মানুষদের লাভ। এই ব্যাপারটা কোনও কোনও শিল্পের বিবর্দ্ধন (সাধারণভাবে জাতীয় আয়ের নিচু মান এবং চাষীদের নিরন্তর অনটন সত্ত্বেও) বুঝতে সাহায্য করে। শহুরে মানুষদের চাহিদা মেটাতে মিহি কাপড়, চা, চিনি, সিগারেট, বিস্কুট, কেরোসিন তেল, কাগজ, সাবান, তাদের বাড়ি তৈরির সিমেন্ট আর লোহা, যানবাহনের জন্য বাইসিক্ল্, মোটর বাস, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই যে গ্রামীণ আয়ের আপেক্ষিক অবনতি, এটা জাতীয়তাবাদীদের চোখেও পড়েছিল, দাদাভাই নওরোজী থেকে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত অনেকেই এ বিষয়ে বলেছেন। এমনকি নওরোজী এটাকে দেশের বাইরে ধন নির্গম (drain of wealth)-এর সঙ্গে তুলনা করে এটাকে আভ্যন্তরীণ ধন নির্গম (internal drain) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই ধারাটাই শহরের শ্রীবৃদ্ধির ভিত্তি। এই শ্রীবৃদ্ধির বড় অংশীদার স্বভাবতঃ শিল্পপতি, ব্যবসায়ী শ্রেণী, শেয়ারে কোম্পানির মালিক, সওদাগর ইত্যাদি। কিন্তু এদের ছোটখাট অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে শহুরে মধ্যবিত্ত। শহরের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় এই বোধটা হয়ত ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে। "আর কত লাল শাড়ি…আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ…/কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত/ বন্যা আর দুর্ভিক্ষ" "কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও/ হে শহর হে ধূসর শহর।" (সমর সেন)

অধ্যায় ১০

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও অর্থনীতি

আমরা এ পর্যন্ত নানাদিক থেকে দেখেছি ভারতের অর্থনৈতিক উপনিবেশীকরণ কিভাবে হ'ল, আর প্রসঙ্গত বহুবার বৃটিশ সরকারের নানা নীতির ফলাফল তুলে ধরেছি। এখন সামগ্রিকভাবে নীতিগুলি এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের চরিত্রটিকে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের অমিল আছে। উপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়াতে রাষ্ট্রের ভূমিকাটিকে অনেকে গুরুত্ব দেন না, যথা ভেরা এন্স্‌টি, স্যার পর্সিভল্ গ্রিফিথ্‌স্‌, স্যার থিওডর মরিসন, ইত্যাদি। এরা মনে করেন যে সরকারি করনীতি ইত্যাদি যেমনই হোক না ভারতে কুটিরশিল্প বিনাশ ছিল অবশ্যম্ভাবী, কারণ আধুনিক কলকব্জা আর কারিগরি আর অধিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃটেনের হাতে ; যে, কৃষিপ্রধান দেশ হওয়াটা ভারতের পক্ষে ছিল অবধারিত কেননা উৎপাদন ক্ষমতার হিসেবে তাতেই ভারতে সুবিধা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতে অর্থাগম ; যে, রেলপথ ও আধুনিক রাস্তা ও পোতাশ্রয় ও কলাকৌশল যা বৃটেনের বদান্যতায় এসেছে তাছাড়া ভারতের আধুনিকীকরণ যেটুকু হয়েছে, তাও হত না ; এবং তাঁরা বলেন যে উনিশ শতকে ভারতীয়দের বাণিজ্যকুশলতা এমন ছিল না যে আধুনিক যুগে ভারত প্রবেশ করতে পারে যদি না থাকত ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়, পুঁজি এবং ব্যবস্থাপনা। অপরপক্ষে এই ধারণাগুলির বিপরীত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী দাদাভাই নওরোজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রমেশচন্দ্র দত্ত ইত্যাদি কৃত বৃটিশ সরকারের নীতির সমালোচনায়—এবং অধুনা মার্কসীয় ধারায় পুষ্টি ধনিকতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণে, যথা মানবেন্দ্রনাথ রায়, রজনী পাম্ দত্ত ইত্যাদির লেখায়। জাতীয়তাবাদী এবং মার্কসীয় আলোচনার ধারায় উপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়াতে পরাধীনদেশে অর্থনীতির উপর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অভিঘাত খুব গুরুত্ব পায়।

উপনিবেশবাদ যখন প্রবল ছিল তখন অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) ও অর্থনীতিতে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধিতা (laissez faire) ইংরেজ রাজনৈতিক মহলে অবিসংবাদিত নীতি। এডাম স্মিথ্ (তাঁর "ওয়েলথ্ অফ নেশনস্" পুস্তক, ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত) থেকে মধ্য ঊনবিংশ শতকের

ম্যানচেস্টর মত গোষ্ঠী (কব্‌ডেন, ব্রাইট্‌ ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীয় এবং রাজনৈতিক মোড়লেরা) পর্যন্ত ঐ নীতিতে সকলেই প্রায় একমত। এই মতে রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ মানে পুঁজিপতিদের কর বেশী দিতে হবে, পুঁজির সঞ্চয় (Capital accumulation) ও বিনিয়োগ ব্যাহত হবে, ধনিকতন্ত্রের বিকাশের যে যন্ত্রটা চাহিদা-যোগানের টানাপোড়েনে লাভ-জনক উৎপাদন করছে যেটা বেঠিক হয়ে যাবে, আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক বসা'ল প্রত্যেক দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক বিকাশ নষ্ট করবে। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পর দ্রুত বিকাশমান ধনিকতন্ত্র এই নীতি মুখে এবং কাজে মানতে শুরু করে। ভারতে ইংরেজ মুখে এমন বলেছে বটে কিন্তু কাজে মানেনি। ভারতের মতন উপনিবেশে (রাষ্ট্র কোনও অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না) এই নীতি চলে কি করে? ঔপনিবেশিকতার স্বার্থেই প্রয়োজন রাষ্ট্রদ্বারা কোন কোন ব্যাপারে এমন বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন যাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অব্যাহত থাকে, ইউরোপের শিল্পদ্রব্য অবাধে বাজারজাত হয়, কাঁচামালের উৎপাদন বাড়ে, পুঁজির বিনিয়োগের জন্য কোম্পানি আইন ইত্যাদি তৈরী হয়, ইত্যাদি প্রভৃতি। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ইংরেজ শাসক বোধ করল, কেননা অনেকক্ষেত্রে প্রাক্‌-ঔপনিবেশিক কাঠামো ধনিকতান্ত্রিক বিকাশের প্রতিকূল এবং সেই কাঠামোটাকে কেটে-ছেঁটে উপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। সুতরাং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ দরকার, তবে প্রয়োজন বুঝে। এককথায় তখনকার ইংরেজ মোড়লদের মতে রাষ্ট্রের দ্বারা অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ খারাপ, তবে বেশী খারাপ ইউরোপে, ভারতের মত উপনিবেশে অত খারাপ নয়—চলতে পারে, যদি সরকার বিবেচনা করে বিশেষদিকে পক্ষপাতিত্ব করে (discriminatory interventionism)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক্‌ সরকারের কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় অর্থনৈতিক ভূমিকা ছিল? আলোচনার সুবিধা হবে যদি মূলক্ষেত্রগুলি মনে রাখা যায়: (১) রেলপথ, রাস্তা, বন্দর ইত্যাদি অথবা তলার কাঠামো (infrastructure) তৈরী করা, (২) উৎপাদক হিসাবে, (৩) ও বাজারে ক্রেতা হিসাবে অবশ্যই সরকার হাজির; তাছাড়া আছে (৪) আইনদ্বারা ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ, (৫) আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্কের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, (৬) করনীতিদ্বারা অর্থনৈতিক বিকাশ ও জাতীয় আয়ের বিতরণের নিয়ন্ত্রণ, এবং (৭) ইংলণ্ডে টাকা পাচার করার যন্ত্র হিসেবে বৃটিশ ভারতের সরকারের ভূমিকা প্রবল। অবশ্য আরো অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির ধাক্কা পড়েছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়—সোজা নয়, কিন্তু বাঁকা পথে।

২

রাস্তা, রেল, বন্দর ইত্যাদি তৈরী, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বিকাশের কাঠামো তৈরী করার ব্যাপারে বৃটিশ সরকার খুবই সক্রিয় ছিল। প্রথমত রেলপথ। ১৮৫৩ সালে বড়লাট ডালহৌসি সিদ্ধান্ত করেন যে রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে রেলপথ সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক হবে। এর পেছনে ইংরেজ পুঁজিপতিদের চাপও ছিল। অধ্যাপক ডেনিয়ল থর্নার, ম্যাক্‌ফরসন ইত্যাদি দেখিয়েছেন যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মূলত (ক) ভারতে রেলকোম্পানিতে ইংরেজ পুঁজির বিনিয়োগ, (খ) রেলপথকে নিষ্কাশনের নালী হিসেবে ব্যবহার করে ভারত থেকে কাঁচামাল, বিশেষ করে তুলো, ইংলণ্ডের কারখানায় যোগান, (গ) ইংলণ্ডের রেলগাড়ী ইঞ্জিন, ইস্পাতের রেল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ভারতে বিক্রি করা, (ঘ) রেলপথ দ্বারা ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে ইংলণ্ডের কারখানার মাল, বিশেষকরে সুতিকাপড় বিক্রি করা। এইসব লাভের লোভই ছিল আসল কথা, এদেশের অর্থনীতির আধুনিকীকরণ মোটেও নয়। এছাড়া অবশ্য সামরিক স্বার্থে সীমান্তের কাছাকাছি জায়গায়, যেখানে লাভের সম্ভাবনা নেই, অতএব নেই ইংরেজ রেল কোম্পানি, সেখানে সরকার নিজ ব্যয়ে রেলপথ বানাতে শুরু করে এবং উনিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে করদাতাদের পয়সায় কিছু সরকারি রেল শুরু হয়। বিলিতিপুঁজিতে তৈরী রেলকোম্পানির পাশাপাশি।

রেলপথ তৈরীর এই উদ্যোগ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। রেলপথ তৈরী কি দেশকে আধুনিক করায় সাহায্য করে না? আভ্যন্তরীণ বাজার রেল দিয়ে একসূত্রে বেঁধে দেওয়ায় কি সুবিধা হয়নি অর্থনৈতিক বিকাশ ও ঐক্য আনয়ন করতে? রেল কোম্পানি ইস্পাত কলকব্জা ইত্যাদি এনে এবং দিশি মিস্ত্রিদের কলাকৌশল শিখিয়ে কি কারিগরি কুশলতা বাড়ায়নি? কার্ল মার্কস যে ১৮৫৩ সালে বলেছিলেন রেলপথ ধরে আসবে আধুনিক শিল্পায়ন, সেটা কি ভুল কথা?

এবারে আমরা আমাদের সরল ছবিটার মধ্যে অন্তর্নিহিত জটিলতাতে প্রবেশ করতে পারি। প্রথমত মনে রাখা দরকার যে এই ছবিটায় জোর দেওয়া হয়েছে কার স্বার্থে কি উদ্দেশ্যে রেলপথ তৈরী হ'ল, দেশের শ্রীবৃদ্ধি না অন্যকিছু? কোনও তর্কের অবকাশ নেই যে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলি যে সত্য তার পক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে; এবং পুঁজি যার লাভ তার উদ্দেশ্য হবে এটাও তর্কাতীত। তবে সব উদ্দেশ্য সফল হয় না, হয়নি। যেমন ধরা যাক্ উপনিবেশের বাজারে বৃটেনের শিল্পদ্রব্য বিক্রি: এটা যতটা আশা করেছিল ইংরেজ বণিকশ্রেণী তা হয়নি, কেননা গড় জাতীয় আয় নিতান্ত কম, তার উপর তাঁতীগুলো মরেও মরে না, আর বোম্বাই এবং আমেদাবাদের বেনেরা কারখানা খুলে প্রতিযোগিতা বাড়াল। পুঁজিবাদী উদ্দেশ্য এক, ইতিহাসের ধারা আরেক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে উদ্দেশ্যগুলি ছিল না। দ্বিতীয়ত, রেলপথ যদিও বিদেশী স্বার্থে হল, তার উপজাত অনেক ফলাফল ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিকূল ছিল না,

যেমন কারিগরি কৌশলের আমদানি, এবং আভ্যন্তরীণ বাজারের একীকরণ। তবু ইউরোপে যেমন রেলপথ শিল্পায়নের পথ হয়েছিল ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে তেমন হওয়ার সম্ভাব্যতা বোধহয় ছিল না। কেন?

একটা বড় কারণ এই যে রেলপথের ভৌগোলিক বিন্যাস এবং মালবহনের ভাড়া যেই হারে নেওয়া হত, দুটোই দেশের দূর অভ্যন্তর থেকে কাঁচামাল রপ্তানি ও সেখানে শিল্পদ্রব্য আমদানির অনুকূল ছিল। ভৌগোলিক বিন্যাস এমন করা হয় যাতে অভ্যন্তর থেকে কাঁচামাল বোম্বাই, কলকাতা ইত্যাদি বড় বন্দর শহরগুলিতে পৌঁছানোর নিকটতম রাস্তা পায়; অপরপক্ষে এই রেলপথ ম্যানচেসটরের সুতি কাপড় কিংবা বর্মিংহামের লোহা-ইস্পাত ইত্যাদি শিল্পদ্রব্য বাজারে পৌঁছতে পারে দূর অভ্যন্তরে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বা শিল্পসম্ভাবনার দিকে চেয়ে রেলপথ তৈরী হয়নি আর মালের উপর ভাড়াও ঐ একই নীতির দ্বারা প্রভাবিত: কাঁচামাল ও অন্যান্য কৃষিপণ্য, যেমন পূর্ববঙ্গের চাল, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের গম, দাক্ষিণাত্যের তুলো, কমভাড়ায় আনা যেত বন্দর শহরে। এসব পণ্যের উপর উল্টো পথে গাড়িভাড়া ছিল বেশী। অপরপক্ষে যে তৈরী শিল্পদ্রব্য বন্দর শহর থেকে দেশের অভ্যন্তরে যেত তার উপর গাড়িভাড়া ছিল কম, ভেতর থেকে বন্দরের দিকে আসা শিল্পদ্রব্যের তুলনায়। অধ্যাপক পানন্‌ভিকর, জন হার্ড ও অনেকে এইসব হিসেব দেখিয়েছেন। এককথায় রেলপথের বিন্যাস, অর্থাৎ কোন্ দিকে যাবে, আর কেমন ভাড়া হবে কোন্ মালের উপর, এই দুই নীতি কাঁচামাল রপ্তানি ও শিল্পদ্রব্য আমদানির পক্ষপাতী ছিল, অতএব ভারতের শিল্পবিকাশের বাধা ঘটিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত রেলপথ জিনিষটা দেশের বিকাশের ধারার বাইরের জিনিষ ছিল—শিল্প বা বাণিজ্য বিকাশের সঙ্গে দেশের মাটি থেকে গজিয়ে উঠল না। উনিশ শতকে ইংলণ্ডের দিকে তাকালে বোঝা যায় গজানো কাকে বলে। আমাদের দেশে যেন কিছু যন্ত্রপাতি আকাশ থেকে পড়ল। ইউরোপের ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে রেলের প্রসার মানে বাজারে পরিবহণের চাহিদা, দিশি পুঁজিপতিদের আগ্রহ, লোহা ইস্পাত যন্ত্রপাতি শিল্পের প্রসার, কয়লা লোহা খনিজ শিল্পের বৃদ্ধি, ইত্যাদি। অর্থাৎ রেলের পেছনে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, তার পেছনে ইস্পাত লোহা শিল্প, তার পেছনে খনিজ নিষ্কাশন, এইভাবে একটা পারম্পর্য শৃঙ্খল পিছনে বিছিয়ে গেল (একে বলে backward linkages)। অপর পক্ষে, ভারতে ১৮৫৫ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত রেল রাস্তা, ১৯৪০ পর্যন্ত রেলইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি, ১৮৬৫ পর্যন্ত কয়লা অবধি আমদানি হল ইংলণ্ড থেকে। অর্থাৎ এই পারম্পর্য শৃঙ্খলের লাভটা খেল ইংলণ্ডের লোহা, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং খনিজ শিল্প। তাই রেলপথ উদ্‌গতির ফলে অন্যান্য ভারী শিল্পের যা বিকাশ হয়ে থাকে তা ভারতে হয়নি।

উপরন্তু রেলপথ নওরোজি যাকে বলেছিলেন ধননিঃসরণ (drain of wealth), তার একটা পথ হয়ে দাঁড়াল। ইংলণ্ডের পুঁজি দূর ভারতে বিনিয়োগ করতে যে ঝুঁকি নেবে তার প্রতিদান হিসেবে, এবং কিছুটা ভারতে রেলে টাকা

ঢালতে ইচ্ছুক পুঁজিপতি পাওয়া মুস্কিল ছিল বলে, এবং কিছুটা হয়ত ইংরেজ বণিকশ্রেণীর চাপ ও ইংলণ্ডে অবস্থিত ভারত সাম্রাজ্যের অধিকর্তাদের পক্ষপাতিত্বের জন্য—ভারতের রেলকোম্পানিগুলি একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে। সেটা হল পুঁজি যারা ঢালছে রেলকোম্পানির শেয়ারে তাদের নিম্নতম পাঁচ শতাংশ চুক্তি মাফিক সুদ (guaranteed interest) ; ব্যবসাতে রেল কোম্পানির লাভ না হয়ে ক্ষতি হলেও এই সুদ দেয়। এর একটা ফল চট করে বোঝা যায়—রেলপথ তৈরী হল মিতব্যয়িতার লাগাম বিনা, কারণ খরচের দরুণ যদিবা লাভ না হয়, কোম্পানির মালিকদের হাতে পাঁচ শতাংশ লাভ আপনি আসবে সরকার অর্থাৎ ভারতীয় করদাতার টেঁক থেকে। একটা হিসেব অনুসারে ভারতে প্রতি মাইল রেলপথ তৈরীর খরচ উত্তর আমেরিকার তুলনায় প্রায় দেড়গুণ। যাইহোক্, মোট কথা হল যে এই চুক্তিমাফিক সুদ দিতে হত ভারতীয় টাকায় নয় ইংলণ্ডে পাউণ্ড স্টারলিং মাধ্যমে। এটা কালক্রমে ইংলণ্ডে ভারত সরকারের যে খরচা দিতে হত (Home Charges) তার একটা বড় অংশ হয়ে দাঁড়ায় এবং ধননিঃসরণের প্রবাহটিকে স্ফীত করে। ১৮৭০ থেকে এই ব্যয় টাকার হিসেবে খুব বাড়তির দিকে যায় কেননা বিশ্বের বাজারে রূপার দাম নেমে গিয়ে ভারতীয় টাকার সঙ্গে পাউণ্ড স্টারলিং-এর বিনিময় হার বিপর্যস্ত করে দেয়।

সবদিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় কেন অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তরা, যথা রানাডে ও রমেশ দত্ত, রেলপথের প্রসার দেশের শ্রীবৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখেননি। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে আধুনিক রাস্তা তৈরীর ব্যাপারটা খুবই উপেক্ষিত ছিল। দু-একটি মূল রাস্তা বাদে, যেমন কলকাতা থেকে পেশাওয়ারের গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড, রাস্তা তৈরী হত রেলপথের পরিপূরক হিসেবে (feeder roads) অথবা সামরিক প্রয়োজনের খাতিরে (Strategic roads) এবং তাও শুরু হয় 'সিপাহী বিদ্রোহের' দু-এক বৎসর আগে ডালহৌসি প্রতিষ্ঠিত পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্ট দ্বারা। তবু জন স্ট্রেচি'র কথাটা মনে রাখার মতন : বৃটিশ রাজের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি স্তম্ভ হল উনিশ শতকের তৈরী ট্র্যাঙ্ক রোড, এলাহাবাদ (১৮৫৫), দিল্লী (১৮৬৭), আর বারাণসীর (১৮৮৭) সেতু, অথবা বোম্বাই-এর মতন পোতাশ্রয়।

৩

১৯৫১ অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে, উৎপাদক হিসাবে সরকার আমাদের পরিচিত, মিশ্র অর্থনীতির কল্যাণে। তার আগে উৎপাদক হিসাবে সরকারের ভূমিকা সামান্য, কারণ সেটা অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ বিরোধী নীতির (laissez faire) পরিপন্থী। তবু কয়েকক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ চলেছিল ব্যক্তিগত মালিকানায় চালিত ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, বরং তেমন ব্যবসাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। এই প্রকার সরকারি উদ্যোগের উদ্দেশ্য

কখনও ব্যয় সঙ্কোচ করার চেষ্টা, কখনও সামরিক সরবরাহ যোগান অব্যাহত রাখা, কখনও সরকারি উদ্যোগ দ্বারা ইংরেজ পুঁজিপতিদের জন্য একটা নতুন ব্যবসার সূচনা করা।

উপরের প্রথম ও তৃতীয় উদ্দেশ্য প্রকট চা বাগিচা খোলার ব্যাপারে। এখন আমাদের দেশে যে চা পাওয়া যায় সেটা চীন থেকে আনা এবং দিশি কিছু বুনো উদ্ভিদের এক সংকর মিশ্রণ যা থেকে চা পাতা নেওয়া হয়। উনিশ শতকের গোড়ার দুই-তিন দশক অবধি ইংলণ্ড চীন থেকে চা আমদানি করত প্রচুর দাম দিয়ে আর ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতের আয় থেকে টাকা ঢালতে হত ওই চা কিনতে। কোম্পানির কিছু ইংরেজ কর্মচারী চেষ্টা করতে শুরু করে চীনা চা এদেশে চাষ করতে অথবা সংকরণ করতে দিশি কিছু উদ্ভিদের সঙ্গে। ১৮৩৩ সালে রীতিমতন সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায় আসামে চা বাগিচা শুরু হয় এবং পরে এটাই আসাম-টি-কোম্পানি নামে দেশের সবচেয়ে বড় আর পুরানো চা কোম্পানি হয়ে দাঁড়ায়। এই কোম্পানি ইংরেজ সরকার বিক্রী করে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের হাতে ; এই বাগান বিক্রির সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর কিনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু 'নেটিভ' ব্যবসায়ীর হাতে সরকার বাগান দিতে নারাজ ছিল। ব্যাপার দাঁড়াল এই যে ব্যবসার ঝুঁকি এবং প্রাথমিক খরচা ভারতসরকারের অর্থাৎ ভারতীয় করদাতার ; আর যখন লাভ শুরু হল ব্যবসা গেল ইংরেজ বণিক শ্রেণীর হাতে। ইংলণ্ডের রেজিস্ট্রিকৃত ইংরেজ পুঁজিতে তৈরী বহু কোম্পানি গজিয়ে ওঠে আসামে চা ব্যবসায়ে প্রায় বিনে পয়সায় সরকারের খাস বনভূমি থেকে রাজস্ব মুক্ত (Revenue free) জমি পেয়ে। প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদকের ভূমিকায় সরকার চা শিল্পের গোড়াপত্তনই কেবল করেনি, তার পক্ষপাতী হস্তক্ষেপের আরেকটা উদাহরণ হল চা বাগিচা মালিকদের খাতিরে মজুরীর বাজারে (labour market) হস্তক্ষেপ। চা বাগান যেখানে তৈরী হল সেখানে আবাদ প্রায় ছিল না, আর জনসংখ্যা খুব কম। তাই দরকার দূর প্রদেশ থেকে সরকারি আনুকূল্যে ওরাঁও, মুণ্ডাদের দক্ষিণ বিহার কিংবা মধ্যপ্রদেশ থেকে 'কুলি' হিসেবে আমদানি করা। এরা সুযোগ পেলে পালিয়ে যেত তাই ১৮৬০ সালে একটা বিশেষ আইন সরকার করে যে, কুলিরা যদি চুক্তিভঙ্গ করে চলে যায় তবে তাদের অপরাধ ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় হবে (যদিও সাধারণত চুক্তিভঙ্গ কেবল দেওয়ানী আদালতে দণ্ডনীয়)। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি থেকে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ("চা পান, না কুলির রক্ত পান") অনেকে চা বাগানের কুলিদের দাসত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন। কিন্তু যতদিন ইংরেজ পুঁজি এই ব্যবসায় প্রবল ছিল মজুরদের অবস্থা প্রায় প্রাক্ ১৮৩৫ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর চিনি বাগিচা, কিংবা প্রাক্ ১৮৬০ আমেরিকার তুলোবাগিচার দাসদের সমান ছিল। সরকারের সমর্থন এজন্যে অনেকটা দায়ী।

সরকারি উদ্যোগের দ্বিতীয় ধরনের উদ্দেশ্য, সামরিক প্রয়োজনের যোগান, দেখা যায় গোলা-বারুদ বন্দুক ইত্যাদির ক্ষেত্রে। কোম্পানির আমলে ১৮৩০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে, কয়েকটা লোহার কারখানা সরকারি উদ্যোগে বা

সহযোগিতায় চালু করার চেষ্টা হয়েছিল—কুমায়ুন পাহাড়ে, বাংলায় বীরভূমে, মাদ্রাজের পোর্টোনোভোয়—কিন্তু এগুলো টেঁকেনি, কারণ শীঘ্রই ইংলণ্ড থেকে রপ্তানি সস্তা লোহা বাজার ভাসিয়ে দিল। সেই লোহা দিয়ে অস্ত্র ইত্যাদি তৈরী সস্তা হল, আর সামরিক প্রয়োজনে সরকারের চাহিদা ছিল অনেক। ১৮৪৬ সালে দমদমের গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরি চালু হয় সরকারি উদ্যোগে ; প্রসঙ্গক্রমে, এই কারখানারই অবদান দমদম বুলেট, সেটা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ফেটে ছড়িয়ে বিরাট আঘাত সৃষ্টি করে—এটি এখন আন্তর্জাতিক জেনেভা চুক্তি অনুসারে নিষিদ্ধ অস্ত্রাদির একটা। ১৮৬০ সালে কানপুরে শুরু হয় সামরিক প্রয়োজনে চামড়ার জিন, হাওদা, বুট ইত্যাদির কারখানা—পরে কানপুর চর্মশিল্পের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৫-এর মধ্যে দমদমের ন্যায় ১৩টি গোলাবারুদ কারখানা ভারতে সরকারি উদ্যোগে চালু হয়। মনে রাখা দরকার যে সেই সময়ে আর্মস অ্যাক্ট দ্বারা সমগ্র জাতিটাকে নিরস্ত্রীকৃত করা হয়েছিল। সবশেষে বলা দরকার, যে ধরনের সরকারি উদ্যোগ দেখা যায় বৃটিশ ভারতে সেটা কেবল সীমিত ছিল না, অর্থনৈতিক বিকাশে যা প্রয়োজন তার সঙ্গে সম্পর্কহীন। উৎপাদক হিসেবে বা উৎপাদন উৎসাহিত করতে রাষ্ট্র খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে অনেক দেশে যারা শিল্পবিপ্লবের দৌড়ে গোড়ায় যোগ দিতে পারেনি, দেরিতে শুরু করেছে—যেমন রাশিয়া, প্রাশিয়া, জাপান। এরা ছিল স্বাধীন দেশ। বৃটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্যোগ পরাধীনদের দিকে তাকিয়ে তৈরি হতে পারে না।

আমাদের দেশে তখন এবং সম্ভবতঃ এখনও সরকার বাজারে বৃহত্তম একক ক্রেতা। তাই সরকারি ক্রয়নীতি সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। দ্রব্য ক্রয় নিয়মাবলী (Stores Purchase Regulations) অনুসারে সরকারের নানা দপ্তর বাজারে জিনিস কেনে, যথা সৈনিকদের জন্য কাপড়, রেলের জন্য লোহা, কেরাণিদের জন্য কাগজ, ইত্যাদি। ১৮৭৫ সাল অবধি নিয়ম যা ছিল তাতে বেশিরভাগ জিনিসই কেনা হত ইণ্ডিয়া অফিস মারফৎ ইংলণ্ডের বাজারে। তার ফল একদিকে ভারতের টাকায় ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের পুষ্টি, অপরদিকে বিদেশিমুদ্রায় ভারতসরকারের ব্যয়বৃদ্ধি। ১৮৭৬ সালে এই ব্যয় এত বাড়ে যে ভারতসচিব লর্ড সলস্‌বেরি (Salisbury) বেশ কিছু জিনিস ভারতে কিনতে শুরু করার আদেশ দেন—তবে তার মানে এই নয় যে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, প্রায় সবই ভারতাবস্থিত ইংরাজ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে। ১৮৮৩ সালে গভর্ণর জেনারেল রিপনের আগ্রহে ভারতে আরও বেশি পরিমাণ সরকারি ক্রয় শুরু হয় এবং ১৯১৪ সাল থেকে মহাযুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের বাজারে সরবরাহের অনটনের সময়ে বাধ্য হয়ে ভারত সরকার এদেশেই কিনতে শুরু করে প্রায় সব কিছু, এমনকি লোহা ইস্পাত পর্যন্ত। সেই প্রথম ভারত সরকার এদেশে লোহা ইস্পাত কিনতে শুরু করে আর সেটা ছিল জামসেদজি টাটার কারখানার পক্ষে সুবর্ণসুযোগ কেননা তার জামসেদপুর কারখানা তখন পুরো চালু হয়েছে। এই ভাবে ধীরে, বহুদিন ধরে অবস্থার চাপে, এবং মূলতঃ

ব্যয়সংকোচের খাতিরে, ভারতের সরকার ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করতে আরম্ভ করে। কোন কোন শিল্পের পক্ষে ক্রয়নীতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল—যথা, ভারতে প্রস্তুত প্রায় ৯০ শতাংশ ইস্পাত সরকার কিনতে থাকে প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার পরের দশকে।

৪

রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে আমদানি-রপ্তানির ওপর শুল্ক দ্বারা, এবং খুব বিরল দৃষ্টান্তে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা। এদেশে বিলিতি শিল্পদ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিলেতের শিল্পবিপ্লব ছাড়াও বৃটিশ ভারতের শুল্কনীতির একটা ভূমিকা ছিল। এক সময়ে ঐ সব মালের চাহিদা ছিল না। অষ্টাদশ শতকের বাংলায় বিলিতি জিনিসের দাম বেশি, খদ্দের কম, তাই রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বাজার বর্ণনায় আছে: "বিলাতি বহুত চিজ্ বেস কিম্মতের। খরিদ্দার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ঢের ॥" স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকে দেশের শিল্প বিকাশের খাতিরে বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার। পরাধীন ভারতে ঠিক বিপরীত ঘটেছিল কেমন করে রমেশ দত্ত বিস্তারিত দেখিয়েছেন। তাঁর এবং অধ্যাপক ভকিল, হীরালাল দে ইত্যাদির বহুল প্রচারিত সিদ্ধান্ত আমরা সংক্ষেপে বলছি।

১৮৫৮ থেকে ১৮৭৪ অবধি বৃটিশ ভারতের সরকার শুল্কনীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা করে। ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের একটা ফল ছিল সরকারের ব্যয়ের এবং ঋণের বৃদ্ধি। তার ফলে সরকার বাধ্য হয় আয় বাড়াতে আমদানি শিল্পদ্রব্যগুলির, বিশেষ করে সুতো ও সুতির কাপড়-এর ওপর শুল্ক বাড়িয়ে দেয়। এটা একটা আপৎকালীন ব্যবস্থা যেটা ইংলণ্ডের শিল্পস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক বোঝাই যায়। ১৮৬০ সালে নতুন শুল্কনীতি নির্ধারিত করেন জেম্স্ উইলসন বৃটিশ ভারতের প্রথম বাজেটে। তিনি বলেন যে আমদানি শিল্পদ্রব্যের ওপর শুল্ক যথাসম্ভব এবং যথাশীঘ্র কমানো দরকার, কেননা এতে ইংলণ্ডের শিল্পের ক্ষতি। দ্বিতীয়তঃ রপ্তানি কাঁচামালের ওপর শুল্ক না থাকাই ভাল কেননা এতে ইংলণ্ডের কারখানায় কাঁচামালের দাম বাড়ে আর ভারতের কৃষিরও যথোপযুক্ত বৈদেশিক আয় ব্যাহত হয়। এই দুই নীতির মূলে আছে অবাধ বাণিজ্যের (laissez faire) ভাবধারা। কিন্তু বিবেচনার তৃতীয় বিষয় হল সরকারের আয়-ব্যয় অন্ততঃ সমান রাখার প্রয়োজনীয়তা (মনে রাখতে হবে যে সেদিন পর্যন্ত deficit financing খুব বিপজ্জনক ভাবা হত)। তাই ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী (তখন বলা হত Finance Member) যে প্রথম ভারতীয় বাজেট করেন তাতে যে নীতি দুটি বলা হয়েছিল সেগুলি অমোঘ অনুজ্ঞা বলে যদিও ধরে নেওয়া হয় প্রায় পরের অর্ধশতাব্দীতে, আয়ব্যয়ের অমিল এড়াতে কখনও কখনও ব্যত্যয় করা হয়েছিল। এই জন্য ১৮৭৪ অবধি আমদানির ওপর শুল্ক কখনো একটু বাড়ে কখনো কমে, কিন্তু মোটামুটি কমতির দিকে—একেবারে নিঃশুল্ক আমদানি ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা চাইছিল বটে, কিন্তু

তাহলে সরকারের আয়, ব্যয়ের চেয়ে নেমে যেতো, তাই সেটা সম্ভব হয়নি।

১৮৭৪ থেকে ১৮৮২ ধরা যেতে পারে শুল্ক ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়। ম্যাঞ্চেসটরের সুতীকলের শিল্পপতিরা ১৮৭৪-এ খুবই হৈ-চৈ শুরু করে যে তাদের কাপড়ের ওপরে শুল্ক বসিয়ে ভারত সরকার পরোক্ষে বোম্বাইয়ের ভারতীয় শিল্পপতিদের সংরক্ষণ (protection) করছে। গভর্ণর জেনারেল নর্থব্রুক দেখেন তহবিল ফাঁক হবে আমদানি শুল্ক সরালে, তার ওপর উনি হয়ত লিবারেল পার্টির বলে একটু নরম ছিলেন ভারতীয় স্বার্থের প্রতি। তিনি ১৮৭৫ সালের বাজেটে আমদানি কাপড়ের ওপর ৫ শতাংশ শুল্ক সরাতে নারাজ হলেন। অর্থাৎ লড়াইয়ে প্রথম রাউণ্ডে ম্যাঞ্চেসটরের হার। দ্বিতীয় রাউণ্ডে বৃটেনে সরকারের ভোল পালটালো : লিবারেল ভারতসচিব আরগাইল্-এর জায়গায় এলেন টোরি মন্ত্রী, সলসবেরি। টোরিরা ম্যাঞ্চেসটর শিল্পপতিদের কাছে প্রায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সলসবেরি বললেন যে নর্থব্রুক ভারতসচিবের মত বিবেচনা না করেই রায় দিয়ে অন্যায় করেছেন : নর্থব্রুক প্রতিবাদ করলেন। ফলাফল : কেউ জিতলো না। তৃতীয় রাউণ্ডে ভারত সরকারের ওপর মহলে ইংলণ্ডের সামিল পরিবর্তন : ইংলণ্ডের নতুন মন্ত্রীসভার নির্দেশে নর্থব্রুকের জায়গায় এলেন (১৮৭৬) টোরী গভর্ণর জেনারেল লিটন ; তাঁর অর্থমন্ত্রী হলেন (১৮৭৭) জন্ স্ট্রেচি, কড়া অবাধ বাণিজ্যবাদী। এই সুযোগে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের চাপে কমন্স্সভা প্রস্তাব পাশ করলো ভারতে আমদানি শুল্ক খারিজ করার পক্ষে। ফলে ১৮৭৮ সালের ভারতীয় বাজেটে মধ্যম শ্রেণীর কাপড়ের ওপর শুল্ক রদ হল। এবং এতেও ইংলণ্ড সন্তুষ্ট না হওয়ায়, পরের বৎসর খুব উচ্চ শ্রেণীর দামী কাপড় ছাড়া আর সবই বিনা শুল্কে আমদানি হতে শুরু করে। লড়াইয়ের শেষ রাউণ্ডে ম্যাঞ্চেসটরের জিৎ।

১৮৮২-১৮৯৪ আরেকটি পর্যায় যখন যা সামান্য আমদানি শুল্ক ছিল সবই রদ হয়ে বৃটিশ ভারত অবাধ বাণিজ্যের স্বর্গরাজ্যে উপনীত হয়। এই কীর্তি ১৮৮২ বাজেটের প্রণেতা বেয়ারিং-এর (ইনি বিলাতের একটা বড় ব্যবসায়িক পরিবারের ছেলে, পরে ইনিই মিশর এবং অন্যত্র গভর্ণর ইত্যাদি হয়ে লর্ড ক্রোমার নামে সাম্রাজ্যের ইতিহাসে পরিচিত)। কেবল নুন এবং উচ্চ শ্রেণীর মদের ওপর শুল্ক ছাড়া আমদানি ছিল অবাধ।

যে তথ্যটা রমেশ দত্তের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল সেটা হল এই শেষোক্ত দুই পর্যায়ে ইংলণ্ডের বণিকস্বার্থের পক্ষে প্রাণপণ চেষ্টা ভারতীয় শুল্ক রদ করার কারণ : ১৮৭৪-১৮৯৫ সালে ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে একটা গভীর সংকট, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেমন মাঝে মাঝে দেখা যায়। এই সংকটের ফলে ইংলণ্ডের উৎপাদন কমে, বেকারি বাড়ে, লাভ এবং বিদেশে বিনিয়োগ নিম্নমুখী হয় এবং বিদেশে শিল্পদ্রব্য চালান দিয়ে সংকটের ক্ষতিগুলি পুষিয়ে নেওয়া তাই জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। এই সংকটে বৃটিশ ভারতের সরকার পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) মেনে নেয়।

কিন্তু এই সরকারের এটাও বিবেচনার বিষয় যে খরচ চালাতে হবে, আর

শিল্পদ্রব্যের আমদানি যেখানে বাড়ছে সেখানে আমদানি শুল্ক না থাকায় আয়ের একটা সোজা রাস্তা বন্ধ থাকে। তাই ১৮৯৪-৯৫ থেকে নীচু হারে আমদানি শুল্ক অনেক জিনিসের ওপর ফের বসানো হয়। এই সব জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমদানি হত কাপড়—তাই ফের ম্যাঞ্চেসটর হৈ-চৈ শুরু করে এবং তার ফলে শীঘ্রই ভারতে তৈরি কাপড়ের ওপরও একই হারে বিশেষ কর বসানো হয়; এর উদ্দেশ্য ম্যাঞ্চেসটরের আমদানি কাপড় আর এদেশী কাপড় যেন সমান করভার বহন করে, যাতে এদেশী কাপড় প্রতিযোগিতায় কোন সুবিধা না পায়। এইভাবে সরকারের হাতে শুল্ক থেকে পয়সাও এলো, আবার অবাধ বাণিজ্যের (free trade) মূল নীতি বজায় রইলো, শুল্ক দ্বারা দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ (protection) হওয়ার সম্ভাবনা রইলো না। এই কৌশল, যাকে বলা হত সমতুল্য কর নীতি (countervailing excise duty), এই শতাব্দীর বিশের দশক অবধি চলেছিল এবং জাতীয় কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে খুবই সোচ্চার ছিল।

দু-এক কথায় বলতে গেলে আমদানি-রপ্তানি শুল্কনীতির মূল ধারা ছিল এই যে অবাধবাণিজ্য (free trade) নীতির নামে শিল্পায়নে অগ্রসর ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের ভারতীয় বাজার কব্জা করতে সাহায্য করা। রমেশ চন্দ্র দত্ত, মদন মোহন মালব্য ইত্যাদি তাই শুল্কনীতিটিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন কেননা এতে দেশের শিল্পায়ন পিছিয়ে ছিল। বৃটিশ সরকার একে কেন এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন? প্রথমতঃ, ইংলণ্ডের শিল্পগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চাপ যেটা পার্লামেন্টের থেকে ভারতসচিবের মাধ্যমে ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও সরকারের ওপর এসে পড়তো। কোন কোন সময় এই চাপ বিশেষ প্রবল হত যথা ১৮৭৪-১৮৯৫ ইংলণ্ডে মন্দা ও অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে। দ্বিতীয়তঃ, ভারত এমন একটা উপনিবেশ যেখানে ইংরেজ প্রায় স্বেচ্ছাচারী; কানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়া জাতীয় শ্বেতজাতির উপনিবেশগুলি চট্‌পট্‌ স্বাধীনতা পেয়ে নিজের দেশের শিল্প সংরক্ষণ করতে বিদেশী আমদানির ওপর চড়া শুল্ক চড়িয়ে দিয়েছিল। বলির পাঁঠা বাকি রইল ভারত। তৃতীয়তঃ, ভারতের বহির্বাণিজ্য ইংলণ্ডের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেননা, বিংশ শতাব্দীর শুরু অবধি ভারত কেবল যে ৬০ শতাংশ আমদানি ইংলণ্ড থেকে করতো তাই নয়, অন্য দেশে ভারতের রপ্তানি থেকে যা বিদেশি মুদ্রা আয় হতো তাতে সেসব দেশের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্য অনুদ্বৃত্ত মেটানো যেত।

ঔপনিবেশিক আমলের শুল্কনীতির এই যে চেহারা তার কিছু পরিবর্তন দেখা যায় বৃটিশ শাসনের শেষ দুই দশকে। জাপান ও জার্মানির সঙ্গে বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছিল ইংলণ্ড, সাম্রাজ্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নীতি (Imperial Preference) দ্বারা ইংলণ্ড নিজেকে এবং কমনওয়েল্‌থের দেশগুলির শিল্পস্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টায় আনুষঙ্গিক ছিল ভারতীয় কিছু শিল্পকে শুল্ক দ্বারা সংরক্ষণ (tariff protection) নীতি গ্রহণ করা। আগেই এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এর ফলে দিশি শিল্পপতিরা যে সাহায্য পেয়েছিল, ১৯৩০-এর দশক থেকে, তাতে সন্দেহ নেই।

খাস ঔপনিবেশিক আমলে, বিশেক করে উনিশ শতকের শেষভাগে, রাষ্ট্রের আর একটা বড় ভূমিকা ছিল এদেশ থেকে ইংলণ্ডে ধন নিঃসরণের (Drain of Wealth) ব্যাপারে। পরোক্ষ ভূমিকা যা ছিল—অর্থাৎ এদেশের স্বাধীনতা হরণ করে বিদেশী পুঁজিপতিদের এদেশ থেকে লাভ নিষ্কাশন করার সুবিধে করে দেওয়া—সে সম্বন্ধে বলছি না। প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ ভারতের সরকার বিদেশে ধন চালান করার যে কল বসিয়েছিল সেটার কথা হচ্ছে এখন। দেশের করদাতাদের থেকে নেওয়া পয়সার সরকারি ভাণ্ডার থেকে ইংলণ্ডের দিকে ধন নিঃসরণের কয়েকটা নল তৈরি হয়। প্রথমতঃ, ভারত সরকারের বিদেশী ঋণের জন্য দেয় সুদ। কিসের ঋণ ? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নানা ধারকর্জ করতো যুদ্ধের খরচ মেটাতে, আর এই যুদ্ধগুলির অনেকগুলিই ভারতে বিভিন্ন অংশ হস্তগত করবার জন্য। ১৮৫৮ সালে এই ঋণগুলি বর্তালো বৃটিশ ভারতের সরকারের ওপর, অর্থাৎ তার সুদ দেবে ভারতীয় করদাতা। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ দমনে প্রচুর খরচ হ'ল, ধার হলো ইংলণ্ডের বাজারে, সেই ঋণের ভারও এই দেশের করদাতার ওপর। একেই বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা।

দ্বিতীয়তঃ, মাছ ভাজার এই অভিনবত্বটা আরও দেখা যায় সামরিক খরচের খাতে। যেসব ইংরেজ সৈনিক ভারতীয় সেনাদলে ভর্তি হতো তাদের প্রথম দিন থেকে ইংলণ্ডে শিক্ষা, খাওয়া-পরা, জাহাজ ভাড়া থেকে শুরু করে অবসর প্রাপ্তির পর মাসোহারা অবধি ভারতীয় করদাতাকে দিতে হত পাউণ্ড স্টারলিং-এর হিসেবে। যখন বৃটিশ সেনাবাহিনীর রেজিমেণ্ট এদেশে আসতো তখন তাদের ওপর খরচের অংশ দিতে হত ভারতীয় করদাতাকে বৃটেনের যুদ্ধ দপ্তরকে (War Office)। এখানে মনে রাখা দরকার যে একজন দিশি সেপাইয়ের প্রায় দ্বিগুণ খরচ হত একজন ইংরেজ সেপাইয়ের জন্য, বিশেষ খানাপিনা, ব্যারাক, রাহাখরচ ইত্যাদির দরুণ। তার ওপর সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকারি নীতি হয়েছিল অন্ততঃপক্ষে ২ : ১ অনুপাতে ভারতীয় : ইংরেজ সিপাহী মজুদ রাখা ভারতে। তাছাড়া এটাও মনে করা দরকার যে ১৮৫৮-১৯১৪ অনেকগুলি যুদ্ধ হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে—যথা বর্মায়, আফগানিস্তানে, চীনে, ইথিওপিয়ায়—এবং তার খরচের মোটা অংশ ছিল ভারতের। এক কথায়, ভারতেরই খরচে ভারত ও কিছু অন্যান্য উপনিবেশিত দেশ বিজিত অথবা অধিকৃত রাখতে ভারতীয় সরকার উদ্যম দেখিয়েছিল, ফলতঃ আমাদের করভাণ্ডার থেকে টাকা বিদেশে চালান যেত সরকারের হাত দিয়ে।

তৃতীয়তঃ, ভারত সরকারের বিদেশে খরচের আরেকটা কারণ ছিল রেলে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ এবং রাস্তা খাল পোতাশ্রয় ইত্যাদি নির্মাণ এবং সরকারি ও সামরিক কাজে ব্যবহৃত অনেক জিনিস বিদেশে ক্রয়। আগেই বলেছি চুক্তিমাফিক সুদ (guranteed interest) দিতে হ'ত রেল কোম্পানির শেয়ারমালিকদের যারা প্রায় সকলেই ইংলণ্ডের অধিবাসী। আরও বলেছি যে

সরকারি ক্রয় নীতি (purchase policy) যেমন ছিল তাতে বিদেশি মুদ্রা খরচ অনেক হ'ত। এটা অবশ্য অনস্বীকার্য যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রেলে বিনিয়োগের পুঁজি বা সরকার দ্বারা ক্রীত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এদেশে হয়ত পাওয়া সহজ ছিল না, তাই এই খাতের খরচটা অসহনীয় অন্যায় বলা চলে না।

চতুর্থতঃ, ভারত শাসন করার খরচটার একটা অংশ ইংলণ্ডে হ'ত নানা খাতে। ভারতসচিব (Secretary of State for India) বৃটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য কিন্তু তাঁর মাইনে দিত ভারতীয় করদাতা। একইভাবে দেওয়া হত সচিবের সচিবদের মাইনে, তাঁর পরামর্শ সভার (Secretary of State's Council) খরচ, লণ্ডনে ভারত দপ্তরের (India Office) খরচ, ব্যাংক অফ ইংলণ্ডের কাছে কমিশন বাবদ দেনা, এমনকি কোন কোন জায়গায় (যথা আরব কিংবা চীনদেশে) বৃটেনের বৈদেশিক দূতাবাস বা বাণিজ্য প্রতিনিধির খরচ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সমস্ত মিলিয়ে ইংলণ্ডে বৃটিশ ভারতের সরকার যে প্রভূত খরচ করতো তাকে বলা হত 'দেশের খরচ' (Home Charges)। বিদেশের খরচের কেন এই নাম সেটা স্পষ্ট : বৃটিশ ভারতের শাসকদের কাছে এদেশই বিদেশ আর বিলেতটাই স্বদেশ।

৬

করনীতি দ্বারা একটা দেশের সরকার আজকাল অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু উনিশ শতকে কি বিশ শতকের গোড়ায় করনীতির উদ্দেশ্যগুলি খুবই সীমিত ছিল। কারণ সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অবাধনীতির (laissez faire) প্রবক্তারা প্রবল ছিল এবং আগেই দেখেছি তাদেরই চাপে অবাধ বাণিজ্য (free trade) ছিল ইংরাজদের উদ্দিষ্ট রামরাজ্য। এই ভাবধারায় করব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে চাহিদা-যোগানের (demand and supply) কল যেন বিগড়ে না যায়, পুঁজি সঞ্চয় ও বিনিয়োগ যেন ব্যাহত না হয় করের চাপে। সরকার কর নেবে কেবল ব্যয় নির্বাহের জন্য, অন্য উদ্দেশ্য নয়। যেমন ধরা যাক, আয়কর : এটা এই চিন্তাধারায় খুব বিপজ্জনক কেননা এতে পুঁজির সঞ্চয় ব্যাহত হয়। ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণী আয়কর মেনে নেয় অনেক কেঁদে-কঁকিয়ে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে। এবং তার চেয়েও বিপজ্জনক হবে যদি প্রগতিশীল আয়কর (progressive taxation) দ্বারা সরকার বেশি আয়সম্পন্ন লোকেদের কাছে বেশি হারে কর নিতে চায় ; পুঁজিপতি বেশি লাভ করে যদি বেশি পয়সা হাতে না রাখতে পারে তাহলে ধনিকতান্ত্রিক বিকাশ হবে কি করে। কর কম হলেই ভাল, সুতরাং সরকারের খরচ কম হলেই ভাল, সুতরাং সরকারের কার্যক্ষেত্রের পরিধি ছোট হওয়া ভাল—অর্থাৎ সামাজিক কল্যাণ, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি খাতে খরচ যথা সম্ভব কম রাখাই বাঞ্ছনীয়। কার্লাইল ঠাট্টা করে লিখেছিলেন যে এই নীতিতে রাষ্ট্র একটা পাহারাদার মাত্র (a night-watchman State)। শেষতঃ, এই

অবাধনীতির একটা মূল সূত্র হল যে আয়-ব্যয়ের মিল (balanced budget) থাকা চাই, ঘাটতি যেমন খারাপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমনই খারাপ বাজেট ঘাটতি সরকারের বেলায়। ইংলণ্ডে উনিশ শতকের মাঝ থেকে এই সব নীতি প্রায় প্রশ্নাতীত অনুজ্ঞা ছিল এবং প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন্‌-কে এই নীতির উদাহরণ স্বরূপ ভাবা হত।

এই ভাবধারার প্রভাব ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিন্তু একটু তফাৎ আছে। কেননা উপনিবেশে সরকারের বিশেষ অবস্থা। খরচ কমানোর নীতি ইংলণ্ডে চলেছিল, বিশেষভাবে নেপোলিয়নকে হারিয়ে দেওয়ার পর। কিন্তু ভারতে সামরিক খরচ কমানো মানে, বিশেষতঃ সিপাহী বিদ্রোহের পরে, উদ্বেগজনক দুর্বলতা। সামরিক খাতে খরচ তাই বাজেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গ্রাস করেছিল। এটা খালি ভারতকে পায়ের তলায় রাখতে দরকার নয়, এশিয়ার ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বজায় রাখতেও বটে। দ্বিতীয়তঃ, কর ব্যবস্থা উপনিবেশের উপযুক্ত করার মানে কৃষিক্ষেত্রে কর দ্বারা ধন নিষ্কাশন, কিন্তু অবাধ বাণিজ্য বজায় রেখে আমদানি-রপ্তানি যথাসম্ভব শুল্কমুক্ত রাখা। তৃতীয়তঃ, যদিও ইংলণ্ডে রাষ্ট্র দ্বারা রেল প্রবর্তনের দরকার ছিল না, কেননা ব্যক্তিগত মালিকানায় পুঁজিপতিরা কোম্পানি গঠন করে এসব করেছিল, ভারতে সেই উদ্যোগ এবং কারিগরি কৌশল রাষ্ট্র দ্বারা বিশেষ ব্যবস্থা করে আনার দরকার ছিল। এমনকি অর্থশাস্ত্রবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল সুপারিশ করেছিলেন যে অনগ্রসর উপনিবেশে অবাধ নীতি সত্ত্বেও এই সব ব্যাপারে রাষ্ট্রের ভূমিকা ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক কর্মঠ হওয়া দরকার। অর্থাৎ উপনিবেশীকরণের জন্যই প্রয়োজন রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের বিস্তার।

এই সব ব্যাপারে উপনিবেশের কর নীতির সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য নীতির তফাৎ। অন্য অনেক ব্যাপারে ঐ নীতির প্রভাব স্পষ্ট। দুর্ভিক্ষ এসেছিল বারবার উনিশ শতকে, কিন্তু সরকার খাদ্যদ্রব্যের বাজারে হস্তক্ষেপ করেনি। বহির্বাণিজ্যে আমরা দেখেছি যে অবাধ বাণিজ্য নীতি যথাসম্ভব মানা হয়েছিল। শিল্পায়নে রাষ্ট্র কোন হস্তক্ষেপ করেনি বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে হেলাফেলা করে কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা আলফ্রেড চ্যাটারটন জাতীয় দু-একজন সাহেবের আনুকূল্যে হয়েছিল। এমনকি সেচ ব্যবস্থা, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপ্রধান দেশে, সেটাও তেমন গড়ে ওঠেনি। এতে যা সরকারি পয়সা ঢালা হবে তার ওপর প্রাপ্য সুদ জল কর হিসেবে ফেরৎ না পেলে, সরকার অনিচ্ছুক ছিল এতে হাত দিতে ; অর্থাৎ *ব্যবসায়িক লাভালাভ বিচার্য বিষয় ছিল, কৃষির বিকাশ নয়। এসবই সরকার অবাধ নীতির বাধ্য হওয়ার পরিণাম।*

সব শেষে বলা ভাল যে ওপরে যে বিবরণ দিলাম, অনেকের মনে হতে পারে যে বৃটিশ রাজ যে অনেক ভাল কাজ করেছে তা অনুল্লেখিত রইল। এটা সত্য যে ইংরাজ আমলের রেল, পথঘাট, সেতু, ট্রামরাস্তা থেকে শুরু করে বিমূর্ত্ত অনেক কৌশল ও ধারণা এখনও বৃটিশ রাজের স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে যেটা তাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় নয়। এটাও সত্য যে ব্যক্তিগত ভাবে অনেক ইংরাজ

শাসক, এমনকি হয়ত ব্যবসায়ীও, এদেশকে ভালবেসেছেন ও দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু আমরা ব্যক্তির বিশেষত্ব না দেখে একটা বন্দোবস্তের সমগ্রতা, 'বৃটিশ শাসনের সুফল ও কুফল' জাতীয় পাঠশালার প্রাবন্ধিকদের বিষয়টাকে পাশ কাটিয়ে একটা যুগের গতি-প্রকৃতি বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে উপনিবেশিত দেশের সরকারের চরিত্র, উপনিবেশীকরণে তার ভূমিকা, বোঝা যায়। এটা অনস্বীকার্য যে একাধিক রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষ কখনও ম্যাঞ্চেসটর কাপড়ের ওপর আমদানি শুল্ক রাখার যুক্তি দেখিয়েছেন, কখনও রেলপথের ওপর অযথা অর্থনাশের বিরুদ্ধতা করেছেন, অথবা কখনও বৈদেশিক খাতে খরচের (Home Charge) আধিক্যের বিরুদ্ধে আপীল করেছেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু এই সবের মানে কেবল এই নয় যে এই কয়েকজন ভাল মানুষ ছিলেন, তা হয়ত তারা ছিলেন, কিন্তু শাসনের যন্ত্রে এই ঘটনাগুলির অর্থ এই যে শাসনব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, প্রত্যেক স্তরে শাসনকর্তারা যে যার বিভাগের বা প্রদেশের বা দপ্তরে টাকাপয়সা বজায় রাখতে চাইছে এবং সম্ভব হলে বাড়াতে চাইছে। ভারতসচিব চান হয়ত বিদেশে খরচের খাতগুলি স্ফীত করতে, তবে ভারতের গভর্ণর জেনারেল চাইছেন সেটাকে সংকুচিত করতে ; গভর্ণর জেনারেল যদি চান শুল্ক কমাতে, অর্থমন্ত্রী চাইতে পারেন শুল্কের আয় বাড়াতে ; সমরবিভাগ চায় সামরিক খাতে খরচ হোক্, পূর্তবিভাগ চায় তার বদলে রাস্তা কিংবা সেতু তৈরি হোক্, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জাতীয় দ্বন্দ্ব এবং নানা স্বার্থের পক্ষে (ভারতের স্বার্থেও কখনও কখনও) ওকালতি শাসকমহলে দেখা যায়।

এই খেলার খেলুড়ে কেবল রাজপ্রতিনিধি আর আমলারা নয়, এতে ছিল (এবং এখনকার খেলাতেও আছে) বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী (interest group বা pressure group))। যেমন ধরা যাক্ ম্যান্‌চেসটরের ব্যবসা সমিতি (Chamber of Commerce), কলকাতার ইংরেজ পাটকল কয়লাখনি জাহাজ কোম্পানি ইত্যাদির মালিকদের প্রতিভূ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, চা বাগিচার মালিক সমিতি, ভারতীয় সুতাকল মালিকদের সমিতি, বোম্বাই মিলওনারস এসোসিয়েশন ইত্যাদি। এরা নিজেদের স্বার্থে সরকারি নীতি প্রভাবিত করার চেষ্টা করতো—গভর্ণরের কাছে আবেদন করে, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়ে, বিধান পরিষদে চেঁচামেচি করে (এই সব স্বার্থগোষ্ঠী পরিষদের সভ্য ছিল ১৯১৯ থেকে) এবং হয়তো ধনীদের ক্লাবে আমোদের মাঝে খোসামোদের রাস্তায় বড় আমলাদের প্রভাবিত করে। এই যে খেলা, তাতে ইংরেজ স্বার্থগোষ্ঠী, বিশেষতঃ খাস ইংলণ্ডের স্বার্থগোষ্ঠীগুলির সুবিধা ছিল বেশি কেননা তারা আরও সহজে আমলাদের ক্লাবে, বিধান পরিষদের কক্ষে, গভর্ণরের দরবারে এবং বিশেষ করে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের উচ্চতম মহলে পৌঁছতে পারতো ; নেটিভরা পারতো না ততটা সহজে। তাই এই খেলাটার ফলাফল বেশিরভাগ সময়ে ইংরেজ স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষে সুবিধাজনক হত, অর্থাৎ তারা যা

চাইত তাই অনেকসময় সরকারি নীতি হিসেবে গৃহীত হত। যেমন দেখেছি অর্থশাস্ত্রের কতকগুলি ধারণা ও বাঁধা বুলি প্রভাবশালী ছিল, তেমনই নানা স্বার্থগোষ্ঠীর এই খেলাটা নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৭

স্বাধীনতার দিকে

ইংরেজ সাম্রাজ্যের যে সূর্যাস্ত ঘটলো বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সেটাকে এখনকার পশ্চাৎ-দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ছকে ফেলার প্রলোভন কাটানো শক্ত। সেই প্রলোভন কাটিয়ে বোধহয় বলা দরকার যে ১৯৪৭ সালে ভারত শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর ঠিক যখন যেভাবে হয়েছিল সেটা অবশ্যম্ভাবী নয়। কিন্তু একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ ঘটনা নিয়তি-নির্দিষ্ট না হলেও, যে প্রক্রিয়ার সেটা অংশ তার সম্ভাব্য গতিপথ কোন দিকে আন্দাজ করা চলে। ঔপনিবেশিক আমলের শেষ দিকে যে প্রক্রিয়া বা ঘটনাপরম্পরা দেখা যায় তার অন্য কোন গতিপথ সম্ভাব্য মনে হয় না। এখানে রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের চৌহদ্দির বাইরে, দু-এক কথায় রাজনৈতিক মঞ্চের কম্পমান যবনিকার পেছনে অর্থনৈতিক দৃশ্যপটটির ওপর চোখ বোলান যেতে পারে।

আমরা এ পর্যন্ত যা দেখেছি তাতে বোধহয় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের (Colonial State) চরিত্র স্পষ্ট। প্রথমতঃ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এদেশে সমাজবহিঃস্থ। এই রাষ্ট্র আভ্যন্তর তাগিদে সৃষ্ট নয়, ঔপনিবেশিক সমাজের জৈব প্রজাত নয়, ভারতীয় নামক সৃজ্যমান জাতির ও দেশীয় সমাজের বহির্ভূত। এই রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের মূল উপনিবেশিত দেশের বাইরে, যদিও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দেশীয় শ্রেণীবিশেষের সঙ্গে আপোষ করে শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের পরিবর্তে বশ্যতা আদায় করতে অভ্যস্ত। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী রাজপুরুষ ও আমলাবর্গের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া প্রচ্ছন্ন, যেটা তাদের স্বদেশে অনেকাংশে প্রকাশ্য কেননা সেখানে সরকার নির্বাচকদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। উপনিবেশে আমলারা প্রজাতির মতামত সম্বন্ধে অবহিত হতে প্রস্তুত, কিন্তু মানতে বাধ্য নয়। এটা সত্য যে বৃটিশ রাজ মানে 'আইনের শাসন', কিন্তু শেষ কথা হল, আইন শাসকের। তৃতীয়তঃ, উপনিবেশিত এবং সাম্রাজ্যের মালিক দেশে, উভয় রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নানা স্বার্থগোষ্ঠী কার্যকারী, কিন্তু উপনিবেশিত দেশে শাসকজাতির স্বার্থগোষ্ঠীর অগ্রাধিকার কদাচিৎ অগ্রাহ্য হয়। তাদের আধিপত্য সমস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অন্তঃশীল।

এই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ধনতান্ত্রিক কেন্দ্রস্থলে ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী মন্দা এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিরাট পরিবর্তন আনল। সুতরাং হাওয়া পাল্টাল উপনিবেশিত দেশের অর্থনীতিতে।

এই শতাব্দীর সবচেয়ে নামজাদা অর্থনীতিবিদ্ জন মেইনার্ড কেইন্‌স্ ১৯১১ সালে লিখেছিলেন : ভারতে শিল্পায়ন "কাম্য নয়, এবং সম্ভাব্য নয়।" :

> শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা মনে হচ্ছে, জাতীয়তাবাদী নেশায়, তাদের দেশে শিল্পায়ন এবং যতটা সম্ভব কারখানার উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে চাইছে।...বিশ্বাস করা শক্ত যে ভারত এই অন্য পথে তার পুঁজি ও কৃষকশ্রেণীকে ঠেলে দিয়ে শিল্পদ্রব্য যা উৎপন্ন করবে, যে সাচ্ছল্য অর্জন করবে, তার চেয়ে বেশি সাচ্ছল্য অর্জন করবে না তার কাঁচামাল পাশ্চাত্যের শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে বিনিময়ের দ্বারা।...আমার মতে এই পরিবর্তন কাম্য নয়, এবং সম্ভাব্য নয়।

কিন্তু আমরা দেখেছি যে ইতিহাসের ধারা সম্পূর্ণ অন্যরকম।

শিবসুব্রহ্মনিয়ণের হিসেব অনুসারে মাত্র পঁচিশ বৎসরে ১৯২০-৪৫ সালে কারখানা শিল্প জনিত জাতীয় আয় মাত্র ৭৩ কোটি টাকা থেকে ২৭৫ কোটি টাকায় পৌঁছায় (এই হিসেব ১৯৩৮-৩৯ সালের মূল্যমানে ধ্রুবিত, যাকে বলে কনস্টান্ট প্রাইস হিসেব)। অর্থাৎ এই বৃদ্ধি সাড়ে তিনগুণের চেয়েও বেশি। ১৯২৫-৩০ সালের পাঁচসালা গড় উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে পাঁচ বৎসর পর ১৯৩৫-৩৬ সালে কারখানা শিল্পে উৎপাদন বেড়েছে ৩৩·২ শতাংশ, খনিজ উৎপাদন ৬ শতাংশ। আরও পাঁচ বৎসর পর : ১৯২৫-৩০ সালের গড়ের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে উৎপাদন বেড়েছে কারখানা শিল্পে ৮১·১ শতাংশ, খনিজ উৎপাদনে ২৩·৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে সাময়িক ধাক্কা খেলেও ১৯৩০-এর পর থেকে পাটশিল্প বাদে সমস্ত শিল্পে প্রসার সুতি কাপড়, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, লোহা ইস্পাত, দেশলাই, ইত্যাদি। আমরা আগের অধ্যায়টাতে দেখেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এই বৃদ্ধি কেমন অব্যাহত থাকে, এবং এই বৃদ্ধির বড় অংশ দিশি পুঁজির হাতে তৈরি। এর মানে অবশ্য এই নয় যে ভারত হঠাৎ শিল্পায়িত হল, কিন্তু এটা বৃটিশ শিল্প আধিপত্যের ওপর আসন্ন সূর্যাস্তের পূর্বগামী ছায়া।

আর একটা বড় অবস্থান্তর দেখা যায় ভারতের বহির্বাণিজ্যের ধারায়। ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের পুরোভাগে ছিল সুতি কারখানা। ইংলণ্ডের থেকে রপ্তানি সমস্ত সুতি কাপড়ের ২৩ শতাংশ যেত ভারতে ১৮৫০ সালে ; এই সংখ্যা বেড়ে ১৮৮০ সালে দাঁড়ায় ৪০ শতাংশ, ১৯১৩ সালে ৪২ শতাংশ। তার পর থেকে ভারতে সুতি কারখানার বিস্তারের দরুণ, আমরা দেখেছি, ইংলণ্ডের সুতি এদেশের বাজারে কোণঠাসা হয়ে ওঠে ক্রমে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় (১৯০০/০১—১৯০৪/৫ সালের গড়) যেখানে ইংলণ্ড থেকে আমদানি সুতি কাপড় ভারতে (বর্মা সহ) ছিল ২০৯ কোটি গজ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে সেটা নেমে আসে ২৮ কোটি গজের নিচে (১৯৩৫-৩৬—১৯৩৯-৪০ সালের গড়)।

সাধারণভাবে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ইংলণ্ডের প্রাধান্য কতটা ছিল উনিশ

শতকের শেষ ভাগে, ভাবা যায় না। যথা, ১৮৭৪-৭৯ সালে ভারতের গড় আমদানির ৮২ শতাংশ আসত ইংলণ্ড থেকে, ভারত থেকে রপ্তানির ৪১ শতাংশ যেত ইংলণ্ডে। ত্রিশ বৎসর পর ১৯০৪-০৯ সালে দেখা যায়, ইংলণ্ডের অংশ কমে দাঁড়িয়েছে আমদানির ৬৬ শতাংশ এবং রপ্তানির ২৬ শতাংশ। আরও ত্রিশ বৎসর পর ১৯৩৪-৩৭ সালে ঐ সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ৩৯ এবং ৩২ শতাংশ। বিশের দশক থেকে ইংলণ্ড থেকে ভারতে আমদানি কমতে শুরু করে দ্রুত গতিতে, কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধিটাও ইংলণ্ডের স্বার্থের উপযোগী ছিল : যেমন ধরা যাক্, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি সেখান থেকে আমদানির তুলনায় বেশি, ফলে ভারতের আয় ; ইংলণ্ডের রপ্তানি যুক্তরাষ্ট্রের কম যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানির তুলনায়—ইংলণ্ডের বাণিজ্যের এই অসাম্য পূরণ করতে ভারতের বিদেশী মুদ্রার আয় কাজে লাগত। ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দার ধাক্কা কাটাতে, এবং রাজস্ব বৃদ্ধির খাতিরে, ভারতে আমদানি শুল্ক বাড়ে, সুতরাং ভারতীয় শিল্পপতিরা সংরক্ষণের (protection) সুবিধা পায় ; অবশ্য একই সঙ্গে শুল্কনীতিতে সাম্রাজ্যের অগ্রাধিকার (Imperial Preference) ইংলণ্ড ও তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বাণিজ্যস্বার্থ অনেকটা সংরক্ষিত রাখে। ত্রিশের দশকে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ইংলণ্ডের হিস্যা আমদানিতে কমতেই থাকে আর রপ্তানিতে একটু বাড়ে। ফলতঃ দুই দেশের বাণিজ্য একটা তুল্যমূল্য অবস্থার কাছাকাছি এসে পড়ে। এই সময়ে ইংলণ্ডে ভারত সরকারের ঋণের অনেকটা পরিশোধ করা সম্ভব হয়। আগের এক পরিচ্ছেদে দেখেছি যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের সঙ্গে অর্থের লেনদেনের খাতায় ভারত উদ্বৃত্ত জমিয়ে তোলে—ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন ব্যয় ও ধার, যুদ্ধের বাজারে ভারতীয় রপ্তানির চড়া দাম, ইত্যাদি কারণে। এবং যুদ্ধের পরে ভারতের হাতে সব ঋণ মিটিয়ে মোটা রকমের স্টারলিং উদ্বৃত্ত। অর্থাৎ ভারত অধমর্ণ দেশ আর রইল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারতের কাছে ঋণ ইংলণ্ডের নানা দুর্গতির মধ্যে একটা মাত্র। ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধের খরচ অসহনীয় ভার হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং আমেরিকার সাহায্য বিনা লড়াই চালানো, এবং তার পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, দুটোই অসম্ভব ছিল বলা চলে। ১৯৩০-এর দশকে শুল্কের ব্যাপারে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির অগ্রাধিকার (Imperial Preference) নীতি, অর্থাৎ ঐ সব দেশগুলিকে পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে শুল্ক হ্রাস করার নীতি, ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের যেটুকু সুবিধা এনে দিয়েছিল মহাযুদ্ধের উত্তাপে সেটাও উবে গেল। একই সঙ্গে উপনিবেশিত দেশগুলিতে, বিশেষতঃ ভারতে, দিশি পুঁজি ও শিল্পের প্রসার দেখা যায়, যেটা ইংরেজ শিল্পস্বার্থের অনুকূল নয়। আসলে মহাযুদ্ধ কেবল অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির লড়াই নয়, তারই মধ্যে আপাতঃমিত্রতায় আবদ্ধ বৃহৎ শক্তিদের মধ্যেও আধিপত্যের লড়াই। মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যাপী পুঁজি-ব্যবস্থায় ডলারের আধিপত্য কায়েম হল, ইংরেজদের স্টার্লিং তার ছোট গোছের অংশীদার। ইংলণ্ডের পক্ষে এটাও হল মন্দের ভাল, কেননা যুদ্ধের

সময়ে স্টর্লিং এলাকার অবস্থা যেমন সঙ্গীন হয়েছিল, সাম্রাজ্যের অগ্রাধিকার নীতির ওপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেমন চাপ দিয়েছিল, এবং মিত্রশক্তির মৌখিক সাম্রাজ্যবিরোধিতা যেমন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল—তার তুলনায় ইংলণ্ড যুদ্ধের পর সহজেই পার পেয়ে গেল মনে হয়। এটা সম্ভব হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রুশ-আমেরিকান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের নতুন পরিবেশে, যেখানে আমেরিকার দরকার ইংলণ্ডকে মিত্র হিসেবে।

এখন ফেরা যাক প্রজাজাতির রাজনীতির দিকে। এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম যে খাস ঔপনিবেশিক আমলে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে, অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের রাজনীতি মূলতঃ স্বার্থগোষ্ঠীদের খেলা। এবং খেলাটা একপেশে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রজা জাতির হার। খাস ঔপনিবেশিক আমলের এই ছবিটা বদলাতে শুরু করে ১৯২০-এর দশক থেকে। এই বদলের একটা কারণ ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে ইংরেজ স্বার্থ ক্রমান্বয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করল, পুরানো স্বার্থগোষ্ঠীর জায়গায় নতুন গোষ্ঠী তাদের স্বার্থের আধিপত্য কায়েম করতে সচেষ্ট হল, আর একটা কারণ হল পুরানো খেলার নিয়ম পাল্টাতে লাগল—মহাত্মা গান্ধীর হাতে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন, এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিশেষ করে ১৯১৯-২১ এবং ১৯৩০-৩১ সালে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐ আন্দোলনে সামিল হওয়ার প্রবণতা, একটা নতুন পর্যায়ের সূচনা করে যেখানে বণিক সমিতি আর জমিদার সভা জাতীয় স্বার্থগোষ্ঠীর পিটিশন, মেমোরান্‌ডাম, লাট সাহেবের কাছে দরবারের প্রাক্-রাজনৈতিক কলাকৌশল প্রায় বাতিল হওয়ার পথে। ১৯১৯ এবং ১৯৩৬ সালের ভারত শাসন আইন, ক্রমান্বয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্ব নীতির স্বীকৃতি (যদিও নির্বাচক সংখ্যায় কম এবং বিধান পরিষদের কর্মদক্ষতা সীমাবদ্ধ), ভারতসচিবের ভেটো (Veto) ক্ষমতার অধীনে ভারত সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্য, (Fiscal Autonomy Convention, 1919), ১৯৩০-এর দশক থেকে ম্যান্‌চেসটরের চেঁচামেচি সত্ত্বেও অবাধ বানিজ্যনীতি থেকে পশ্চাদ্‌পসরণ (অবশ্য তেতো বড়িটার সঙ্গে ইম্পিরিয়ল প্রেফারেন্স ছিল মধু অনুপান)—ইত্যাদি নতুন এক পর্যায়ের সূচনা করে।

ভারতীয় পুঁজিপতি স্বার্থের প্রয়োজন এই নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের কাজ গুছোনো। স্বার্থগোষ্ঠীর সীমিত অরাজনৈতিক কলাকৌশলের দ্বারা পুঁজিপতিরা যা পায়নি, জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের চাপে বৃটিশ সরকার সেসব কিছু কিছু তাদের দিতে পারে এখন, এটা সত্য। কিন্তু অপর দিকে কংগ্রেসের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করাটা কি ভাল হবে, সরকারকে চটিয়ে দিয়ে আখেরে পস্তাতে হবে না তো? দ্বিতীয়তঃ, জনতার সমর্থনে বলশালী রাজনৈতিক নেতাদের তুলনায় বণিকসমিতির নেতারা কি মিলমালিকেরা রাজনৈতিক ক্ষমতার হিসেবে নগণ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে, জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা কি ভাবে পুঁজিপতিদের সঙ্গে কায়েম করা যায়? তৃতীয়তঃ, যখন জনগণ বিরাট আকারের আন্দোলনের সামিল হয়, তখন

সাধারণ লোকদের, বিশেষ করে মজুর শ্রেণীর লোকদের, মানসিকতায় যে রাজনৈতিক বীজ উপ্ত হয় সেটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের পথে যাতে না যায় তা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় ? এই সব সমস্যা থাকায় রাজনৈতিক হাওয়া বদল ১৯৪৭-এর আগের দুই দশককে পুঁজি স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক সময়, আবার নতুন সুযোগেরও সময়। এর মানে অবশ্য এই নয় যে দিশি ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী বোধ ছিল না, অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যে অনেকে তাদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তবে এখানে আমাদের আলোচ্য সামগ্রিকভাবে এই শ্রেণীর স্বার্থজনিত কৌশল। এই কৌশলের একটা অঙ্গ হল দিশি ব্যবসায়ী শ্রেণীর নানা আঞ্চলিক সমিতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা জাতীয় সমিতি গঠন : ১৯২৩ সাল থেকে ব্যক্তিগত চিঠির আদান-প্রদানের মাধ্যমে কলকাতার ঘনশ্যাম দাস বিড়লা এবং বোম্বাইয়ের স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস এমন একটা জাতীয় সমিতির কথা অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকেন, কেননা বিড়লার ভাষায়, ইংরেজ ব্যবসায়ী সংঘবদ্ধতার বিরুদ্ধে "ভারতীয়দের অনুরূপ সংঘবদ্ধতা না আনলে ভারতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।" এই প্রচেষ্টার ফল ভারতীয় বণিকস্বার্থের প্রতিভূ রূপে ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বর্‌স্ অফ কমার্স এন্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠা ১৯২৭ সালে। একদিকে কংগ্রেস ও অপরদিকে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে এই সর্বভারতীয় সমিতি যেমন কাজে লাগে, তেমনই আবার সমিতির সভ্য বিড়লা কিংবা লাল শ্রীরাম কিংবা সরাভাইদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ কংগ্রেস নেতা এবং সরকারি আমলাবর্গের সঙ্গে।

জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ পুঁজিপতি স্বার্থের বিরোধী নয়—প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের থেকেই দিশি পুঁজির বিকাশ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের কর্মসূচী—কিন্তু তারা নিছক ঐ স্বার্থের যন্ত্র মাত্র, পুঁজিপতি যন্ত্রী, এমন ভাবা বোধহয় ভুল হবে। তেমন প্রতীয়মান হলে পরে জনসমর্থন রাখা শক্ত হত—এবং বৃটিশ শাসকের সামনে জনপ্রতিভূ হিসেবে দাঁড়ান যেত না। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীস্বার্থজনিত সংঘর্ষ অপ্রধান করে রেখে, শ্রেণীনির্বিশেষে সমগ্র উপনিবেশিত জাতি বনাম শাসকজাতির স্বার্থ সংঘর্ষকে প্রাধান্য দেওয়া। এই তাদের রণকৌশল ও কার্যধারা, যদিও সকলেই জানে যে এই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন যাদের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্যের চেতনা ছিল না এমন নয়।

ফলতঃ, ঔপনিবেশিক আমলে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতির পর্যায়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল ঔপনিবেশিক শ্রেণীবিন্যাসের সমঞ্জস রাজনৈতিক সমন্বয়। ১৯৬৪ সালে কালেশ্‌কি যে 'সিনারিও' দিয়েছিলেন এই শ্রেণী সমন্বয়ের ছবিটা তার সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। আমরা দেখেছি কিভাবে ঔপনিবেশিকতার আওতায় কৃষির বাজার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবৈষম্য বাড়ছিল—মহাজনি, কৃষিপণ্য বাজারজাত করার কারবার, এবং জমির মালিকানার দৌলতে এক দিকে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামীণ শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি, অপর দিকে বিরাট সংখ্যক চাষীর আর্থিক

অবনতি (স্বত্বসম্পন্ন চাষী থেকে উঠবন্দী বা স্বত্বহীন চাষী, তাই থেকে ভাগচাষী, তাই থেকে মজুর, ইত্যাদি)। এই যে নবোদ্ভূত গ্রামীণ বর্ধিষ্ণু শ্রেণী—যাদের গ্রাম সমাজে যৌথ আধিপত্য কিছুটা প্রাক্-ঔপনিবেশিক জাতি ও অবস্থা বৈষম্যের জন্যও বটে—তাদের সঙ্গে সমঝোতা রাজনৈতিকদের পক্ষে জরুরি হয়ে দাঁড়াল। সমান জরুরি দিশি পুঁজির অগ্রগামী ভূমিকাকে মেনে নেওয়া। দিশি পুঁজি এবং গ্রামীণ বর্ধিষ্ণু শ্রেণী অংশীদারীতে যে আধিপত্য কায়েম করল, শহুরে বিদ্যাজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার ছোট তরফের অংশীদার। এই রাজনৈতিক সমন্বয় স্বাধীনতার পর নতুন রাজনৈতিক খেলা কি নিয়মে খেলতে শুরু করে তা আমাদের আলোচনার বাইরে।

এই সব মিলিয়ে পালা বদল। ভারত স্বাধীনতার দিকে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলের দেশীয় চেতনায়, যতই অস্পষ্ট বা সীমিত হোক্ না কেন, অন্য একটা বোধ, আরও একটা উদ্দিষ্ট ছিল। "তোমা হইতে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে ?...বল দেখি চশমা-নাকে বাবু ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে ?" প্রায় একশ বৎসর আগেকার এই বঙ্কিম উক্তি মনে করিয়ে দেয় সেই অপর উদ্দিষ্ট, সেই অপূর্ণ প্রত্যাশা। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে ১৯৪৭ একটা অসমাপ্ত বাক্যে একটা যতিচিহ্ন মাত্র। এখনও সামনে অসমাপ্ত সংগ্রাম।

সারণি সূচী

(নীচে প্রতি সারণি-সংখ্যায় দশমিক বিন্দুর আগের ও পরের সংখ্যা যথাক্রমে অধ্যায় সংখ্যা, ও অধ্যায়ের মধ্যে অনুক্রম নির্দেশ করে)

গ্রন্থনির্দেশ

অনেক লেখকের নাম একত্র করে বিরাট গ্রন্থতালিকা রচনা ভয়াবহ রকমের সহজ। এই গ্রন্থনির্দেশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কেবল মাত্র (১) এই বইটিতে ব্যবহৃত বা উদ্ধৃত গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র, (২) এমন বই যা এই বইটির পাঠকের কাজে লাগতে পারে। প্রাথমিক আকর জাতীয় গ্রন্থ এখানে নিষ্প্রয়োজন ; তেমন তালিকা যারা অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবে না তাদের কাছে বাহুল্য, আর যারা করবে তাদের কাছে অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। বিস্তারিত আকর নির্দেশের জন্য ব্যবহার করা উচিৎ এই বিষয়ে :

Maureen Patterson .*South Asian Civilizations: a bibliographic synthesis* (Chicago, 1981)), pp. 287—672; Gokhale Institute of Politics and Economics *Annotated bibliography on the economic history of India,1500—1947 A. D.*(Poona, 1977), vols. I—IV.

যেহেতু এই বইটিতে পাদটীকা ব্যবহার করিনি, এখানে গ্রন্থনির্দেশ প্রতি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের অনুক্রম ও উদ্ধৃতির অনুক্রম অনুসরণ করেছে এবং প্রতি অধ্যায়ের বিভিন্ন ভাগ অনুসারে এই তালিকা বিভক্ত হয়েছে। পুনরুক্তি বাঁচানোর জন্য এই সংকেতগুলি ব্যবহৃত হয়েছে :

op. cit. = উল্লিখিত বা পূর্বলিখিত পুস্তক

vide = দ্রষ্টব্য

IESHR = *Indian Economic and Social History Review*

IHR = *Indian Historical Review*

Ec. H. R. *Economic History Review*

J. Ec. H = *Journal of Economic History*

অধ্যায় ১

★ প্রথম ভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কালান্তর' ('রচনাবলী', ২৪ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭ ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' ('বঙ্গদর্শন' ১২৮৭, 'রচনাবলী', সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৩৬), এবং 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (উল্লিখিত, ১২৮১, 'রচনাবলী', খণ্ড ২, পৃঃ ৩৩০—৩২) ; রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ('রচনাবলী', খণ্ড ৪, পৃঃ ৩৭৯—৮০), 'দেশের কথা' (উল্লিখিত, খণ্ড ১০, পৃঃ ৬১৯) ; কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২) ; বঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্গদেশের কৃষক' (উল্লিখিত 'রচনাবলী', খণ্ড ২, পৃঃ ২৮৮) ; রবীন্দ্রনাথ, 'কালান্তর' ('রচনাবলী', খণ্ড ২৪, পৃঃ ২৭১) ; জনসংখ্যার

৩ ইংলণ্ডের জাতীয় আয় (১৯০০ সালের মূল্যমানে ধ্রুবিত) ইত্যাদির হিসেবের আকর :

P. and L. Visaria in Dharma Kumar (Ed.) Cambridge Economic History of India(Cambridge, 1983), chapter V (hereafter cited as CEHI); B.R. Mitchell and P. Deane *Abstract of British Historical Statistics* (Cambridge, 1962) p. 367; P. Deane and W.A. Cole *British Economic Growth* (Cambridge, 1967) p. 332.

* দ্বিতীয় ভাগ

J.A.. Hobson *Imperialism* (London, 1938); E.J Hobsbawm *Industry and Empire* (Harmondsworth, 1968); Michael Barratt Brown *Economics of Imperialism* (Harmondsworth, 1976); D.K. Fieldhouse *Theory of Capitalist Imperialism* (London, 1967); P.J. Cain and A.G. Hopkins 'Gentlemanly capitalism and British expansion overseas, 1850-1945' *Ec. H.R.*, Cambridge, vol. 40 no. 1, 1987.

R.C. Dutt *Economic Hisotry of India in the Victorian Age* (London, 1903); Dadabhai Naoroji *Poverty and Un-British Rule in India* (1901); M.G. Ranade *Essays on Indian Economics* (Madras, 1916); Bipin Chandra *Rise and Growth of Economic Nationalism in India, 1880-1905* (Delhi, 1966); R. Guha (ed.) *Subaltern Sutudies* (Delhi, 1982), Vol. I.

* তৃতীয় ভাগ

Vera Anstey *Economic Development of India* (London, 1929, 1957); T. Morrison *The Economic Transition in India* (London, 1911); A.K. Cairncross *Home and Foreign Investments 1870-1913* (Cambridge, 1953); M. Simon and H. Segal 'British Protfolio foreign investment, 1869-1894' in A.R. Hall (ed) *The export of capital from Britain 1870-1914* (London, 1968); J.H. Boeke *Economics and economic policies in Dual Societies* (Haarlem, 1953); Arthur Lewis *The evolution of the industrial economic order* (Princeton, 1978); Karl Marx and F. Engels *Selected Works* (Moscow, 1955), Vol. I, pp. 345-58; J. Gallagher and R.E. Robinson *Africa and the Victorians* (London, 1961); J. Gallagher 'The Imperialism of Free Trade' *Ec. H.R.*, N.S., VI, I; J.A. Schumpeter *Sociology of Imperialism* (New York, 1955); D.C.M. Platt *Finance, Trade and Politics in British Foreign Policy, 1815-1914* (Oxford, 1968); Pamela Nightingale *Trade and empire in western Indi 784-1806* (Cambridge, 1970); P.J. Cain and A.G. Hopkins *op. cit. Ec. H.R.*, 1987.

অধ্যায় ২

* প্রথম ভাগ

Kingsley Davis *Population of India and Pakistan* (Princeton, 1951); L. and P. Visaria and D. Kumar *Cambridge Economic History of India,* II, (Cambridge, 1983), p. 502, 497, 505; Ira

Klein 'Death in India, 1871-1921' *Journal of Asian Studies*, vol. 22, Aug. 1973; P. Bardhan 'On a life and death question' *Economic & Political Weekly*, Special Number, August 1974; B.D. Miller *The endangered sex; neglect of female children in rural north India* (Ithaca, 1981); Daniel and Alice Thorner *Land and Labour in India* (Bombay, 1962); J Krishnamurthy in *CEHI, II, p.535;* Asok Mitra, *Calcutta, India's City* (Calcutta, 1963). Alice Clerk 'Limitations on female life chances' *IESHR*, 20, 1, 1983.

* দ্বিতীয় ভাগ

M. Mukherjee 'National Income' in V.B. Singh (ed.) *Economic History of India, 1857-1956* (Bombay, 1965) pp. 661-703; and *National Income of India* (Calcutta, 1969); V.K.R.V. Rao *An essay on India's national income* 1924-29 (London, 1939), pp. 10-36; S. Sivasubramanian 'National income of India, 1900-01 to 1946-47' Ph. D thesis, Delhi University, 1965, and 'Income from the secondary sector in India, 1900-47', *IESHR*, vol. 14, no. 4, 1977; also vide 'Gross value of output of agriculture for undivided India, 1900-01 to 1946-47' in V.K.R.V. Rao (ed) *Papers on national income and allied topics*, vol. I (Bombay, 1060); Nirmal Kumar Chandra 'Long-term stagnation in the Indian economy, 1900-75', *Economic & Political Weekly*, vol. 22, Annual Number, 1982; Omkar Goswami 'National income trends, 1900-1947 (in India)' (Rutgers University. mimeo, 1987; A.. Heston in *Cambridge economic history of India*, vol. II (Cambridge 1983), hereafter *CEHI*.

অধ্যায় ৩

* প্রথম ভাগ

B.H. Baden-Powell *The land systems of British India* (Oxford, 1892); E. Stokes, B. Chaudhuri, H. Fukazawa, D. Kumar in Chapter II, *CEHI*, vol. II (Cambridge, 1983); N.K. Sinha *Economic History of Bengal*, II; B.B. Chaudhuri 'The land market in eastern India', *IESHR*, No. 1 and 2, 1975, and 'Process of de-peasantization in Bengal and Bihar' *I.H.R.*, no. 1, 1975; Sirajul Islam *The permanent settlement in Bengal: a study of its operation 1790-1819* (Dacca, 1979.

* দ্বিতীয় ভাগ

Ranajit Guha *A rule of property for Bengal* (Paris, 1963); Eric Stokes *The English Utilitarians and India (Oxford, 1959)* W.J. Barber *British economic thought and India 1600-1858)* (Oxford, 1975); S. Ambirajan *classical political economy and British policy in India* (Cambridge, 1978); Sir Francis Floud, Chairman *Report of Land Revenue Commission*, Bengal, 1938 (Calcutta, 1940-41); B.B. Chaudhuri, chapter III, *CEHI*, vol. II.

* তৃতীয় ভাগ

Nilmoni Mukherjee *The Ryotwary system in Madras, 1792-1827* (Calcutta, 1962); Sarada Raju *The economic condition of Madras Presidency, 1800-1850* (Madras, 1941); R.E. Frykenberg (ed) *Land control and social structure in Indian history* (Madison, 1969); B.H.. Baden-Powell *op. cit.*, vol. I; R. Kumar *Western India in the 19th century* (London, 1968); Ratnalekha Ray *Change in Bengal agrarian society 1760-1850* (Delhi, 1979); W.C. Neale *Econ omic change in rural India: land tenure and reform in Uttar Pradesh, 1800-1955* (New Haven, 1962); Sumit Guha 'Land market in upland Maharashtra, 1820-1960' *IESHR, 24, no. 2-3.*

* চতুর্থ ভাগ

R.C. Dutt The peasantry of Bengal (Calcutta, 1874); J.N. Gupta *Life and work of Romesh Chunder Dutt CIE* (London, 1911); Sabyasachi Bhattcharya 'Permanent Settlement redivivus' *Bengal Past and Present*, vol. 85, 1966, pp. 159-82; Bipin Chandra *The rise and growth of economic nationalism in India* (Delhi, 1966).

অধ্যায় ৪

* প্রথম ভাগ

Irfan Habib *The Agrarian System of Mughal India* (Bombay, 1963) and ch. VIII in *CEHI*, vol. I; Daniel Thorner *Investment in empire, 1925-49* (Philadelphia, 1950); J. Hurd 'Railways and the expansion of markets in India' *Explorations in Economic History*, 12, 3, 1975 ch. VIII in *CEHI*, vol. II. pp. 757-60; B.B. Chaudhuri *Growth of commercial agriculture in Bengal, 1757-1900* (Calcutta, 1964); D.R. Gadgil *Industrial Evolution of India in recent times* (Bombay, 1942) ch. II; Saugata P. Mukherjee 'Some aspects of commercialisation of agriculture in eastern India in B. De (ed.) *Perspectives in Social Sciences*, vol. II, and 'Imperialism in action through mercantilist function' Anon, (ed) *Essays in Honour of Prof. S.C. Sarkar* (Delhi, 1975); George Blyn *Agricultural trends in India, 1891-1946* (PHiladelphia, 1966).

* দ্বিতীয় ভাগ

D.R. Gadgil *Op. cit.*; Ravinder Kumar *Op. cit.*; Neil Charlesworth *Peasants and imperial rule: agriculture and agrarian society in Bombay Presidency* (Cambridge, 1985); Sumit Guha *The agrarian economy of the Bombay Deccan, 1818-1941* (Delhi, 1985); Amit Bhaduri 'A study of agricultural backwardness under semi-feudalism' *Economic Journal*, March 1973; Krishna Bharadwaj in K.N. Raj *et. al.* (eds.) *Essays on commercialisation of Indian agriculture* (Delhi, 1985); I. J. Catanach *Rural credit in western India, 1875-1930* (Berkeley, 1970); D. Narain *Impact of price movements on*

areas under selected crops in India, 1900-39 (London,. 1965); S.C. Mishra 'Commercialisation, peasant differentiation and merchant capital inlate 19th century Bombay and Punjab' *Journal of Peasant Studies*, 10,1,1982.

* তৃতীয় ভাগ

S.J. Patel *Agricultural labour in modern India and Pakistan* (Bombay, 1952); Dharma Kumar *Land and caste in South India* (Cambridge, 1965); Amit Bhaduri 'Evolution of land relations in eastern India under British rule' *IESHR*, March 1976; Neeladri Bhattacharya 'Agricultural labour and production: central and south-eastern Punjab, 1870-1940' in K.N. Raj (ed) *op. cit.*;; Utsa Patnaik 'Empirical identification of peasant classes revisited' *Economic and Political Weekly* March 1, 1980, pp. 483-88; P. Chattopadhyay, 'Mode of production in Indian agriculture' *ibid*, 28 June 1980, pp. 85-88; Satyabrata Sen 'Agricultural labourers in relation to other peasants' *Enquiry*, no. 1; S.C. Gupta *Agrarian relations and early British rule in India* (Bombay, 1963); Andre Gunder Frank *op. cit.;* I. Wallerstein 'The incorporation of the Indian subcontinent into the capitalist world-economy' in S. Chandra (ed.) *The Indian Ocean* (Delhi, 1987); T.C.A. Raghavan, P. Mohapatro, Shri Prakash, N. Bhattacharya, in *Studies in History*, new series I, 2; Sumit Guha *The agrarian economy of Bombay Deccan 1818-1941* (Delhi, 1985); A. Mody 'Population Growth and commercialisation of agriculture, 1890-1940' *IESHR*, 19 3—4, 1982; S.C. Mishra *op. cit.;* C.J. Baker *An Indian rural economy, 1880-1955; the Tamilnad countryside* (Delhi, 1984); Arvind N. Das, Shahid Amin in Ranajit Guha *Subaltern Studies II* (Delhi, 1982); M.H. Siddiqi *Arrarian unrest in north India: the United Provinces, 1918-22* (Delhi, 1978); A.A. Abdullah *Landlord and rich peasant under the Parmanent Settlement* (Dhaka, 1980); M.M. Islam 'Some aspects of the problem of sub-*infedutation* in undivided Bengal' *IESHR*, 20, 2, 1983; Asok Sen, Partha Chatterjee & Saugata Mukherjee *Perspectives in Social Sciences, II: three studies on the agrarian sturucture. in Bengal, 1850-1947* (Calcutta, 1982); D. Rothermund *Government, landlord and peasant in India: agrarian relations under British rule, 1865-1935* (Weisbaden 1978).

অধ্যায় ৫

* প্রথম ভাগ

Sir J. Woodnead, Chairman, *Report of the Famine Inquiry Commission* (Delhi, 1945); Sir Francis Floud *Report of Land Revenue Commission (Bengal)* (Calcutta, 1940; A.K. Sen *Poverty and Famines* (Oxford, 1981) p. 45, 57, 75,; Paul R. Greenough *Prosperity and misery in Modern Bengal: the famine of 1943-44 (New York, 1982).*

* দ্বিতীয় ভাগ

L. and P. Visaria, CEHI, vol. II; B.M. Bhatia *Famine in Imdia* (Bombay, 1967); Shivasubramanian, *op. cit.;* A. H. Eston, *CEHI*, vol. II; N.K. Chandra, *op. cit.;* Col. Baird Smith, *Report on the N.W.P. Famine of 1860-61* (Calcutta, 1861); J.C. Geddes *Administrative experience of former famines* (Calcutta, 1874); T. Das *Bengal Famine 1943* (Calcutta, 1949); H.S. Srivastava *The history of famines 1858-1918* (Agra, 1968).

* তৃতীয় ভাগ

R.C. Dutt *Open letters to Lord Curzon on assessment in India* (London, 1900); L. Fraser *India under Curzon and after* (London, 1911); Michelle B. McAlpin *Subject to famine: food crises and economic change in western India, 1860-1920* (Princeton, 1983); Sumit guha, review of above in *IESHR*, 23, 2, 1986; Ira *Kelin* 'When the rains failed', *IESHR*, 21, 2, 1984; David Arnold in R. Guha (ed.) *Subaltern Studies, III (Delhi, 1984).*

অধ্যায় ৬

* প্রথম ভাগ

M.M. Malaviya 'Note of dissent' *Report of Indian Industrial Commission*, (1918); R.C. Dutt *Economic History of India, vol.II* (London, 1904); Dr. Gadgil *op. cit.*; N.K. Sinha *Economic History of Bengal*, (Calcutta, 1965) vol.I; T.S. Raju *Economic conditions of the Madras Presidency, 1800-50* (Madras, 1941); A.V. Raman Rao *Economic Development of Andhra Pradesh, 1766-1957* (Bombay, 1958); R.D. Choksey *Economic life in the Bombay Karnatak, 1819-1939* (Bombay, 1968), and *Economic life in the Bombay Deccan 1818-1938* (Bombay, 1955); H.R. Ghoshal *Economic Transition in the Bengal Presidency 1793-1833* (Patna, 1950); A.K. Bagchi 'De-industrialisation of Gangetic Bihar, 1809-1901' in Anon. (ed.) *Essays in Honour of Prof. S.C. Sarkar* (Delhi, 1976).

* দ্বিতীয় ভাগ

Daniel & Alice Thorner *Land and labour in India* (Bombay, 1962); Raghabendra Chattopadhyay 'De-industrialization in India reconsidered' *Economic & Political Weekly*, 10, 12, 1975; J. Krishnamurty 'Changes in the composition of the working force in manufacture, 1901-51', *IESHR*, 4, 1, 1967, and 'Occupational structure' in *CEHI*, vol.II (1983).

* তৃতীয় ভাগ

M.D. Morris, T. Matsui, T. Ray Chaudhuri, etc. in *IESHR*, 5, 1968, pp.1-100; A.I. Levkovsky *Capitalism in India: basic trends in its development* (Delhi, 1966) chapter 5; *Indian Industrial Commission Report* (1918), Chairman T.H. Holland.

* চতুর্থ ভাগ

J.M. Keynes, Review of T. Morrison's *Economic Transition in India*, in *Economic Journal*, 21, 1911, p.426; Irfan Habib 'Potentialaities of capitalistic development in the economy of Mughal India' *Enquiry*, winter, 1971; A.I. Chicherov *India: economic development in the 16th-18th centuries* (Moscow, 1971); D.H. Buchanan *The development of capitalistic enterprise in India* (London, 1966 reprint) pp.110, 145 *et seq.*

অধ্যায় ৭

* প্রথম ভাগ

M. Simon in A.R. Hall *op. cit.*, L.H. Jenks *The Migration of British capital to 1875* (New York, 1927); George Paish in *Journal of Royal Statistical Society*, 1910-11, pp.167-87; Arun Bose 'Foreign capital' in V.B. Singh (ed) *Economic History of India, 1857-1956* (Bombay, 1965); V.K.R.V. Rao 'India's balance of trade', *Economic Journal*, March 1933, pp.167-72; M. Kidron *Foreign investments in India* (London, 1965).

* দ্বিতীয় ভাগ

Amartya K. Sen 'Commodity pattern of British enterprise in early Indian industrialisation 1854-1914' in *International conference of economic history*, 2nd, Aixen Provence, 1962 (Paris, 1965) vol.II; A. Tripathi *op. cit.*; A.K. Bagchi *op. cit.* and 'Reflections on patterns of regional growth in India under British rule' *Bengal Past and Present*, Jan-June 1976; A.D.D. Gordon *Op. Cit.*

* তৃতীয় ভাগ

J.K. Boeke *op. cit.*; A. Lewis *op. cit.*; A.K. Banerjee *India's balance of payments, 1921-22 to 1938-39* (Bombay, 1963); A Gunder Frank *Capitalism and Underdevelopment in Latin America* (Harmondsworth, 1971), and 'The development of underdevelopment' *Monthly Review*, Sept. 1966; A.I. Levkovsky *op. cit.*; Claude Markovits *Indian business & nationalist politics, 1931-34* (Cambridge, 1985) Basudev Chatterjee 'Business and politics in the 1930's '*Modern Asian Studies*, 15, 1981, pp.527-73; B.R. Tomlinson 'India and the British empire, 1880-1935 *IESHR*, 12, 1976, pp.337-80, *The political economy of the Raj, 1914-47: the economics of decolonization in India* (1979), and 'Colonial firms and the decline of colonialism in eastern India, 1914-47' *M.A.S.* 15, 3, 1981, pp.455-486; Omkar Goswami 'Collaborators and conflict: European and Indian capitalist and the jute economy of Bengal, 1919-39', *IESHR*, 19, 2, 1982.

অধ্যায় ৮

* প্রথম ভাগ

D.R. Gadgil *Origins of modern Indian business class: an interim report* (New York, 1959); Rajat K. Ray, R. Mahadevan, Ashin Dasgupta *et al.* in D. Tripathi (ed) *Business communities of India: a historical perspective* (Delhi, 1985); A.K. Bagchi 'Merchants and colonialism' in D.N. Panigrahi (ed.) *Economy, society and politics in modern India* (Delhi, 1985); V.I. Pavlov *The Indian capitalist class* (Delhi, 1964).

* দ্বিতীয় ভাগ

N.K. Sinha *Economic History of Bengal*, vol.I, (Calcutta, 1965); H.R. Ghoshal *op. cit.*; Gautam Bhadra 'Some socio-economic aspects of the town of Murshidabad, 1765-1793' M. Phil. thesis, J.N.U., 1973; D.B. Mitra *Cotton weavers of Bengal, 1757-1833* (Calcutta, 1978); C. Bayly *Rulers, townsmen and bazaars N. Indian society in the age of British expansion, 1770-1870* (Cambridge, 1983); Amales Tripathi *Trade and Finance in Bengal Presidency 1793-1833* (Calcutta, 1956); N.K. Sinha op cit.; (Calcutta, 1970); Christine Dobbin *Urban leadership in western India 1840-85* (London, 1972); V.I. Pavlov, D.R. Gadgil *op. cit.*; Everett Hagen *On the theory of social change* (Homewood, 1962); R. Kennedy, 'The protestant ethic and the Parsis' *American Journal of Sociology*, 57, July 1962; Max Weber *Protestant ethic and the spirit of capitalism* (New York, 1948). *The religion of India* (New York, 1958); H. Spodek 'Mancherisation of Ahmedabad' *Economic Weekly*, 17, 13 March 1965, and 'Traditional culture and entrepreneurship' *EPW*, Feb. 1969; Sirajul Islam *op. cit.*

* তৃতীয় ভাগ

A.I. Levkovsky *op. cit.*; F.R. Harris *J.N. Tata* (Bombay, 1938); S.D. Mehta *Cotton mills of India 1854-1954* (Bombay, 1954); H.A. Antrobus *History of the Assam Company 1839-1953* (Edinburgh, 1957); Sir P. Griffiths *History of the Indian tea industry* (London, 1967); R.S. Rungta *Rise of business corporations in India, 1851-1900* (Cambridge, 1970); Arun Bose, *op. cit.*; I.G. Patel, Chairman, *Report of Managing Agency Enquiry Committee (Delhi, 1969)*

* চতুর্থ ভাগ

A.D.D. Gordon *Businessmen and politics in Bombay* (Delhi, 1978); Stanley Kochanek *Business and politics in India* (Bombay, 1975); A.K. Bagchi *Private Investment in India 1900-39 (Cambridge, 1972); Tom A. Timberg The Marwaris: from traders to industrialists* (Delhi, 1977); F.R. Harris *op. cit.*; G. Piramal & M. Herdeck *India's industrialists* vol. I (Washington, 1986); S.M. Edwardes *Memoirs of Rao Bahadur*

Ranchodlal Chhotalal (Exeter, 1920); Shoji Ito 'Note on the business combine in India' *The Developing Economies, IV, 3, 1966 (Tokyo).*

অধ্যায় ৯

* প্রথম ভাগ

S. Sivasubramanian 'Income from the Secondary Sector, 1900-47' IESHR, 14.4.1977; N.K. Chandra 'Long term stagnation in the Indian economy, 1900-75' *Economic & Political Weekly*, vol.22, Annual Number, 1982, Table 3.

* দ্বিতীয় ভাগ

S.D. Mehta *The cotton mills of India, 1854-1954* (Bombay, 1954); M.D. Morris *The emergence of an industrial labour force in India* (Berkeley, 1954); A. Redford *Manchester merchants and foreign trade* (Manchester, 1956) vol.II; S.B. Saul *Studies in British Overseas trade, 1870-1914* (Liverpool, 1960); D.H. Buchanan *op. cit.*; A.K. Bagchi *op. cit.* (1972).

* তৃতীয় ভাগ

A. Gunder Frank *op. cit.* (1967); Bipan Chandra 'Colonialism and modernization' in *Nationalism and Colonialism in modern India* (Delhi, 1979); A.K. Bagchi, *op. cit.* (1972), chapter II; G.E. Hubbard *Eastern industrialisation and its effect on the West* (London, 1938); J.M. Keynes, Review of T. Morrison's *Economic Transition in India* in *Economic Journal*, 21, Sept. 1911.

* চতুর্থ ভাগ

J. Masselos *Towards nationalism: group affiliations and the politics of public association in 19th century western India* (Bombay, 1974); C. Dobbin *Urban leadership in Western India, 1840-85* (London, 1972); K. Gillion *Ahmedabad, a study in Indian urban history* (Berkeley, 1968); A.D.D. Gordon *op. cit.*; N. Gupta *Delhi between two empires, 1803-1931* (Delhi, 1981); Veena Talwar Oldenberg *The making of colonial Lucknow* (Princeton, 1984); Milton Singer 'The great tradition in a metropolitan centre, Madras' in Singer (ed) *Traditional India: Structure and change* (Philadelphia, 1959); S.M. Neild 'Colonial urbanism: The development of Madras city' *Modern Asian Studies*, 13,2,1979; Susan J. Lewandowski 'Changing form and function in the ceremonial, and colonial port city in India' in K.N. Chaudhuri and C.J. Dewey *Economy and Society in India* (Delhi, 1979); Ashish Bose *Urbanization in India* (Bombay, 1970) and *Studies in India's urbanization, 1901-71* (Bombay, 1973); Irfan Habib, .ch.VI, *CEHI*, vol.I; Patrick Roche 'Caste and the British merchant government in Madras, 1634-1749' *IESHR*, 12,4,1975; S. Saberwal 'Indian urbanism' *Contributions to Indian Sociology*, N.S., 11,1,1977;

M.N. Srinivas *Caste in India and other essays* (Bombay, 1962); W.C. Mac Cormack in M.B. Singer *op. cit.* (1959) H. Spodek *op. cit.*; Dipesh Chakrabarty in R. Guha (ed.) *Subaltern Studies, III* (Delhi, 1984).

* পঞ্চম ভাগ

Joseph Ben David 'The growth of professions and the class system' in R. Bendix & S.M. Lipset *Class, Status and Power* (London, 1974); Iftikhar-ul-Awwal 'The problem of middle class educated unemployment in Bengal, 1912-42', *IESHR*, 19,1,1982; B.B. Misra *The Indian middle classes: their growth in modern times* (London, 1961); S. Sivasubramanian *op. cit.*; Omkar Goswami 'Evolution of the Indian economy, 1850-1950' (mimeo, Princeton, 1987); B.N. Ganguly *Dadabhai Naoroji and the drain theory* (Bombay, 1965); Samar Sen 'Nagarik' and 'Swarga hote biday' (c.1934-37) in *Samar Sener Kavita* (B.S. 1373).

অধ্যায় ১০

* প্রথম ভাগ

J.A. Schumpeter *History of economic analysis* (New York, 1954); G. Myrdal *Political element in the development of economic theory* (London, 1955); S. Ambirajan *op. cit.*; Sarvapalli Gopal *British policy in India, 1858-1905* (Cambridge, 1965); S. Bhattacharya 'Laissez faire in India' *IESHR*, 1,2,1965.

* দ্বিতীয় ভাগ

D. Thorner *Investment in Empire* (Philadelphia, 1950); W.J. Mac Pherson 'Investment in Indian railways, 1845-75' *Ec. H.R.*, 2nd series, 8, 1975; J. Hurd, ch.VIII (2), in *CEHI*, Vol.II; N. Sanyal *Development of Indian railways* (Calcutta, 1930); S. Bhattacharya 'Colonialization and Public Works' in K.K. Datta (ed) *Comprehensive History of India* vol.XI, chapter 12; E. Whitcombe *Agrarian condition in northern India* (Bombay, 1972); Ian Stone *Canal irrigation in British India* (Cambridge, 1984); John Strachey *Empire* (London, 1979).

* তৃতীয় ভাগ

H.A. Antrobus *op. cit.*; Dwarkanath Ganguly *Slavery in British dominion* (comp. by K.L. Chattopadhyay, Calcutta, 1972); S.K. Sen *Studies in economic policy and development of India* (Calcutta, 1972).

* চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ

P. Harnetty, 'The Imperialism of Free Trade in *Ec.H.R.*, 2nd Series, 18,2,1965; H.L. Dey *The Indian tariff problem in relation to industry and taxation* (London, 1933); P.J. Thomas *Growth of Federal Finance in India, 1833-1939* (London, 1939); C.N. Vakil *Financial development in modern India*

(Bombay, 1939); P. Harnetty 'The Indian cotton duties controversy, *Ec. H.R.*, 77,1962; P. Ray *India's foreign trade since 1870* (London, 1934).

* ষষ্ঠ ভাগ

Sabyasachi Bhattacharya *Financial Foundations of the British Raj 1858-71* (Indian Institute of Advanced Study, 1971); A.K. Bagchi, *op. cit.* (1972); W.D. Grampp *The Manchester School of Economics* (Stanford, 1960); F. Clairmonte *Economic Liberalism and Underdevelopment* (Bombay, 1960); Maurice Dobb *Political economy and capitalism* (London, 1960); J.J. Spengler (ed.) *Economic Growth* (Durham, 1955); P. Harnetty *Imperialism and free trade* (Vancouver, 1972).

* সপ্তম ভাগ

P.J. Cain & A.G. Hopkins *op. cit.*; B.R. Tomlinson 'Colonial firms and the decline of colonialism in eastern India, 1914-47' *Modern Asian Studies*, 15,3,1981, and *Political economy of the Raj: the economics of decolonization 1914-47* (London, 1979); Colin Simmons 'The great depression and Indian industry' *Modern Asian Studies*, 21,3,1987; Peter Robb 'British rule and Indian 'improvement' *Ec.H.R.*, 2nd series, 34.4.1981; J.M. Keynes *op. cit.*; A.K. Bagchi *op. cit.*; H. Venkatasubbiah *Foreign trade of India, 1900-40* (Bombay, 1946); Basudev Chatterjee *op. cit.*; Aditya Mukherjee 'The Indian capitalist class 1927-1947' in S. Bhattacharya & R. Thapar *Situating Indian History* (Delhi, 1986); Ajit Roy *Indian monopoly capital* (Calcutta, 1953); Sumit Sarkar 'Logic of Gandhian nationalism: civil disobedience and the Gandhi-Irwin pact (1930-31)' *IHR*, III,I,1976; B.R. Tomlinson 'Foreign private investment in India, 1920-50' *Modern Asian Studies*, 12,4,1978; M. Kalecki 'Social and economic aspects of "intermediate regimes" '*Selected essays on the economic growth of the socialist and the mixed economy* (Cambridge); K.N. Raj 'The politics and economics of intermediate regimes' *Economic & Political Weekly*, 7 July 1973; Ashok Mitra Terms of *trade and class relations* (Calcutta, 1979); chapter 7; Pranab K. Bardhan *Land, labour and rural poverty* (Delhi, 1984); S. Bhattacharya 'The colonial state and the "Interests": a note on the representation of capital and labour' in D. Tripathi (ed.) *State and business in India* (Delhi, 1986), and 'Swaraj and the Kamgar: The Indian National Congress and the Bombay working class' in R. Sisson & S. Wolpert (eds.) *Congress and Indian Nationalism* (Berkeley, 1988).

বিষয়-সূচী